স্বদেশকথা

●

জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান
ও
নাগরিকতা

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,
এম্. এ., এল্-এল্. বি., পি-এইচ্. ডি.



সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ণ
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

প্রকাশক :
সেণ্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ণের পক্ষে
শ্রীঅতনু সেন, বি কম্.
৮।১ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬
এবং
রূপা প্রেস
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য স্বদেশকথা (ভারতের সংবিধান ও নাগরিকতা-সহ) একত্রে একই বই হিসাবে প্রকাশ করা হইল।

এই পুস্তকখানিও শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার সহৃদয় আনুকূল্য লাভে সমর্থ হইবে এই আশা রাখি। পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব। ইতি—

গ্রন্থকার

বর্তমান মুদ্রণের ভূমিকা

সিলেবাস অপরিবর্তিত থাকিলে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের সুযোগ খুব বেশি থাকে না। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে গ্রন্থের কিছু-না-কিছু উৎকর্ষসাধনের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। সেই সুযোগকে আমি যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি।

ইহা ব্যতীত, শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক/শিক্ষিকার পুস্তক পরিবর্ধনের সহৃদয় অনুরোধকে আমি কাজে লাগাইবার চেষ্টাও করিয়াছি। তাঁহাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

[নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ]

প্রথম খণ্ড

SYLLABUS

INDIA AND HER PEOPLE

(HISTORY)

PART A (for Class IX)

HISTORY OF INDIA UP TO THE MIDDLE OF The 19th CENTURY

I. Geography : Its influence on the country, its people and History.

Elements of India's population—Evolution of composite culture—Fundamental unity.

II. Source material : Ancient, medieval and modern period.

III Antiquity of India and her civilisation : Indus Valley Civilisation. Coming of the Aryans, Civilisation and religion as revealed in the Vedas and the Upanishads.

IV. Growth of Jainism and Buddhism.

V. (i) Foreign Invasions : Persian, Greek (Macedonian and Bactrian), Scythian (Saka-Parthians, Kusanas and Huns).

(ii) General nature of resistance. Impact of foreign inroads on the social and cultural life. Redisposition of Indian Society : Rise of the Rajputs.

VI. Bid towards Imperial Unity : Its different phases ; Under Magadha : (i) From Bimbisara to Asoka, (ii) Chandragupta I to Skandagupta.

Under Kanauj : From Pusyabhuti Harsha to Pratihara Mahendrapala.

Under Gauda : From Sasanka to Devapala.

VII. Society and Culture (in North and South India) From the 4th Century B. C. to the 14th Century A. D.

VIII. Indian Culture and Civilisation beyond India.

IX. (a) Rise, growth and decline of Turco-Afghan power.

(b) Rise, growth and decline of Mughal power in India.

X. Impact of Mahomedan rule on social and economic life of art, architecture, literature, language and religion. Religious reformers.

XI. (a) The Mahrathas: From Sivaji to Baji Rao II (in outline).

(b) The Sikhs: From Nanaka's successors to Ranjit Singh (in outline).

XII. Advent of the Europeans: Their rivalries: Emergence of the English—From Trade to Political domination.

XIII. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie (References to wars with the Sikhs, in outline).

XIV. (i) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon.

(ii) Social, cultural and religious reforms under Indian initiative.

Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, Brahma Samaj leader, Iswar Chandra Vidyasagar, Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj, Dayananda, Ramkrishna Paramhansa.

XV. Reaction against British rule. Background of the Mutiny and Revolt of 1857—Causes, Progress, nature, its outcome. End of the rule of the East India Company. India on the threshold of a new era.

[নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ

স্বদেশকথা

প্রথম খণ্ড

সূচনা
(Introduction)

মানুষ ও তাহার পরিবেশ (Man and his environment) : ইতিহাস কেবল রাজা-মহারাজাদের কাহিনী বা বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণ নহে। পৃথিবীর বৃহত্তর মানবসমাজ কিভাবে পরিবেশের সহিত যুঝিয়া বর্তমান সভ্যতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আদিম যুগের গুহা-মানব কিভাবে আজিকার সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই কথার আলোচনাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু।* মানুষের আবির্ভাব হইতে শুরু করিয়া এবং মানুষের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ফলে আজ অনেক কিছুই জানা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও অনেক কিছুই অজানা রহিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার নিজ স্মরণশক্তির যে-মূল্য জাতি তথা বৃহত্তর মানব-সমাজের পক্ষে ইতিহাসের মূল্যও তাহাই। মানবজাতির বিগত কালের স্মৃতিই ইতিহাসে বিধৃত।†

সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি নির্ভর করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা বা প্রতিভা ও পরিবেশের উপর, আর মানুষের পরিবেশ এবং কতক পরিমাণে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার আবাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর পরিবেশ একই প্রকার নহে, সেজন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও একরূপ নহে। পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিভা থাকিলেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আজ মানুষ সত্যই চাঁদের দেশে পৌঁছিয়াছে, চাঁদের বুকে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে; সে কৃত্রিম চাঁদ সৌরজগতে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ সামান্য ঝড়-তুফান, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জন্তু-জানোয়ারের সম্মুখে অসহায় বোধ করিত। কিন্তু আজ প্রকৃতি মানুষের কাছে পরাজিত; জন্তু-জানোয়ার আজ মানুষের ভয়ে ভীত এবং মানুষের আজ্ঞাবহ। আদিম স্তর হইতে ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা আজিকার সভ্যতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মানবসমাজের এই ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির কাহিনীই হইল 'ইতিহাস'। মানুষ ও তাহার পরিবেশ হইল ইতিহাসের মূলভিত্তি। আবার মানুষের পরিবেশ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তাহার মাতৃভূমির

ইতিহাস

ইতিহাসের মূল ভিত্তি—মানুষ ও তাহার পরিবেশ

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা

* cf. 'His (i.e., Man's) Story'=History.

† "History, it has been remarked, is to the group, what memory is to the individual." Thompson and Johnson

ভূ-প্রকৃতি। জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

ভারত তথা প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অল্প-বিস্তর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং জাতির চরিত্র, কৃষ্টি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন—এককথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের প্রভাব অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য।

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল : ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

(Geography : Its Influence on the Country, its People and History)

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Environment of India) : ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্র গঠনে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণী আফগানিস্তান, রাশিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে এবং পূর্বে আরাকান পর্বত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অপর প্রায় তিন দিক, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমারেখা ভারতবর্ষকে শুধু অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্নই করে নাই, চতুর্দিক দিয়া রক্ষাও করিতেছে।

সুনির্দিষ্ট সীমারেখা

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। ইহা নিজেই একটি মহাদেশের ন্যায় সুবিশাল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা ভারতবর্ষে স্বভাবতই থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষকে পাঁচটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশে ভাগ করা চলে—যথা, (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল ভূমি, (৩) মধ্য-ভারতের মালভূমি, (৪) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, এবং (৫) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল।

পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত

ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব (Influence of Physical Geography on the Indians and India) : ভারতবর্ষ যেন প্রকৃতির কোলে সন্তান। উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্বত ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে এমন নহে, হিমালয় হইতে নির্গত নদ-নদী ভারতভূমিকে শস্য-শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের বারিপাত হিমালয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অরণ্য-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ ও কৃষি-সম্পদে সম্পদশালী ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবন-ধারণের কোন সমস্যা প্রাচীন কালে ছিল না। ফলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসী শ্রমবিমুখ, ধর্মপ্রবণ এবং কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমালয়ের প্রভাব

ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রাচীন কালে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিন্ধ্য পর্বত দক্ষিণ ভারতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের কোন কোন কালে আর্যাবর্তের পরাক্রমশালী রাজাগণ দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সমর্থ হইলেও দাক্ষিণাত্য

অঞ্চলকে রাজনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে উত্তর-ভারতের সহিত ঐক্যবন্ধ করিতে পারেন নাই। বিন্ধ্য পর্বতই যে এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর হইত, বলা বাহুল্য।

বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে পৃথিবীর অপরাপর অংশ হইতে প্রকৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। সুদূর অতীত হইতেই ভারতবর্ষ এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত স্থলপথে এবং জলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভৃতি গিরিপথ ধরিয়া আর্যদেরআগমন হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। পারসীক, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদের জন্মভূমিকে এক মহামানবের মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিতও বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ফলে নানা সংস্কৃতির দানে পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

স্বতন্ত্র সভ্যতা

ভারত মহাসাগর ও অপরাপর সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ

বহু জাতি ও ধর্মের লোকের মিলন-তীর্থ

সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূলরেখার নানা স্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়িয়া উঠিবার ফলে সমুদ্র-পথ ধরিয়া অতি প্রাচীন কালেই চীন, রোম, মিশর, চম্পা, কম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই সকল বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এমন কি, এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই সকল অঞ্চলে আজিও বিদ্যমান আছে। সমুদ্রপথ ধরিয়াই আধুনিক কালে ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। খোটান, ইয়ারখন্দ, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলেও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

সমুদ্রপথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণ সমুদ্রের সন্নিকটে থাকিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সমুদ্র-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তরাংশের জনসাধারণ সেই পরিমাণ সমুদ্র-প্রবণ হইবার সুযোগলাভ করে নাই। উত্তর-ভারতের কেবল বাংলাদেশের ন্যায় সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত দেশ হইতে এবং সিন্ধু নদের গতিপথ ধরিয়া কতক পরিমাণ সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল। সমুদ্রের প্রতি দাক্ষিণাত্য-বাসীর অধিকতর টান থাকিবার একমাত্র কারণ হইল প্রাকৃতিক প্রভাব—অর্থাৎ সমুদ্রের

ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশের জনগণের মধ্যে সমুদ্র-প্রবণতার পার্থক্য



[১০০০ ফুট= ৩০৪.৮ মিটার]

সান্নিধ্য। এইভাবে নানা দিক দিয়া ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতের নরনারী (Indian People): ভারতের অধিবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত ভারতবাসীকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিয়া থাকেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ভারত-সরকার ভারতবাসীকে মোট সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর হাটন (Dr. J. H. Hutton) ভারতবাসীকে মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ডক্টর গুহ (Dr B. S. Guha) নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভারতবাসীকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার মতই মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য বলা যাইতে পারে। এই ছয়টি ভাগ হইল (১) নিগ্রিটো, (২) প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড, (৩) মোঙ্গল্যায়ড, (৪) মেডিটারেনিয়ান, (৫) ওয়েস্টার্ন ব্র্যাকিসেফেলাস, এবং (৬) নর্ডিক বা আর্য।

বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদের মতামত

ছয়টি জাতি

নিগ্রিটো জাতির লোকেরা ভারতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র আন্দামান-নিকোবর, আসামের অঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ ভারতীয় ইরুলবা, কুরুম্বা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে 'নিগ্রিটো' জাতির বংশধরগণকে দেখা যায়। ইহাদের দেহের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক চ্যাপ্টা এবং শরীরের গড়ন বেঁটে।

নিগ্রিটো (Negrito)

প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর ('lower castes') মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহল (অধুনা শ্রীলংকা), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বংশধরদের বসবাস এখনও আছে।

প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড (Proto-Austroloid)

মোঙ্গল্যায়ড (Mongoloid)

মোঙ্গল্যায়ড জাতির লোকদিগকে প্রধানত চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীর সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন জাতির লোক গঙ্গা-উপত্যকা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান (Mediteranean)

ব্র্যাকিসেফেলাস জাতির লোকের বাস হইল বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, গঙ্গা উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, গিলগিট, চিত্রাল প্রভৃতি অঞ্চলে।

ওয়েস্টার্ন ব্র্যাকিসেফেলাস (Western Brachycephallous)

নর্ডিক বা আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির লোক প্রধানত পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র (মারাঠী চিৎপাবন ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে।

নর্ডিক বা আর্য (Nordic or Aryan)

এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত জাতিগুলির বসবাসের স্থান সম্পর্কে কোন কঠোরতা নাই। সকল অঞ্চলেই এই সকল বিভিন্ন জাতির লোকের সংমিশ্রণ ও বসবাস পরিলক্ষিত হয়। কোন জাতিরই জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই।

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ

ভারতবাসীর মধ্যে মৌলিক ঐক্য (Fundamental Unity among the Indians): 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগর' আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুত বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের জনসমাজের এক অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘটিয়াছে। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মহামিলন-তীর্থ আমাদের এই ভারতভূমি।* ধর্মের দিক দিয়া এদেশে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসীক, খ্রীস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এক বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে।** সেই কারণে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিভিন্ন মত ও পথের, বিভিন্ন আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার এক সমষ্টিগত ফলস্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য বিরাজমান। নানা আচার-আচরণ, জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক দ্বারা অধ্যুষিত ভারতভূমি এক বিচিত্র দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য শুধু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই বিভিন্নতা নহে, প্রাকৃতিক দিক দিয়াও এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের দেশে শস্য-শ্যামল উর্বর প্রান্তর যেমন আছে তেমনি অনুর্বর মরুদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতার দিক দিয়া হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাথায় ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। আবার সুগভীর গুহা ও কন্দরের অভাবও এদেশে নাই। আবহাওয়ার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে শীতল, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ—তিন প্রকারের আবহাওয়াই পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া, লতা, গুল্ম, জীবজন্তু, বৃক্ষাদি সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষে এক চরম বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইভৌগোলিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত

জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণের পার্থক্য

সমষ্টিগত সংস্কৃতি (Composite culture)

বৈচিত্র দেশ

ভাষা, আচার-আচরণ ও জাতি-ধর্মের বৈষম্য

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

* "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"—রবীন্দ্রনাথ

**"From the human point of view India has been often described as an ethnological museum in which numberless races of mankind may be studied, ranging from savages of low degree to polished philosophers. That variety of races languages, manners, and customs is largely the cause of the innumerable political subdivisions which characterize Indian history before the unification effected by the British supremacy." V. A. Smith: *The Oxford History of India* (3rd Ed., revised by T. G. P. Spear), p. 5.

হইয়াছিল। ফলে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।*

কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর একত্ববোধ প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি বিরাজিত। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই হইল সমন্বয়সাধন করা। সুতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক ঐক্যের উপর এই ঐক্য নির্ভরশীল নহে। ইহা হইল মনের ঐক্য, অন্তরের ঐক্য, ধারণার ঐক্য। 'ভারতবর্ষ' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আসমুদ্র হিমাচল এবং বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে।** কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই ঐক্যবন্ধ এক বিশাল দেশের ধারণাই আমাদের মনে জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সত্ত্বেও হিন্দু সভ্যতার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সংস্কৃতি লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই মূল সভ্যতার কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা-সংস্কৃতি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। একই সাংস্কৃতিক ঐক্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে।‡ এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতবাসীকে অন্তরের দিক দিয়া ঐক্যবন্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে, বলা বাহুল্য।

বিভিন্নতার মধ্যে একতা

'ভারতবর্ষ' নামের ঐক্য

সাংস্কৃতিক ঐক্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাদ্য-পানীয় ও পরিবেশ ভারতবাসীর মনে পরোক্ষভাবে এক ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে।† প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজাগণের 'একরাট', 'সম্রাট্' প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষভাবে মৌর্য আমল, গুপ্ত যুগ প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ফলে ভারতীয়দের

জীবনযাত্রার মোটামুটি একতা

* Vide V. A. Smith *The Oxford History of India* (3rd Ed.), p. 4.

** "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম
ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥" বিষ্ণু পুরাণ, ২৷৩৷১

‡ "The most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture or civilization, utterly different from any other type in the world." Smith (3rd Ed.), p 7.

† Vide Sir J. N. Sarkar's article: 'Unity of India', *Modern Review* Nov., '41.

অধিকাংশের একই প্রকার রাজনৈতিক ভাগ্য পরোক্ষভাবে তাহাদের মধ্যে এক-জাতিবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

রাজাগণের রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রভাব

প্রাচীন, অর্থাৎ হিন্দু যুগেই অন্তত দুইবার, প্রথমে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের অধীনে পুনরায় গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আমলে প্রায় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতানী ও মুঘল যুগে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে রাজনৈতিক ঐক্য অধিকতর মাত্রায় সাফল্যলাভ করিয়াছিল। এই সকল কারণে ভারতবাসীর অন্তরে এক মৌলিক ঐক্যের ধারণা জন্মিয়াছিল।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারতবাসীকে এক গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের ঐক্যবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের সকলেই 'ভারতবাসী'। এক গভীর আন্তরিক ঐক্যবোধ ভারতীয়দিগকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই ঐক্য রাজনৈতিক একতা বা ভৌগোলিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা হইল ভারতবাসীর অন্তরের একতা।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত-ইতিহাসের উপাদান

(Source Materials of Indian History)

ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ

ইতিহাসের উপাদান (Sources of History): সভ্যতার পথে মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিভিন্ন কালের ঐতিহাসিক চিহ্নাদিও সে ততই অধিক পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন। এই তিনটি পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মতই অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের দিক হইতে এবং আমাদের সুবিধার জন্য ভারত-ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হইলেও ইতিহাসের ধারা নদীস্রোতের মতই এক এবং অভিন্ন থাকে। এই ধারাবাহিকতা না থাকিলে ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হইবে। কারণ প্রাচীনকে ভিত্তি করিয়াই মধ্য এবং মধ্যকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছে।

---

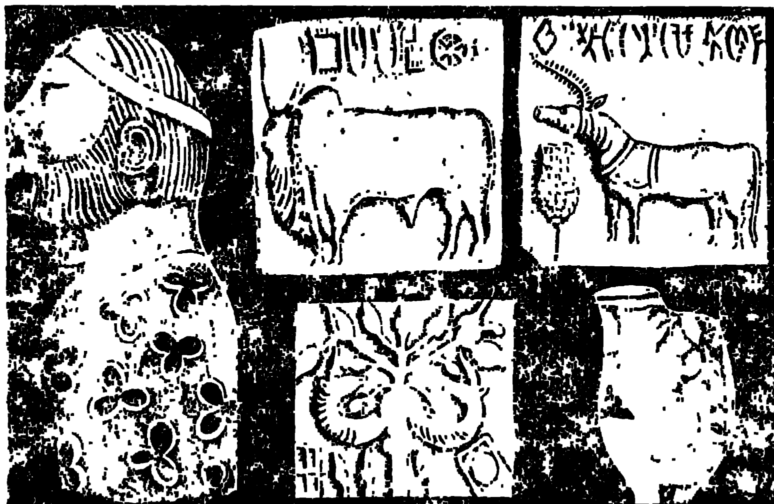
* "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners, and sect." Smith: *The Oxford History of India* (3rd Ed.), p. 7.

প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Ancient Indian History) : ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান : (ক) শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি, (খ) প্রাচীন মুদ্রা, (গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প-চিহ্নাদি ; (২) কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা ; এবং (৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ।

বিভিন্ন উপাদান

(১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান : প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ভারতের নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের আদি সভ্যতা যে-পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি—যথা, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক প্রভৃতির সমসাময়িক ছিল সেকথা প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল সিন্ধু-উপত্যকায়ই নহে, সাঁচী ও সারনাথে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মৌর্য আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। নালন্দায়ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস রচনা করা যায়।

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, সাঁচী, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক চিহ্ন



সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

(ক) শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি : প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি। প্রাচীন কালে যখন কাগজপত্রাদির ব্যবহার জানা ছিল না তখন রাজা-মহারাজারা পাথরের উপর অথবা

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপত্র প্রভৃতি খোদাই করিয়া দিতেন। এগুলি সেই সকল রাজার রাজত্বকালের অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নাই। বিশেষত এগুলিকে পরবর্তীকালে অদল-বদল করিবারও কোন উপায় থাকে না।

পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর উপরে খোদিত লিপি

প্রাচীন ভারতের শিলালিপিগুলির মধ্যে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি তাঁহার আমলের ইতিহাস রচনার এক অতি নির্ভরযোগ্য উপাদান। এইভাবে এলাহাবাদে গুপ্ত যুগের সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনী খোদিত এক স্তম্ভগাত্রে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপি প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ।

অশোকের শিলালিপি, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তি

(খ) প্রাচীন মুদ্রা: প্রাচীন কালের রাজাগণের মুদ্রা, অর্থাৎ ধাতু নির্মিত টাকাকড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় রাজার নাম, তারিখ, রাজার বা কোন দেব-দেবীর প্রতিকৃতির ছাপ খোদাই করা আছে। এগুলি হইতে স্বভাবতই আমরা রাজার শাসন-কাল, সেই সময়কার ধাতুশিল্পের উন্নতি, রাজা-মহারাজাদের ধর্মমত, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি সম্পর্কে জানিতে পারি। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি হইতে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রীক, শক, বাহ্লিক প্রভৃতি যে-সকল বিদেশী জাতির রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নাম আমরা তাঁহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারিয়াছি।



প্রাচীন মুদ্রা

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব





প্রাচীন মুদ্রা

(গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন: প্রাচীন যুগে নির্মিত বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মাটির নিচ হইতে যেমন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি মাটির উপরেও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থাপত্য নিদর্শন হইতে তখনকার কালে স্থাপত্য শিল্প কতদূর উন্নত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ-বিষয়ে সাঁচী স্তূপ এবং উহার রেলিং, তোরণ-দ্বার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাস্কর্য শিল্পেরও বহু প্রাচীন নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ, মূর্তি প্রভৃতির গুরুত্ব

গান্ধার নামক স্থানের ভাস্কর্য রীতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাবে যে এক অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান।

(২) **কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা :** প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী হইতেও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ করা গিয়াছে।

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি. অর্থশাস্ত্র, হর্ষ-চরিত, গৌড়বহো প্রভৃতি

বস্তুত খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৬০০ হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ) অবধি ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদানই হইল প্রাচীন সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত দুইটি মহাকাব্য হইতে সমসাময়িক কালের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্যাদির দিক হইতে অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ। বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলী ও রাজাগণের ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক কাহিনী-কিংবদন্তীর দিক দিয়া মোট আঠারটি পুরাণের মধ্যে উপরি-উক্ত পাঁচটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মৌর্য যুগে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', পরবর্তী কালের কবি বাণভট্ট-প্রণীত 'হর্ষ-চরিত', বাকপতির 'গৌড়বহো', কলহনের 'রাজ-তরঙ্গিণী', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) **বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ :** অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেশী ভ্রমণ-কারিগণ আমাদের দেশে আসিয়া তাঁহাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গের অনেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সীরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস মৌর্য শাসন এবং তখনকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস ভিন্ন ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস প্রভৃতি গ্রীক দূতও অনুরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও গ্রীক চিকিৎসক টেসিয়াসের বিবরণে প্রাচীন ভারতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে ভারতীয় পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস

ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস, হেরোডোটাস, টেসিয়াস

প্রাচীন যুগে চীন হইতেও বহু পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ঈ-সিঙ, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্ প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য ইঁহাদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

ঈ-সিঙ, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ অলবিরূণী হিন্দু যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুদের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'তহ্কিক্-ই-হিন্দ্' গ্রন্থে সেই যুগের হিন্দুদের আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

অলবিরূণী

মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Medieval Indian History): মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার পর্যাপ্ত উপকরণ আছে। এগুলিকে সরকারী দলিলপত্র, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন এবং হিন্দু লেখকগণের রচনা—এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

বিবিধ উপাদান

(১) **সরকারী দলিলপত্র**: সুলতানি আমল এবং মোগল শাসনকালে সরকারী দলিলপত্রাদি ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনায় অতি মূল্যবান উপকরণ। এগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এবং সংরক্ষণের অভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল কিন্তু সেগুলির একটিও আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই।

সরকারী দলিলপত্র—বিনাশপ্রাপ্ত

(২) **সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা**: 'ভারতের তোতাপাখী' আমীর খুস্রু বা খুস্রুভ মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচনায় সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও পাওয়া যায়। আমীর খুস্রু ভিন্ন মিনহাজ্-উস্-সিরাজ, শাম্স-ই-সিরাজ, হাসান নিজামী, জিয়া-উদ্দিন বরনী, ফেরিস্তা প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা সেই যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। আবুল ফজল-প্রণীত 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থদ্বয় আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। ইহা ভিন্ন ঐ সময়ে বদাউনী-রচিত ইতিহাস গ্রন্থও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আমীর খুস্রু, মিনহাজ, হাসান, ফেরিস্তা, জিয়া-উদ্দিন, আবুল ফজল, বদাউনী

সুলতানি ও মোগল সম্রাট্দের অনেকে নিজ নিজ জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এগুলিও সমসাময়িক ইতিহাস রচনার উপাদানে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ফিরুজ শাহের স্বরচিত 'ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজ শাহী', 'বাবরের জীবন-স্মৃতি', 'জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাবর ও জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি

উপরি-উক্ত উপাদানগুলি ভিন্ন 'আলমগীর-নামা', 'পাদশাহ্-নামা', খাফি খাঁ (মির্জা মহম্মদ কাশিম)-রচিত 'মুন্তাখাব্-উল্-লুবাব্' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'আলমগীর-নামা', 'পাদশাহ্-নামা', 'মুন্তাখাব্-উল্-লুবাব্'

(৩) **বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা :** সুলতানি ও মোগল শাসনকালে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা হইতে সেই সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো, ইবন্-বতুতা, চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান, মোগল যুগে জেসুইট্ ধর্মযাজকগণ, ইওরোপীয় পর্যটক বারথেমা, বারবোসা, র‍্যালফ ফিচ্, টমাস রো, বার্ণিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারসীক পর্যটক আব্দুর্ রজাক্, পোর্তুগীজ পায়েজ ও নুনিজ, ইতালীয় নিকোলো কণ্টি প্রমুখ পর্যটকের রচনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায়।

মার্কো পোলো, ইবন্-বতুতা, মাহুয়ান, জেসুইট্ ধর্মযাজকগণ, পর্যটক র‍্যাল্ফ ফিচ্, টমাস রো, বার্ণিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রভৃতি

(৪) **মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন :** মধ্য যুগের সুলতান ও সম্রাট্গণের মুদ্রা হইতে তাঁহাদের আমলে ধাতুশিল্পের উন্নতি এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুলতানি ও মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রশিল্প হইতে সেই যুগের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কুতব মিনার, আলাই দরওয়াজা, তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্য যুগের, অর্থাৎ সুলতানি ও মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণ

(৫) **হিন্দু লেখকদের রচনা :** মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণ কবিদের রচনা প্রভৃতিতেও সেই যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থখানি রাজপুত চারণ কবিদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত।

মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণ কবিদের রচনা

আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Modern Indian History) : ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপকরণগুলির মধ্যে সরকারী কাগজপত্র, ইওরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **সরকারী কাগজপত্র :** ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে কাগজপত্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা যায়। ফরাসী পর্যটক 'জ্যাকেমোঁ' (Jaquemont) বলিয়াছিলেন যে, (ব্রিটিশ) ভারত সরকারের শাসনকার্য 'কাগজ-কলমে'র দ্বারাই চলিতেছে। এই উক্তি হইতে ভারতের আধুনিক ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব

(২) **ইওরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র :** ইংরেজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য কুঠিতে যে-সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

বাণিজ্য কুঠিতে প্রাপ্ত দলিলপত্রের গুরুত্ব

(৩) **দেশীয় ও বিদেশীয় রচনা** ফারসী ভাষায় রচিত গুলাম হুসেনের 'সিয়ার-উল্-মুতাখেরিণ'; গুলাম হুসেন সেলিমের 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'; সুজন রাই খাট্রি-র 'খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ্'; তামিল ভাষায় লিখিত আর. এ. পিলাই এর 'দিনপঞ্জী'; ফরাসী গভর্নর দুপ্লের 'দুবাস', ইংরেজ ঐতিহাসিক মিলের 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস'; উইল্ক্স্ (Wilks)-এর 'মহীশূরের ইতিহাস'; গ্র্যান্ট্ ডাফ রচিত 'মারাঠাজাতির ইতিহাস'; কানিংহামের 'শিখজাতির ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এ-যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ।

ফারসী, তামিল, ফরাসী ও ইংরেজী গ্রন্থাদি

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

(Antiquity of India and Her Civilization)

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। একমাত্র চীন ভিন্ন অপর কোন দেশ এত প্রাচীন এবং নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবের অধিকারী নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এবং বিভিন্ন উপকরণে পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারত ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব

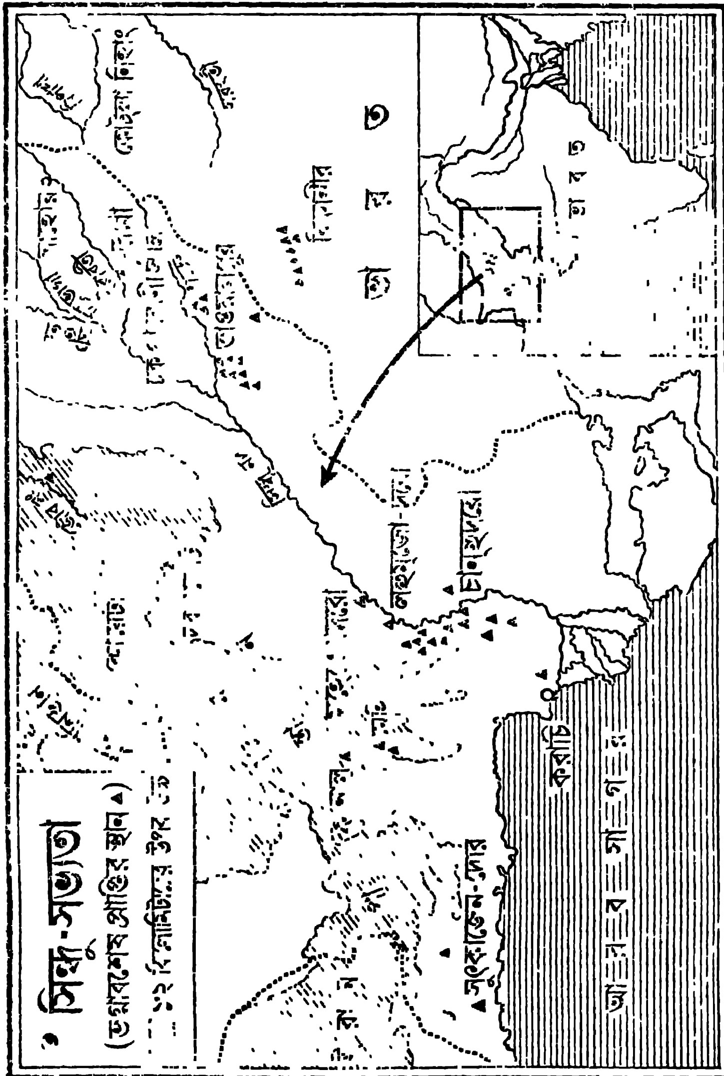
সিন্ধু-সভ্যতা **(Indus Valley Civilization) :** ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর স্যার্ জন মার্শাল বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের 'মহেঞ্জোদরো' নামক স্থানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের খননকার্য আরম্ভ করেন। এই স্তূপটি একটি উঁচু ঢিপির উপর নির্মিত ছিল। এই ঢিপিটি সিন্ধুদেশের লোকের নিকট 'মহেঞ্জোদরো'—অর্থাৎ 'মড়ার ঢিপি' নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ স্তূপটির খননকার্য শুরু করিলে উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর বর্তমানে পাকিস্তান পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থান, চানহুদরো, সুৎকাজেন-দোর প্রভৃতি স্থানে খননকার্য দ্বারা ঐ একই রূপ বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শন একই সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া এই সভ্যতা গড়িয়া

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত সিন্ধু-সভ্যতা

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা

উঠিয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে 'সিন্ধু-সভ্যতা'। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হইতে শুরু হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। ইহা

'সিন্ধু-সভ্যতা' নামকরণ ও প্রাচীনত্ব



মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসাময়িক ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো, সুৎকাজেন-দোর, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি নানা স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা —সিন্ধু-সভ্যতার দুইটি শ্রেষ্ঠ শহর

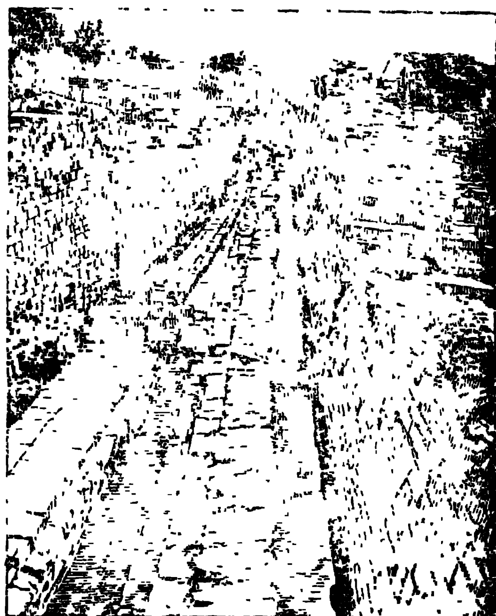
মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা নামক শহর দুইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও জল-পথে সহজ যোগাযোগের উপায় ছিল।* এই দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল। উভয় শহরই রৌদ্রে পোড়া ইটের উচ্চ ভিত্তির উপর

পোড়া ইট ও রৌদ্রে পোড়া ইটের ব্যবহার

নির্মিত। দালান বা প্রাসাদ অবশ্য পোড়া ইটের প্রস্তুত ছিল। অপরাপর যে-সকল স্থানে খননকার্যের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে পরিকল্পনা ও গঠনকৌশলের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

মহেঞ্জোদরো শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। রাস্তার পাশ ধরিয়া সারিবদ্ধভাবে ছোট-বড় অসংখ্য দালান নির্মিত ছিল। দালানগুলির গড়ন-ভঙ্গিমা, পরিসর প্রভৃতি দেখিয়া ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র দুই-কক্ষযুক্ত দালান হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দালানগুলি যে দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ ছিল তাহা সিঁড়িগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দালান মাত্রেরই দেওয়াল ও মেঝে অত্যন্ত মসৃণ ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই কূপ, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। মহেঞ্জোদরোতে একটি বিরাট প্রাসাদ, একটি বিশাল স্নানাগার এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিরাট হলঘর

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর পূর্তকার্যাদি



রাস্তা ও রাস্তার নিচে পয়ঃপ্রণালী (মহেঞ্জোদরো)

* Sir Mortimer Wheeler : *The Indus Civilization* (*The Cambridge History of India*, Supplementary Volume), p. 2. ff.

Uttarpara

আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল শস্যভাণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে একই স্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট দালানের পাশাপাশি নির্মাণ-ভঙ্গী দেখিয়া এগুলি শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

স্থাপত্য কার্য

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল। প্রত্যেক দালান হইতে জল-নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। নর্দমা রাস্তার তলদেশ দিয়া নির্মিত ছিল। এই সকল নর্দমা দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগুলি আটকাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত করিয়া দেওয়া হইত। নাগরিক জীবনকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার যাবতীয় ব্যবস্থা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় ছিল।

আধুনিক ধরনের পয়ঃপ্রণালী

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কোথাও কোন মন্দিরের বা উপাসনা গৃহের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্মকর্মাদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ বাড়ীতেই সম্ভবত লোকে করিত। যাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মন্দির বা কোনপ্রকার উপাসনা গৃহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই

সিন্ধু-সভ্যতার কালে লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, বার্লি, খেজুর প্রভৃতি। এগুলি ভিন্ন নানাপ্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিত। গরু, শূকর, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাহারা খাইত। দুধ, শুকনা মাছ, সিন্ধু নদের টাটকা মাছ প্রভৃতি তাহাদের অপরাপর প্রধান খাদ্য ছিল।

খাদ্য

সূতী ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্র সে-যুগের লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিত। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই। তবে প্রস্তর মূর্তির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিম্নাংশের জন্য পৃথক একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত। অলংকারাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিত। তবে কানপাশা, নাকের অলংকার, হার, কোমরবন্ধ প্রভৃতি স্ত্রীজাতিই ব্যবহার করিতেন। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দাঁত এবং মূল্যবান পাথর অলংকার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত। স্ত্রীজাতি আধুনিক কালের ভারতীয় নারীদের ন্যায় কেশবিন্যাস করিতেন। প্রসাধন সামগ্রীও যে তাঁহারা ব্যবহার করিতেন সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

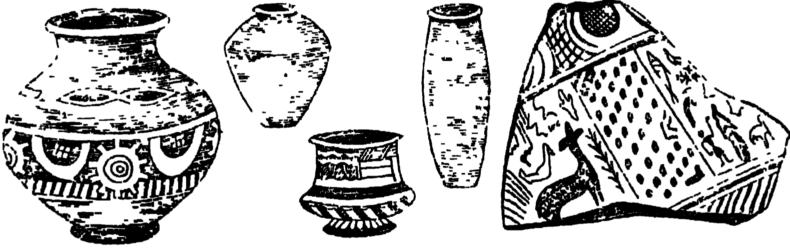
পোশাক-পরিচ্ছদ

অলঙ্কারপত্র

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় এবং সিন্ধু-উপত্যকার অপরাপর স্থানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। চীনা মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জনির্মিত পাত্র, তামা ও রূপার পাত্র, সূচ, মাছ ধরিবার বড়শি, চিরুনি, কুঠার, বর্শা, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, আয়না, কাস্তে প্রভৃতি

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, খেলনা

বহুপ্রকার জিনিস হইতে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে লোকেরা যে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। মাটির



সিন্ধু-সভ্যতার যুগে বাসনপত্র

পাখী ও ফাঁপা ঝুনঝুনি, ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, খাট, চারপাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খেলনা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ জিনিস দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহৃত হইত।

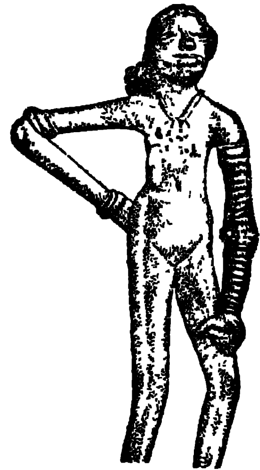
সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হরপ্পা বা মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া যায় নাই। এই দুই শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল এই অনুমান করা হইয়া থাকে।* যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে ছুরি, তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি তখন ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ঢালজাতীয় কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাজ পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত ছিল।

অস্ত্রশস্ত্র

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ব্রোঞ্জনির্মিত একটি নর্তকী-মূর্তি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত বহু সীল-মোহর এবং মস্তক, হস্তপদহীন একটি মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এগুলির নির্মাণকৌশল এবং এগুলিতে অঙ্কিত পশুর প্রতিকৃতি ও মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, সে-যুগের শিল্পীদের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এঁটেল মাটি এবং বালি দ্বারা নির্মিত কয়েকটি পশু ও মানুষের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিও উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। সিন্ধু-উপত্যকায় মোট দুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিল্পকলা ও সীলমোহর

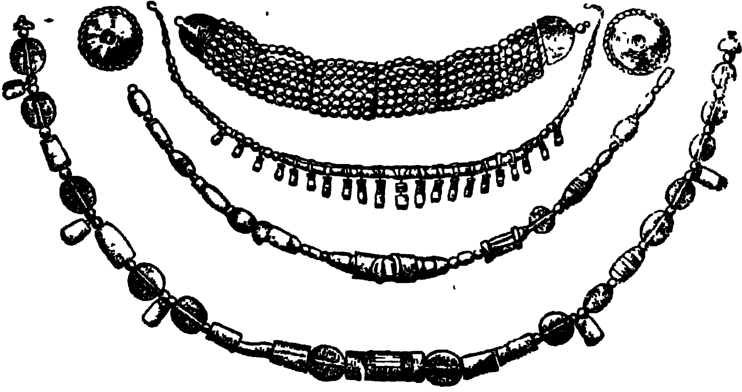
চিত্রলিপি



নর্তকী-মূর্তি (সিন্ধু-সভ্যতা)

* Sir Mortimer Wheeler: *The Indus Civilisation* (*The Cambridge History of India*, Supplementary Volume) pp. 52-53.

এগুলির উপরে একপ্রকার চিত্রলিপিও আঁকা আছে। কিন্তু এযাবৎ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

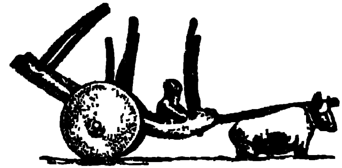


সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অলংকার

কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য; মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াই জীবনধারণ করিত। কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিকা হইলেও মৃৎপাত্র-নির্মাণশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য, ধাতুশিল্প প্রভৃতিও জীবিকার্জনের বিভিন্ন বৃত্তি ছিল। গরু, মহিষ, ষাঁড়, হাতী, হরিণ, ভেড়া, উট প্রভৃতি জন্তুর কঙ্কাল ও সীলমোহরে খোদাই করা প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পশুর মধ্যে কতকগুলি যে গৃহপালিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। শিশুদের খেলনার বাঘ, গণ্ডার, ভল্লুক, খরগোস, বিড়াল, বাইসন, বানর প্রভৃতির ছোট ছোট প্রতিকৃতি হইতে এই সকল জন্তু সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের জানা ছিল, নিঃসন্দেহে বলা চলে। মোরগ, টিয়া, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতিও তাহারা পোষা পাখী হিসাবে পালন করিত বলিয়া মনে হয়।

গৃহপালিত পশু-পক্ষী



শিশুর খেলনা (মহেঞ্জোদরো)

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিন্ধু-সভ্যতা যুগের লোকেরা পশ্চাৎপদ ছিল না। ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ ভিন্ন আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলুচিস্তান, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইহা ভিন্ন, মেসোপটেমিয়ার সহিতও যে তাহাদের যোগাযোগ ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও সোনার ব্যবহার জানা ছিল। সিন্ধু-উপত্যকায় তামা প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যাইত বলিয়া দক্ষিণ ভারত ও আফগানিস্তান হইতে তামা আমদানি করা হইত। রাজপুতানা হইতে তাহারা স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্বেত পাথর আমদানি করিত। জলপথে

এবং স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার দুইটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাও তাহাদের অজানা ছিল না। মহেঞ্জোদরোতে একটি ঘোড়ার কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-বালুচিস্তানের রানী ঘুনদাই নামক স্থানে ঘোড়া ও গাধার কঙ্কাল পাওয়া যাইবার ফলে একথা মনে করা হয় যে, উট ভিন্ন, ঘোড়া ও গাধা সিন্ধু-সভ্যতা যুগের পরিবহণের প্রধান সহায়ক ছিল।*

ধর্ম

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা এক যোগী-পুরুষের পূজা করিত। এই যোগী-পুরুষের মস্তকে তিনটি শৃঙ্গ এবং তাঁহার চতুর্দিকে পশুর ছবি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাকে পশুপতি শিবের আদি সংস্করণ বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।** ইহা ভিন্ন এক মাতৃমূর্তির—সম্ভবত মহাদেবীর, পূজাও সে-যুগে প্রচলিত ছিল।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিন্ধু-সভ্যতা যে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সিন্ধু-সভ্যতাবগুরুত্ব

সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে বৈদিক যুগের পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল একথা বুঝিতে পারা গিয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বা আর্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক একথা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুত, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম একথাও সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার্ জন্ মার্শাল প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে সিন্ধু-সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে সমসাময়িক মিশরীয় বা আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের কারণ (Causes of the Decay of the Indus Civilization): সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল কেন এবং কিভাবে সে বিষয় লইয়া ঐতিহাসিকগণ এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। তথাপি ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে কতকগুলি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের জন্য মোটামুটিভাবে দায়ী ছিল, ইহা বলা হইয়া থাকে।

বহিরাগত আক্রমণ : আর্যদের সহিত যুদ্ধ

(১) মেসোপটেমিয়া হইতে আগত বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, আর্যদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে সাধারণত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহার সমর্থনে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, সিন্ধু-উপত্যকার মাটির নিচ হইতে (হরপ্পা

* Sir Mortimer Wheeler: *The Indus Age*, p. 60.

** "It is very interesting to note how this figure corresponds with, and to a certain extent explains, the later conception of Siva ...." *An Advanced History of India*

শহরে) যে-সকল কংকাল পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কয়েকটির মাথার হাড়ে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাট, স্নানাগার প্রভৃতি স্থানে যে-ভাবে একাধিক কংকাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আকস্মিক আক্রমণের কথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু অতি আধুনিক গবেষণায় এই কারণের উপর এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নহে, ইহা প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। (২) রন্ধনশালা স্নানাগার, রাজপথ প্রভৃতিতে কংকালের অবস্থান দেখিয়া প্লাবন বা ভূকম্প প্রভৃতি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা এই সভ্যতা বিনাশের কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। (৩) আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, বহিরাগত কারণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণই সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের জন্য সর্বাধিক দায়ী ছিল। এই আভ্যন্তরীণ কারণ হইল : প্রথমত, কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি রাজপুতানা মরুভূমির ক্রমপ্রসার এবং সিন্ধু নদের গতিপথের পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগর-সভ্যতা। রাস্তাঘাট, দালান-প্রাসাদ, সবকিছুই পোড়া ইটের দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই বিশাল পরিমাণ ইট প্রস্তুত করিতে যে-পরিমাণ জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন ছিল সেই প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া অরণ্য সম্পদ ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অরণ্য সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার ফলে বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটে। এমতাবস্থায় কৃষিকার্য জীবিকা হিসাবে অচল হইয়া পড়িলে মানুষ দলবদ্ধভাবে সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তৃতীয়ত, সিন্ধু নদে পলিমাটি জমিয়া জলস্তর ক্রমেই উপরে উঠিতে থাকিলে মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি শহর পুনঃ পুনঃ বন্যার কবলে পড়িয়াছিল। পর পর সাতটি স্তরে শহরটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্লাবনের হাত হইতে রক্ষার উপায় হিসাবেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার শেষদিকে শহরগুলির জল-নিকাশী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণও করা হইত না। চতুর্থত, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দরিদ্রদের বাসস্থান ঘিঞ্জী বস্তিতে পরিণত হইয়াছিল, বড় বড় দালানের ঘরগুলিকে ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হইয়াছিল। পূর্বেকার নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া শহরগুলি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চমত, সিন্ধু-সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বহু পশ্চাৎপদ অঞ্চলও এই সভ্যতার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে সেই সকল অঞ্চলের পশ্চাৎপদতা এই সভ্যতার উপর এক বোঝা-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন।

আকস্মিক কারণ প্লাবন, ভূকম্পন

আভ্যন্তরীণ কারণ

অরণ্য সম্পদ নাশ কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত

সিন্ধু নদের জল-নিকাশী ক্ষমতা নাশ — গতি পরিবর্তন

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি : নাগরিক ও শৃঙ্খলা নাশ

সিন্ধু-সভ্যতার প্রসার

আভ্যন্তরীণ কারণে সিন্ধু-সভ্যতার যখন অবক্ষয় ঘটিয়াছে সেই সময়ে আর্যদের আক্রমণ স্বভাবতই এই সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশ্য ইন্দ্রের নেতৃত্বে আর্যদের সিন্ধু-সভ্যতার শহর-নগর বিনাশের যে উল্লেখ অধ্যাপক বাসাম এবং

মর্টিমার হ্বইলার করিয়াছেন তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কতকটা রূপকথা (Legend) বলিয়াই বিবেচনা করেন।*

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করাই এ-পর্যন্ত সম্ভব হইয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের কারণসমূহ এখনও আনুমানিক এবং আরও অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

কারণসমূহ আনুমানিক

আর্যদের আগমন (Coming of the Aryans): আর্যগণ প্রথমে কোন্ দেশে বাস করিত সে-সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের মূল বাসস্থান ছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আর্যগণ ভারতের বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আর্যদের বাসস্থান ছিল এশিয়া-মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া (Cappadocia) অঞ্চলে। এই মতের বিরুদ্ধেও নানা যুক্তি দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আর্যদের মূল বাসস্থান ভিস্টুলা নদীর তীরে জার্মানিতে বা লিথুয়ানিয়ায় ছিল বলিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের, বিশেষত ব্র্যান্ডেনস্টিনের মতে, আর্যগণ প্রথমে আরল সাগরের দক্ষিণ তীরে বাস করিত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর্যদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল উহার একাংশ ইরাণ এবং অপরাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে মতবাদ

ব্র্যান্ডেনস্টিনের মত

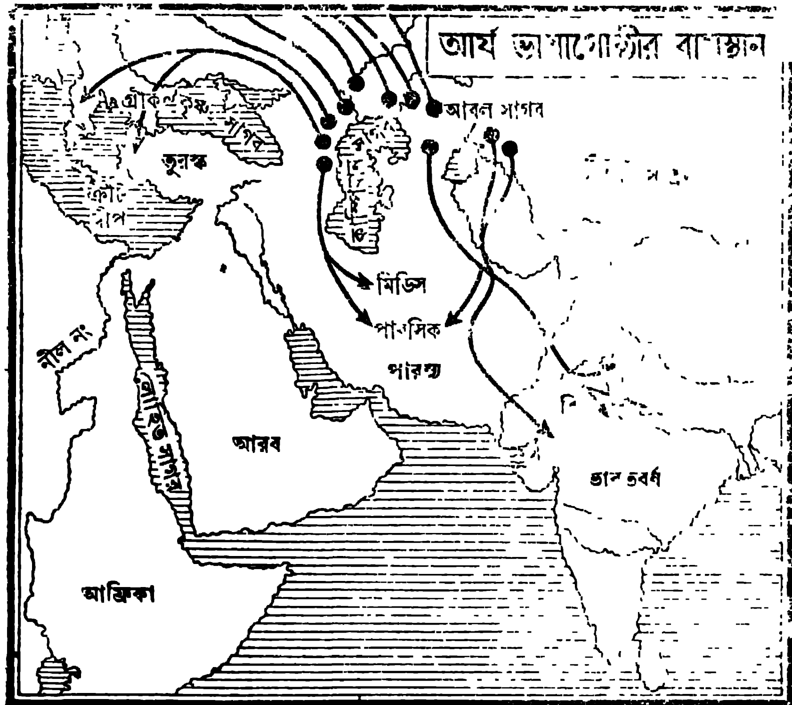
আর্য বসতি : আর্য সভ্যতা : ভারতীয় আর্যদের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের বাসস্থানের পরিবেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বিভিন্ন নদ-নদীর নামের উল্লেখ আছে। এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা—পাঞ্জাবের পঞ্চ নদী এবং সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, সরযূ প্রভৃতি নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া আর্যগণ বসতি বিস্তার করিয়াছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'সপ্তসিন্ধব' নামক দেশ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী,

ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার—'সপ্তসিন্ধব'

* Vide : Bharatiya Vidya Bhavan : *Vedic Age*, pp. 200-201,
V. A. Smith : *The Oxford History of India*, p. 32 (3rd Edn.)
A. L. Basham : *The Wonder that was India*, p. 29,
M. Wheeler : *The Indus Civilisation (Supplement)*, p. 95.

মোট এই সাতটি নদীর অববাহিকা অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, একথা আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে আর্যগণ বাংলাদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে নাই বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে, কারণ ঋগ্বেদে এই সকল অঞ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল অঞ্চলে বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। আর্য সভ্যতা ছিল 'গ্রাম-কেন্দ্রিক'—অর্থাৎ আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া।

দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ ও আসামে পরবর্তী কালে আর্য বসতি-বিস্তৃতি



বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ : পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণই ভারতীয় আর্যদের ন্যায় এত সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের মত গ্রন্থ রচনা করিবার প্রতিভা প্রদর্শন করে নাই। ভারতীয় আর্য ঋষিগণ চারিখানি গ্রন্থ বা চতুর্বেদ—যথা, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—রচনা করিয়া তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

চতুর্বেদ : ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব

'বিদ্'—অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চারিখানি বেদে জ্ঞানেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আর্যগণ তথা পরবর্তীকালের হিন্দুমাত্রেই 'বেদ' ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এজন্য বেদ মাত্রেই অপৌরুষেয় এই ধারণায়

'বিদ' অর্থ 'জ্ঞান'—বেদ অপৌরুষেয়

সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বেদের জ্ঞান লাভ করা হইয়াছিল বলিয়া বেদকে 'শ্রুতি' বলা হইয়া থাকে।

বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বপ্রথমে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সহস্রাধিক স্তোত্রে প্রকৃতির স্তুতিগান করা হইয়াছে। সামবেদ ঋগ্বেদের শ্লোকগুলির উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামবেদের স্তোত্রগুলি যাগ-যজ্ঞের কালে গানের ন্যায় সুর করিয়া গীত হইত। এজন্য সামবেদ 'সামগান' নামেও পরিচিত। যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র, অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে। সর্বশেষ বেদ—অর্থাৎ অথর্ববেদে কতকগুলি রহস্যজনক সাঙ্কেতিক চিহ্ন, চিকিৎসার মন্ত্র, পৃথিবী-স্তব, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বেদের চারিটি করিয়া অংশ আছে—যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

বিভিন্ন বেদের বিষয়বস্তু

যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র সংহিতায় সন্নিবিষ্ট আছে। এই অংশটি পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ অংশে পূজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ অংশ প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলেও কতক পদ্যও ইহাতে আছে। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম জটিল যাগ-যজ্ঞ রীতি প্রবর্তন করিয়া 'আরণ্যকে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শনিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল উহাই 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। বৈদিক গ্রন্থাদির 'অন্তে'—অর্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উপনিষদ্ 'বেদান্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরবর্তীকালে বেদ হইতে আরও নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এগুলি সূত্র-সাহিত্য নামে পরিচিত। সূত্র-সাহিত্য আবার ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শনে বিভক্ত।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ বা বেদান্ত

সূত্র-সাহিত্য ছয় বেদাঙ্গ, ছয় দর্শন (ষড়দর্শন)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আর্যদের সাহিত্য—অর্থাৎ চতুর্বেদকে নির্ভর করিয়া যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য ঋষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চারুশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ের উপরও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের আর্য ঋষিগণ ভারতীয় মনীষীর যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

অপরাপর গ্রন্থ

বৈদিক আর্যদের মনীষার অভিব্যক্তি

আর্যদের সমাজ ও ধর্ম: আর্যগণ বিনা বাধায় ভারতবর্ষে বসতি বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অনার্যদের সহিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই আর্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার করে। আর্যদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বসতি বিস্তার করিলেও শেষ পর্যন্ত আর্য ও ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ফলে সমাজে আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর্যগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি,

বর্ণবিভাগ—আর্য ও অনার্য

প্রশস্ত ললাট এবং উন্নত নাসিকাযুক্ত। পক্ষান্তরে অনার্যগণ ছিল কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি এবং তাহাদের নাসিকা ছিল অনুন্নত। এই দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণ—অর্থাৎ রঙের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম আর্য ও অনার্য বর্ণবিভাগ হইয়াছিল।

কিন্তু ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে অধিকতর সুষ্ঠু করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইল। তখন ক্ষমতা ও বৃত্তি—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ করা হইল। আধ্যাত্মিক কার্যাদি, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিতে যাঁহারা উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কার্যে পারদর্শী শ্রেণী ক্ষত্রিয়; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাদিতে পারদর্শী ব্যক্তিগণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। সমাজের উপর তিন শ্রেণীর—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যাহারা সেবা করিত তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। এইভাবে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যগণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সমাজের অধস্তন শূদ্রশ্রেণীতে স্থান হইল অনার্যদের। কিন্তু বৃত্তি অনুসারে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিভক্ত হইলেও এগুলির মধ্যে কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না বা সামাজিক আচার-আচরণে কোন ভেদাভেদ করা হইত না। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমেই দেখা দিল শ্রেণীগত সংকীর্ণতা। বৈদিক যুগের শেষভাগে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ এবং বিবাহ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা দিতে লাগিল।

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

জাতিভেদহীন সমাজ

পরবর্তীকালে জাতি-ভেদের কঠোরতার উদ্ভব

আর্য সমাজের মূলভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে কর্তা বলা হইত। পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল তাঁহার দায়িত্ব। পরিবারের ব্যক্তিবর্গের উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। বৈদিক আর্যগণের সামাজিক জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সততা, ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল সমাজের কতকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

পরিবার ও পারিবারিক আদর্শ

আর্যদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'চতুরাশ্রম'। সমাজের উর্ধ্বতন তিন শ্রেণী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে বাল্যকালে উপবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত। জীবনের এই পর্যায়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হইত। গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর জীবনের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়া গুরুর ন্যায় নির্লোভ, সরল ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের আদর্শে চরিত্র গঠন করিতে হইত। শাস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে শুরু হইত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—গার্হস্থ্যাশ্রম। বিবাহাদি করিয়া পরমব্রহ্মের কথা স্মরণ রাখিয়া জীবন যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আর্যগণকে (শূদ্র বাদে) বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে হইত—অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া

চতুরাশ্রম.

(১) ব্রহ্মচর্য

(২) গার্হস্থ্য

স্ত্রীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতে হইত। সেখানে কুটির বাঁধিয়া ধর্মাচরণের মাধ্যমে পরবর্তী আশ্রম—অর্থাৎ সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত।* চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় অরণ্যে জপ-তপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইত। এইভাবে আর্যদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটি মূর্ত ধর্মস্বরূপ ছিল।

(৩) বানপ্রস্থ
(৪) সন্ন্যাস

আর্য সমাজে নারীজাতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহারা পারিবারিক জীবনে যেমন পুরুষদের সহধর্মিণী ছিলেন তেমনি পরিবারের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা দান করিতেন। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর কাজ তাঁহারা করিতেন এবং উদ্বৃত্ত সময়ে স্বামীর সহিত ধর্মকর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। সে-যুগে কয়েকজন আর্য নারী শাস্ত্রালোচনা ও মন্ত্রাদি রচনায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্যনারীর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আর্য সমাজে নারীর স্থান

অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী ও মৈত্রেয়ী

আর্য সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এই ধর্ম ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা। ভারতীয় সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা। স্বভাবতই এই সভ্যতায় ধর্ম বলিতে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা বুঝাইত। প্রাকৃতিক প্রভাব বৈদিক আর্যদের সমাজজীবন, সাহিত্য, আচার-আচরণ, ধর্ম সবকিছুকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। যথা, আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বাতাসের দেবতা মরুৎ, উষা, সরস্বতী প্রভৃতির তাহারা উপাসনা করিত। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ, যজ্ঞ এবং আরও নানাপ্রকার জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে হইত। মূলত আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফলে মূর্তিপূজা, পশুবলি প্রভৃতি অনার্যদের ক্রিয়াকলাপও ক্রমে আর্যদের উপাসনা পদ্ধতিতে স্থানলাভ করিয়াছিল।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা—দ্যৌ, বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র, মরুৎ, উষা, সরস্বতী প্রভৃতি

আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন: আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনের মূলভিত্তি ছিল কৃষি। গরুর সাহায্যে লাঙ্গল টানানো হইত, এজন্য কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন অপরিহার্য ছিল। ইহা ভিন্ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন করিয়াও অনেকে জীবিকার্জন করিত। বৈদিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রতি গ্রামেই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত। বৈদিক যুগে

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য

* মনুসংহিতা

গরুড়পুরাণে বানপ্রস্থ-আশ্রম স্বগৃহে থাকিয়া সংসারের দায়িত্বমুক্তভাবে জীবন যাপন করিয়া পরবর্তী জীবনের—অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সুতী ও পশমের বস্ত্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র, কাঠের নানাপ্রকার আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হইত। নৌ-চালনা, গৃহনির্মাণ, কৃষির জন্য সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সে-যুগে জানা ছিল। বিদেশের সহিত বৈদিক আর্যদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এরূপ মনে করা ভুল হইবে না। বৈদিক আর্যগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করিত।* বৈদিক যুগে 'মনা' নামে একপ্রকার মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে ব্যাবিলনে 'মানা' নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগের 'মনা' ব্যাবিলনের 'মানা' এবং ল্যাটিন 'মিনা'র অনুকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপ সামঞ্জস্য হইতে বহির্জগতের সহিত বৈদিক আর্যদের যোগাযোগ ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে। 'মনা' ভিন্ন 'নিষ্ক' নামক অপর একপ্রকার মুদ্রা এবং গরু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বলি, শুল্ক ও ভাগ—এই তিন প্রকারের রাজস্ব সে যুগে আদায় করা হইত।

শিল্প: বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, গৃহনির্মাণ-শিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি

'মনা', 'নিষ্ক' ও গরু বিনিময়ের মাধ্যম

রাজস্ব: বলি, শুল্ক ও ভাগ

আর্যদের আহার্য ও পোশাক পরিচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থনৈতিক জীবনের ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। যব, গম প্রভৃতি ছিল সে-যুগের প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা ভিন্ন মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতিও তাহারা খাইত। অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞাদির সময় তাহারা সোমরস ও সুরা নামক মাদক পানীয় ব্যবহার করিত। গরুর দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল।

আর্যদের আহার্য—যব, গম, মাছ, মাংস, শাকসবজি; পানীয়—সোমরস ও সুরা

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়া আর্যদের কোন আড়ম্বর ছিল না। দেহের উপরাংশের জন্য 'উত্তরীয়' ব্যবহৃত হইত। নিম্নাংশের জন্য 'নিবি'—অর্থাৎ কৌপীনের মত একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহাকে 'অন্তর্বাস' বলা হইত। 'নিবি'র উপরে 'বাস' বা 'পরিধান'—অর্থাৎ একখানা বস্ত্র ব্যবহার করা হইত। ইহাকে 'বহির্বাস'ও বলা হইত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলংকার ব্যবহারের রীতি ছিল। অবশ্য কোন কোন প্রকার অলংকার কেবল আর্যনারীগণই ব্যবহার করিতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন: বৈদিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে-যুগে সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃংখলা বজায় ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় না থাকিলে ঐরূপ উন্নত ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবন যে গড়িয়া উঠিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই সমাজের শান্তি ও শৃংখলা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদক্ষ ও সুশৃংখল ছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচায়ক

* R. C. Majumdar and A. D. Pusalker: *The Vedic Age*, pp. 397, 461.

আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকার্য প্রথমে দলপতির উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা বসতি বিস্তারের ফলে দলপতিগণের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ক্রমে স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজজীবনে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে দলপতির আদেশ মানিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তাও সমাজের জনগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। এইভাবে ক্রমে দলপতি 'রাজা' বা 'রাজন্' নামে পরিচিত হন। রাজা সমগ্র রাজ্যের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম, কিন্তু কার্যত তাঁহাকে 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের লইয়া 'সভা' গঠিত হইত। জনগণের পরিষদের নাম ছিল 'সমিতি'। রাজ্যশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যকে 'জন' বা 'বিশ' বলা হইত এবং রাজাকে 'বিশপতি' বা 'রাজন্' নামে অভিহিত করা হইত। রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিচালনার ভার ছিল 'গ্রামণী'র উপর। রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'পুরোহিত', 'সেনানী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তরবারি, কুঠার, তীর-ধনুক, বর্শা প্রভৃতি ছিল সে-যুগের যুদ্ধাস্ত্র।

রাজপদের উৎপত্তি

'রাজন্'—'সভা' ও 'সমিতি'

বিশ

গ্রাম—'গ্রামণী'

রাজকর্মচারিগণ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি লাগিয়াই থাকিত। ফলে দুর্বল রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুলি কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে। এইভাবে বৈদিক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজ্যের যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল তেমনি রাজ-ক্ষমতাও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রাজা দিগ্বিজয়ে সাফল্যলাভ করিয়া 'অশ্বমেধ', 'রাজসূয়', 'রাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করিতেন এবং 'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নিজ বর্ধিত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন।

'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী'

বৈদিক যুগের শেষভাগকেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলা হয়। বস্তুত, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলিয়া কোন পৃথক যুগের উল্লেখ করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল বৈদিক যুগেরই অংশবিশেষ।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

(Jainism and Buddhism)

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Brahmanism) : বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। কতকগুলি জটিল, সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। আন্তরিক ভক্তি, সততা ও ধর্মপরায়ণতা অপেক্ষা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, হোম, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিলতা

এই জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বভাবতই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এই বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন পুরোহিত শ্রেণী। এই সুযোগে পুরোহিত শ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি, পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সেই যুগের ধর্মরীতি হিসাবে যেমন প্রচলিত হইল তেমনি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ আন্তরিকতাশূন্য জনকল্যাণের আদর্শচ্যুত ধর্মের প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ক্রমেই বিরুদ্ধভাব জাগিতে লাগিল। সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধগম্য ধর্ম-পন্থা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন তখন অনুভূত হইতে লাগিল। উপনিষদের স্বাধীন চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম-বিষয়ে নূতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আরম্ভ হইল। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহাদের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য

বৈদিক ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব

জৈন ধর্ম : মহাবীর 'জিন' (Jainism Mahavira) : মহাবীর 'জিন'-এর নামানুকরণেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম 'জৈন ধর্ম' বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশ জন 'তীর্থঙ্কর'—অর্থাৎ মুক্তির পথ-নির্মাতা এই ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর ছিলেন চতুর্বিংশ এবং শেষ তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। মহাবীর জৈন ধর্মমতের কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উহার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য সাধারণত তাঁহার নামানুকরণেই এই ধর্মমত 'জৈন ধর্ম' বলিয়া পরিচিত।

তীর্থঙ্করগণ

মহাবীর ছিলেন কুন্দপুর নামক স্থানের সিদ্ধার্থ নামে এক ক্ষত্রিয় দলপতির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল ত্রিশলা। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে কতক

কতক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীর যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন করেন।

মহাবীরের পরিচয়



মহাবীর

তারপর—অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের সন্ধানে তপস্যা শুরু করেন। গোঁসাল নামে জনৈক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর এবং স্বাধীন-ভাবে আরও ছয় বৎসর—মোট বার বৎসর তপশ্চরণের পরও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না। একপ্রকার হতাশ হইয়াই তিনি ঋজুপালিকা নদীতীরে পুনরায় নূতনভাবে তপস্যায় রত হন। এইবার তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল। এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর তপশ্চর্যা করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া—অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে শুরু করেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া 'জিন'—অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত, 'নিগ্রন্থ'—অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি হইতে গ্রন্থিহীন (বন্ধনহীন)—নামে পরিচিত। সাধারণ্যে অবশ্য ইহা 'জিন' নামানুকরণে 'জৈন' ধর্ম নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপুরীতে দেহরক্ষা করেন।*

গৃহত্যাগ ও তপশ্চরণ

'কৈবল্য' লাভ: 'জিন' বা 'জিতেন্দ্রিয়'

মহাবীর জিন-প্রবর্তিত ধর্ম 'নিগ্রন্থ' বা জৈন ধর্ম নামে পরিচিত

মহাবীর জিন কোন নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পার্শ্বনাথ-প্রচারিত ধর্মমতের কতক পরিবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে উহার প্রচারের পথ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল চারিটি সূত্র ছিল: সত্যবাদিতা, চুরি না করা, হিংসা না করা ও লোভ সম্বরণ করা। এই চারিটি সূত্রের সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিবার আরও একটি নূতন সূত্র মহাবীর যোগ করিয়াছিলেন।** মহাবীরের ধর্মনীতিতে

জৈন ধর্মের সার

* মহাবীরের দেহত্যাগের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। Vide *An Advanced History of India* (3rd Ed., 1967), p. 80.

** "... he (Parsvanath) enjoined on his disciples the four great vows of non-injury, truthfulness, abstention from stealing and non-attachment. To these Mahavira added the vow of *Brahmacharya* or continence." *Ibid.*, p. 81.

চরম অনাসক্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি পার্থিব কোন কিছুর প্রতি আসক্তি বা লোভ থাকা অনুচিত মনে করিতেন। এমনকি, পরিধানের বস্ত্রের জন্যও যাহাতে কোনপ্রকার আসক্তি জন্মিতে না পারে সেজন্য তিনি স্বয়ং দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন শত বৎসর পর, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাঁহার শিষ্যগণের অনেকে 'দিগম্বর' ধর্মরীতি ত্যাগ করিয়া 'শ্বেতাম্বর' নামে জৈন ধর্মেরই অপর এক শাখার সৃষ্টি করেন। অদ্যাপি জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই দুই সম্প্রদায় আছে। বলা বাহুল্য, 'দিগম্বর' সম্প্রদায় পরবর্তীকাল হইতেই বস্ত্রাদি পরিধান করিতে শুরু করিয়াছিল।

'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায়



পার্শ্বনাথ

আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভই জৈন ধর্মের আদর্শ। জৈন ধর্মমতে 'নির্বাণলাভ'—অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইতেআত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভেরতিনটি পন্থা আছে—যথা, সৎ-জ্ঞান, সৎ-কর্ম ও সৎ-ব্যবহার। জৈন ধর্মমতে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জৈনগণ বেদকে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করে না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে জৈনরা হিন্দুদের ন্যায়ই বিশ্বাসী। অহিংসা জৈন ধর্মের মূলভিত্তি। অহিংসা নীতি প্রয়োগে জৈনগণ পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করে। সৎ-কর্ম ও কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে আত্মার উন্নতিসাধন এবং ক্রমে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভই হইল জৈন ধর্মমতের উদ্দেশ্য। এই কারণে দেহকে যথাসম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে কালাতিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্রকৃতভাবে জৈন ধর্ম পালন করা গৃহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই এই কঠোর ধর্মরীতি পালন করা সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য জৈন ধর্ম অনেকটা বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহীদের পক্ষেও উহা পালন করা সম্ভব হয়। জৈন ধর্ম বলিতে বর্তমান কালে যাহা বুঝা যায় উহা মহাবীর জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এখন গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা জৈন ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ভারতের বাহিরে প্রচারলাভ করে নাই।

জৈন ধর্মের আদর্শ—নির্বাণলাভ

জৈন ধর্মমতে অহিংস নীতির ব্যাপকতা

পরবর্তীকালে জৈন ধর্মের রূপান্তর

মহাবীরের ধর্মনীতিগুলি 'আগম' ও সূত্রজ্ঞান' বা 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত।

জৈন ধর্ম-সাহিত্য : 'পূর্ব'
পাটলিপুত্র নগরে ও গুজরাটে জৈন ধর্মসভা
অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র
জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী —পরিশিষ্ট পার্বণ, রাজাবলীকথে প্রভৃতি

তাঁহার মূল উপদেশাবলী চৌদ্দটি 'পূর্ব'—অর্থাৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাটলিপুত্র নগরে আহূত ধর্মসভায় জৈন ধর্ম বিষয়ে যে-সকল আলোচনা হইয়াছিল সেগুলি বারটি 'অঙ্গ', অর্থাৎ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরবর্তীকালে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে) গুজরাটে অপর একটি জৈন ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা কর্তৃক জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র এই চারিটি ভাগে সংকলিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম সম্পর্কে কাহিনী-কিংবদন্তী—যথা, 'পরিশিষ্ট পার্বণ', 'রাজাবলীকথে' প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্ম : গৌতম বুদ্ধ (Buddhism : Gautama Buddha). বৈদিক ধর্মের জটিলতা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সহজ ও সরল ধর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য যে-সকল মনীষী সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত বৌদ্ধ ধর্ম নামে পরিচিত। নেপালে তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর শাক্য জাতির নায়ক শুদ্ধোদন ছিলেন গৌতমের পিতা। তাঁহার মাতা ছিলেন মায়াদেবী। গৌতমের আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন। মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। এজন্য তাঁহার অপর নাম হয় গৌতম।

পরিচয়

বাল্যকাল হইতেই গৌতম ছিলেন ধর্মভাবাপন্ন। রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হইলেও জীবের প্রতি দয়া, ধর্ম বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই গৌতমের অন্তরেরদয়া, জীবে প্রেম ও অহিংসার পরিচয় পাওয়া গেল। সেই সময়কার সামাজিক রীতি অনুসারে ষোল বৎসর বয়সেই গোপা বা যশোধরা বা বিম্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল। ইহার পর কিছুকাল গৌতম গৃহী হিসাবেই কাটাইলেন। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তাঁহাকে ক্রমেই বিচলিত করিয়া তুলিল। কিভাবে মানুষকে এই দুঃখ-দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

বাল্যজীবন



গৌতম বুদ্ধ

বিবাহ

বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জাত হইল। পুত্রের নাম রাখা হইল রাহুল।

পুত্রসন্তান লাভ—রাহুল

গৃহত্যাগ

কিন্তু পুত্র জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম দেখিলেন যে, তিনি ক্রমেই সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস সবকিছু ত্যাগ করিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন ২৯ বৎসর।

সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কঠোর তপস্যা, আত্মপীড়ন, কৃচ্ছ্রসাধন—সর্বপ্রকারের

কঠোর তপস্যা

যোগসাধন করিয়া দেহকে অস্থিচর্মসার করিলেন, বহু তীর্থস্থান পর্যটন করিলেন। তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। অবশেষে তিনি উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার দেহ দুর্বল হইল, তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল কৃচ্ছ্রসাধন ও দেহপীড়নের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না; দেহ যদি সুস্থ ও স্থির না থাকিল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে?

বোধগয়ায় তপস্যা

সুতরাং তিনি নৈরঞ্জনা (বর্তমানে লীলাজান) নদীর জলে স্নান করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে বসিলেন। জনৈক ধনবান বণিকের কন্যা সুজাতা নিজ পুত্রসন্তান জাত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে বনদেবতার পূজা দিতে গিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে গৌতমকে দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতারূপে মিষ্টান্ন নিবেদন করিলেন। গৌতম সেই মিষ্টান্ন ভোজনের পর অনাহারক্লিষ্ট দেহে শক্তিলাভ করিলে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ

ঐ রাত্রিতেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এই দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি 'বুদ্ধ'—অর্থাৎ জ্ঞানী, 'তথাগত'—অর্থাৎ যিনি পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—এই সকল বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা 'বোধিদ্রুম' নামে এবং সেই স্থানটি 'বোধগয়া' বা 'বুদ্ধগযা' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম সারনাথের নিকট মৃগশিখাবনে তাঁহার সর্বপ্রথম বাণী

বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন

প্রচার করেন। ইহার পর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ সংঘও স্থাপন করেন। আশী বৎসর

দেহত্যাগ

বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে।

গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে

বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি

মানুষের যাবতীয় দুঃখকষ্ট লোভ ও অজ্ঞতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অজ্ঞতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আসক্তি—অর্থাৎ পার্থিব সবকিছুর প্রতি লোভ হেতুই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে। এজন্য জন্ম-জন্মান্তরে

তাহাকে জরা, ব্যাধি, দুঃখকষ্ট, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সৎ-কর্ম দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে পুনর্জন্ম ও দুঃখকষ্ট ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আত্মার এই চরম শান্তি বা মুক্তিকে তিনি 'নির্বাণ' আখ্যা দিয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের বাস্তববাদিতা

বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তাঁহার ধর্মমত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল না। সংসারধর্মী জনসাধারণের জন্যই তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অত্যধিক কঠোর তপশ্চর্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে অত্যধিক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার বাধা সৃষ্টি করে তেমনি অত্যধিক ভোগবিলাসও আত্মার উন্নতির পথে বাধাদান করে। সুতরাং মধ্য-পথ* অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই কারণে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। এই মধ্য-পন্থা অনুসরণের আটটি রীতি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত। এইগুলি হইল সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য, সৎ-দৃষ্টি, সৎ-শ্রম, সৎ-মনোবৃত্তি, সৎ-ব্যবহার, সৎ-জীবন ও সৎ-আদর্শ। এই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণ করিলেই মানুষ আত্মার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল নীতি হইল : অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি, ঐশ্বর্য ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, অর্থ-লিপ্সা ত্যাগ করা ও পশুবলি না দেওয়া। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরুষেয়তা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। বুদ্ধদেব-স্থাপিত 'সঙ্ঘ'—অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের লইয়া গঠিত একটি সংগঠন ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। 'ত্রিপিটক' অর্থাৎ 'সূত্র-পিটক', 'বিনয়-পিটক' ও 'অভিধর্ম-পিটক' এই তিনটি অংশে বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কাহিনীগুলি 'জাতক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মধ্য-পথ : অষ্টাঙ্গিক মার্গ

অপরাপর নীতি

বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ; ত্রিপিটক : সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম ; জাতক

চারিটি বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান

বৌদ্ধ ধর্মে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূরীকরণের জন্য কয়েকবার বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে মহাকাশ্যপ সর্বপ্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পর বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয়, সম্রাট্ অশোক কর্তৃক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ

* 'মধ্য-পথ' (Middle Path)—'মধ্যম পথ' (Middling Path) নহে। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-মন্দের মাঝামাঝি, সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা মধ্য-পন্থা বলা হয় না। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি না করিয়া ধর্ম বিষয়ে মাঝামাঝি পথে চলাই তিনি শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিতেন। ইহা 'মধ্য-পথ' বা 'মধ্য-পন্থা'।

কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌদ্ধসভা আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গীতিতে, অর্থাৎ ধর্মসভায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করা হয়। চতুর্থ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্মে হীনযান ও মহাযান এই দুই মতের মধ্যে পার্থক্য দূর করা সম্ভব না হইলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনযান—যাহারা বুদ্ধের নিরাকার উপাসনায় বিশ্বাসী এবং মহাযান—যাহারা বুদ্ধের মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। [কণিষ্কের ধর্মমত দ্রষ্টব্য]

ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব

(Importance of Jainism and Buddhism in Indian History): জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। জাতিভেদশূন্য সমাজ-ব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে জৈন ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জাতিভেদজনিত সংকীর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজা; অনাথপিণ্ডদ, সারিপুত্র, মোগ্‌গলান প্রভৃতির ন্যায় ধনবান বণিক; আনন্দ, উপালি প্রভৃতির ন্যায় সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক—সকলেই বুদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন।

ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী —ভারতের জীবনাদর্শ

এই পরম ভ্রাতৃত্ব, জাতিবৈষম্যহীন ঐক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি মানবিকতার নীতিজ্ঞান প্রচার করিয়া গৌতম বুদ্ধ ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট্ অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং বর্তমান ভারতের মূলনীতি হইল ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী। ভারতের ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের বাণীর গুরুত্ব অত্যধিক, ইহা অনস্বীকার্য।

পঞ্চম অধ্যায়

(১) বৈদেশিক আক্রমণ

(Foreign Invasions)

ভারতবর্ষের বিশাল ভূখণ্ডকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সুবৃহৎ দেশের উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অতিপ্রাচীনকালে যেমন আর্য জাতিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমনি পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশী আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই সকল আক্রমণকারীর অনেকে এ-দেশকে স্থায়ী বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারতের বিশাল মানবসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, আবার অনেকে এ-দেশকে শোষণ করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল।

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ

পারসীক আক্রমণ (Persian Invasion) : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য যখন সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যহীন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন 'উত্তরাপথ' নামে অভিহিত হইত। উত্তরাপথের রাজ্যগুলির মধ্যে গান্ধার, কাম্বোজ ও মদ্র ছিল অন্যতম প্রধান। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, টেসিয়াস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পারস্য সম্রাট্ সাইরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০) গান্ধার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গান্ধার রাজ্য জয় করিবার কালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত সাইরাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া টেসিয়াস্ উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় সাইরাস্ কর্তৃক গান্ধার রাজ্য জয়ের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু নিয়ারকাস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় সাইরাসের ভারত আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। যাহা হউক, সাইরাসের পৌত্র দরায়াসের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। তাঁহার আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকা পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই অংশকে পারসীক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছিল। সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতীয় দেশগুলি হইতে আদায় হইত। দরায়াসের পুত্র জারেক্সিসের আমলে পারসীক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী পারসীক সম্রাট্ তৃতীয় দরায়াস্ আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হইলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) ভারতে পারসীক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল।

সাইরাস্

দরায়াস্

জারেক্সিস্

তৃতীয় দরায়াস্: পারসীক অধিকারের অবসান

গ্রীক-আক্রমণ (Greek Invasion) : আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ : পারসীক আক্রমণের পরবর্তী বৈদেশিক আক্রমণ গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে ঘটিয়াছিল। পারস্য সম্রাট্গণ কয়েক শতাব্দী পূর্বে একবার গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার পারস্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তৃতীয় দরায়াস্‌কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক উভয় প্রকার রাজ্যই ছিল। পুরু বা পৌরব, তক্ষশিলা, অভিসার, ক্ষুদ্রক, অস্মক, গান্ধার, সৌভূতি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আলেকজাণ্ডারের পারস্য জয়

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁহাকে স্বভাবতই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না।

আলেকজান্ডারের বিজয়অভিযান
আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য
সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যসমূহ
স্বাধীন রাজ্যসমূহ
অভিযান পথ
ভারত
আরব সাগর
পারস্য উপসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
আরব
মিশর
নীল নদ
মেমফিস
লিবিয়া
সিরিয়া
আর্মেনিয়া
মেসোপটেমিয়া
টাইগ্রিস
ইউফ্রেটিস
ব্যাবিলন
সুসিয়ানা
পারসিস
পার্সেপোলিস
কারমানিয়া
মিডিয়া
পার্থিয়া
আরিয়া
ব্যাকট্রিয়া
গেড্রোসিয়া
আরাকোসিয়া
গজনী
পাটলা
থ্রেস
ম্যাসিডন

পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলির রাজাগণ দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া দূরের কথা, পূর্বাহ্নেই আক্রমণকারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পুরু রাজ্যের (বা পৌরব রাজ্যের) রাজা পুরুর সহিত অম্ভির শত্রুতা ছিল। পুরুকে তিনি কোনপ্রকারেই পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। বিদেশী আক্রমণকারীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাকে সাহায্যদান করিয়া অম্ভি পুরুরাজের সর্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক রাজা পুরু পরাধীনতা অপেক্ষা দেশ-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি ঝিলামের তীরে এককভাবে বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সম্মুখ সমরে পুরুকে পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদের [গ্রীক নাম 'হাইডাস্‌পিস্‌' (Hydaspes)] অপর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তারপর এক অন্ধকার রাত্রিতে গোপনে ঝিলাম নদের গতিপথ ধরিয়া সাতাশ কিলোমিটার (সতের মাইল) দূরে এক স্থানে উহা অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে পুরুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। * অতর্কিত আক্রমণ এবং পূর্ব রাত্রের বারিপাতে কর্দমাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ এবং তাঁহার যুদ্ধরথগুলি আশানুরূপ যুদ্ধ করিতে পারিল না। ফলে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। পুরু শরীরের নয়টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

তক্ষশিলারাজ অম্ভি কর্তৃক বশ্যতা স্বীকার

বীর রাজা পুরু

হাইডাস্‌পিস্‌ বা ঝিলামের যুদ্ধ

এমতাবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল। আলেকজাণ্ডার পুরুকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন প্রশ্ন করিলে বীর পুরু রাজোচিত সম্মান দাবি করিলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্ব ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিলেন। একবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেও পুরুর রাজ্য অধিকার করিয়া রাখা সহজ হইবে না একথা দূরদর্শী বীর আলেকজাণ্ডারের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। তদুপরি পার্শ্ববর্তী অপরাপর রাজ্য যাহা তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলিও পুরুর রাজ্যভুক্ত করিয়া দিলেন। আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদের উভয় তীরে দুইটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঝিলাম নদের অতিক্রম স্থানে যেখানে তাঁহার প্রিয় ঘোড়া বুকিফালা মারা গিয়াছিল সেখানে 'বুকিফালা' এবং যুদ্ধজয়ের স্মৃতি হিসাবে ঝিলামের অপর তীরে 'নিকাইয়া' শহর স্থাপন করিয়াছিলেন।

পুরু-আলেকজাণ্ডারের মৈত্রী



গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

* Vide V. A. Smith : *Early History of India*, pp, 68-69, 82-89.

পুরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। পুরুর সহিত যুদ্ধে ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রীকগণ পাইয়াছিল এবং মগধের সামরিক শক্তির যে সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল তাহার ফলেই গ্রীকগণ আর অগ্রসর হইতে রাজী হয় নাই। বস্তুত, পুরুর সহিত যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রীকগণ পায় নাই। বাধ্য হইয়াই আলেক-জাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যকে স্থলপথে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। অপর একদলকে জলপথে প্রেরণ করিলেন। ফিরিবার পথে আলেকজাণ্ডার মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন, শিবি প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ব্যাবিলনে পৌঁছিবার পর আলেকজাণ্ডার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অসুস্থতার ফলে ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল (জুন ১৩, খ্রীঃ ইঃ ৩২৩)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। সেনাপতি সেলুকসের অংশে সীরিয়া এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু ও পাঞ্জাব-সহ পশ্চিম এশিয়ার বিজিত অঞ্চল পড়িয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

তাঁহার মৃত্যু (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)

ম্যাসিডনের রাজা ভিন্ন ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ব্যাক্‌ট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণ, পার্থিয়া বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শকস্তান হইতে আগত শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে কুষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী।

বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির আক্রমণ

ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ (Invasion of India by the Bactrian Greeks): ব্যাক্‌ট্রীয় —অর্থাৎ বাহ্লিক দেশ ও পার্থিয়া বা খোরাসান সেলুকাসের উত্তরাধিকারীদের আমলে সীরিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সীরিয়ার রাজা তৃতীয় এ্যান্টিয়োকোস বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুই অঞ্চল পুনরায় নিজ অধিকারে আনিতে অকৃতকার্য হন। বাহ্লিক গ্রীক রাজা প্রথম ডায়োডটাসের অধীনে ব্যাক্‌ট্রীয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই বংশেরই রাজা ডেমেট্রিয়স্ (Demetrios) আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-উপত্যকা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেমেট্রিয়স্ যখন ভারতবর্ষে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে ইউক্রেটাইডিস্ (Eukratides) ব্যাক্‌ট্রীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। ডেমেট্রিয়সের মৃত্যুর পর ইউক্রেটাইডিস্ সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল নিজ অধিকারভুক্ত করেন। অল্পকাল পরে ব্যাক্‌ট্রীয়া পার্থিয়ান বা পহ্লব নামে এক যাযাবর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইলে ব্যাক্‌ট্রীয়ার গ্রীকগণ কেবল ভারতবর্ষে তাঁহাদের বিজিত রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। ঐ সময় হইতে তাঁহারা

ডেমেট্রিয়স্

ইউক্রেটাইডিস্

সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজায় পরিণত হন। ব্যাকট্রীয় গ্রীক রাজাগণের মধ্যে মিনাণ্ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্মাচার্য নাগসেনের নিকট মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনাণ্ডার পাঞ্জাবের 'সাকল', অর্থাৎ শিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

মিনাণ্ডার

শক-পহ্লব ও কুষাণ আক্রমণ (Scythian, i.e. Saka-Parthian and Kushan Invasions): উত্তর-ভারতে গ্রীকগণ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য পরবর্তীকালে শক-পহ্লব ও কুষাণ জাতির আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর শক জাতি ঈউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়া হইতে বিতাড়িত হয়। তাহারা খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক একশত বৎসর পূর্বে কাবুল নদীর উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শক জাতি কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহ শকস্তান (বর্তমানে শিস্তান) নামে পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে শকগণ সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের শকদের মধ্যে প্রথম পরাক্রমশালী রাজা হিসাবে মোয়েস্ বা মোগের নাম পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম-ভারতে এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। পুষ্করাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মোগ রাজাধিরাজ উপাধি ধারণপূর্বক রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজাগণ ছিলেন অয় বা অজেস্, অজিলিস্ ও দ্বিতীয় অয়।

শক আক্রমণ . মোয়েস্ বা মোগ, অয়, অজিলিস্

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজাগণ ক্ষহরত ও কার্দমক এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কার্দমক শাখার শকরাজাগণ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে চস্টন ও রুদ্রদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুদ্রদামন ছিলেন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পহ্লবগণ হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পহ্লবগণ গান্ধারের একাংশ শক অধিকার হইতে জয় করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। পহ্লবরাজাগণের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস্ (Gondophernes) ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। তাঁহারই আমলে খ্রীষ্ট ধর্মযাজক সেণ্ট্ টমাস্ (St. Thomas) তাঁহার রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। পরবর্তী-কালে কুষাণ বংশের হস্তে পহ্লব শাসনের অবসান ঘটে।

পহ্লব আক্রমণ গণ্ডোফার্নিস

চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীনকালে ঈউ-চি (Yue-chi) নামক এক যাযাবর জাতি বাস করিত। হিউঙ-নু নামে অপর এক জাতির লোক তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক)। ঈউ-চি জাতি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত সিরদরিয়া নদীর এবং পরে অক্ষু নদীর (আমুদরিয়া) অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসতি বিস্তার করে।

কুষাণ আক্রমণ

এখানে বসবাসকালে তাহারা পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার মধ্যে কুষাণগণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা ঈউ-চি জাতির পাঁচটি শাখাকে সঙ্ঘবন্ধ করিতে সমর্থ হয়।

কুষাণরাজাগণ : কুজলকারা কদ্‌ফিসস্ (প্রথম)

কুষাণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুজলকারা কদ্‌ফিসস্ (প্রথম)। ইনি প্রথম কদ্‌ফিসস্ নামেই সমধিক পরিচিত। প্রথম কদ্‌ফিসস্ পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বা বীম কদ্‌ফিসসের আমলে কুষাণ রাজ্য গান্ধার অঞ্চল হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মালব ও পশ্চিম-ভারতের শক ক্ষত্রপগণ দ্বিতীয় কদ্‌ফিসস্‌কে তাঁহাদের অধিরাজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন।

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং দ্বিতীয় কদ্‌ফিসসের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি ছিল সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক, কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-ইতিহাসে কুষাণ বংশের গুরুত্ব একমাত্র কণিষ্কের কৃতিত্বের ফলেই অর্জিত হইয়াছিল।

কণিষ্ক

কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য খোটান ও খোরাসান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার ও কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি চীনের সেনাধ্যক্ষ প্যান চাওকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কাবুল, পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর, অর্থাৎ পেশোয়ার।

কণিষ্ক নিজে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহা শকাব্দ নামে পরিচিত। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে উহাই কণিষ্ক প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মহাযান ও হীনযান ধর্মমত : বৌদ্ধ সঙ্গীতি

তাঁহার আমলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। হীনযান ধর্মমত অনুসারে বুদ্ধের কোন মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। মহাজান ধর্মমতে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করা হইত। কণিষ্ক নিজে মহাযান ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার আমলে কাশ্মীরে (কাহারও কাহারও মতে জলন্ধর বা গান্ধারে) এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বসুমিত্র উহার সভাপতি এবং অশ্বঘোষ উহার সহ-সভাপতি ছিলেন।

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা; গান্ধার শিল্প

শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কণিষ্ক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশারদ চরক প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। গান্ধার তখন গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এক অতি উচ্চমানের ভাস্কর্য ও শিল্পরীতির কেন্দ্রে

পরিণত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য রীতির উৎকর্ষও সেই সময়ে মথুরা ও অমরাবতী অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল কৃতিত্বের জন্য কণিষ্ক কেবল কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়াই নহে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, জনস্বার্থে শাসন পরিচালনা প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে ভারতের 'দ্বিতীয় অশোক' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

কুষাণশ্রেষ্ঠ

হূণ আক্রমণ (Huna Invasion): খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম চীনের ঈউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করিয়া হূণগণ পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের এক শাখা ইওরোপে ও অপর শাখা অক্ষু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। হূণদের এই শাখাই গুপ্ত বংশের রাজা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে হূণ নেতা তোরমান ও মিহিরগুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া প্রায় মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাট্ ভানুগুপ্ত তাঁহাদের এই অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। গুপ্ত সম্রাট্ বলাদিত্য মধ্যভারত হইতে হূণ আধিপত্যের অবসান ঘটান। মিহিরগুল পুনরায় বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইলে মালবরাজা যশোধর্মন তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তথাপি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হূণ দল তাহাদের নেতাদের অধীনে স্বাধীনভাবে বসবাস করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

হূণ নেতা তোরমান ও মিহিরগুলের ভারত আক্রমণ

(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ধরন

(Nature of Resistance by the Indians to Foreign Invasions)

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি দেশবাসীর একতা, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের সামরিক শক্তি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে আক্রমণকারীর সংকল্পের দৃঢ়তা, দেশজয়ের গৌরবলিপ্সা, সম্পত্তি লাভের উন্মাদনা, বসতি বিস্তারের অথবা নিছক লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি আক্রমণকারীকে আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর দুর্ধর্ষ করিয়া তোলে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে যখন বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তাহাদের সাফল্য এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তির মূল উৎস

আর্য জাতির ভারত আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া ইওরোপীয়দের ভারত আগমনের পূর্বাবধি বহিরাগত সকল জাতি ও আক্রমণকারীই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তিন দিক সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং উত্তর সীমান্ত হিমালয় পর্বতমালায় সুরক্ষিত ভারতে স্থলপথে প্রবেশ করিবার একমাত্র সহজ উপায়ই ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবর্ত্ম। অথচ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য প্রাচীনকালে বিদ্যমান না থাকিবার ফলে এবং বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন সুনিশ্চিত পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টার অভাব হেতু আক্রমণকারীদিগকে এই পথে ভারতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারসীক আক্রমণের কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত উত্তরাপথ নামে অভিহিত হইত। সেই সময়ে ঐ অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে গান্ধার, কাম্বোজ, মদ্র প্রভৃতি ছিল অন্যতম প্রধান। কিন্তু এই সকল রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ এগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই। ব্যক্তিগত সাহস, জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতিতে ভারতীয় সৈনিক পশ্চাৎপদ ছিল না। গান্ধার রাজ্য আক্রমণকালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত পারসীক সম্রাট্ সাইরাসের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, সর্বোপরি সমরকৌশলের অপকৃষ্টতা ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

পারসীক আক্রমণের সাফল্যের কারণ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-পরস্পরের সহিত বিবদমান উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাগণ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নিজ নিজ স্বাধীনতা উপঢৌকন দিয়া এবং বিদেশী আক্রমণকারীকে সামরিক সাহায্যদান করিয়া অথবা রসদ যোগাইয়া নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু এককভাবে দেশরক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত দৃঢ়তা ও মর্যাদা-বোধ প্রদর্শন করিয়া পুরুরাজ ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। রাজা পুরু ভিন্ন মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক দেশও নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই। তক্ষশিলার রাজা অম্ভির নীচ স্বার্থপরতার পার্শ্বে পুরুরাজ ও প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলির দেশাত্মবোধ তাঁহাদিগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ভারতীয়দের চেষ্টা

রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে সমর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে। কৌটিল্য বা চাণক্য নামক তক্ষশিলার জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সমরকৌশল ও

রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভের পর চন্দ্রগুপ্ত দুর্বল অথচ অত্যাচারী নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের বিজিত রাজ্যের গ্রীক শাসনকর্তাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বিদেশী শাসনমুক্ত করেন। এদিকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস সীরিয়া ও ভারতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের অধিকার হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অভিযানে অগ্রসর হন। আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারত-জয়ে আসিয়া ভারতের রাজাদের সামরিক দুর্বলতা এবং ঐক্যের অভাব সেলুকাস দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট নামক চারিটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে এবং তাঁহার সহিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। দেশরক্ষার তথা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ঐক্য ও দেশাত্মবোধ যে প্রধান উপায় তাহা সেলুকাসের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভে প্রমাণিত হইয়াছিল।

সেলুকাসের আক্রমণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রতিহত

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা ও দুর্বলতার সুযোগে বাহ্লিক বা ব্যাকট্রীয় (Bactrian) গ্রীকগণ, পার্থিয়া (Parthians) বা পহ্লবদেশের পহ্লবগণ, শকস্থান হইতে শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে আগত কুষাণগণ পর পর ভারত আক্রমণ করে। এই সকল বিভিন্ন জাতির আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতা আক্রমণকারীদের সাফল্যের জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দুর্বলতার কালেও স্বাধীনচেতা রাজাগণের দেশাত্মবোধ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য জীবনমরণ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শকগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের অপহৃত অংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে (নাসিকের সন্নিকটে) সাতবাহনদের রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান (Pratishthana)। ইহার বর্তমান নাম পৈঠান (Paithan)।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতার কালে বৈদেশিক আক্রমণ : গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর বিজয়

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য বহিরাগত জাতিকে ভারত আক্রমণের যেমন সুযোগ দান করিয়াছিল তেমনি তাহাদিগকে ভারতের কতকাংশ, এমনকি কুষাণ আমলে এক বিশাল অংশ জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও দেশরক্ষার অঙ্গীকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পুরুরাজ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর ন্যায় স্বাধীনচেতা, দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন নৃপতির অভাবও সেই যুগে ছিল না।

উপসংহার

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব (Impact of Foreign Inroads onthe Indian Social and Cultural Life) : আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। সেই যুগের সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল বলিয়া মনে করা হয়। সিন্ধু-সভ্যতা যে কেবল সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অনুরূপ সভ্যতার চিহ্নাদি উত্তর-ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সভ্যতার উৎকর্ষের তারতম্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে সিন্ধু-সভ্যতার মৌলিক ধরন উত্তর-ভারতে আবিষ্কৃত চিহ্নাদিতে পরিলক্ষিত হয়। আর্যদের আগমনের পূর্বে কৃষিকার্যে ভারতীয়রা, যাহাদিগকে অনার্য নামে ব্যাপকার্থে অভিহিত করা হয়, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল।* সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হরপ্পার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম তুলার চাষ শুরু করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।† সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে বর্তমান হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও দেব-দেবী অনেক কিছুরই মূল সিন্ধু-সভ্যতার আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

আর্য আক্রমণের ফলে পূর্বতন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আর্য-অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে গ্রাম-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও ধর্মব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিবার পরও বর্তমান কাল পর্যন্ত মূল কাঠামোর দিক দিয়া অপরিবর্তিতই রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে সমাজকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীবিভাগ জাতিবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া অত্যন্ত সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ যুগ-যুগান্তের ইতিহাস অতিক্রম করিয়া আজিও হিন্দু সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বর্তমানে বহুলাংশে শিথিল হইয়াছে। বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্র রচনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বৈদিক যুগের সমাজের সংস্কৃতির এক অভাবনীয় উৎকর্ষের পরিচায়ক। বেদ-উপনিষদের ন্যায় উচ্চাঙ্গের এবং দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সাহিত্য পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণ সেই যুগে রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বেদ-উপনিষদের চিন্তাধারা অদ্যাবধি ভারতীয়দের এক বিশাল অংশের জীবনযাত্রার নির্দেশক, বলা বাহুল্য। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ইহা অন্যতম প্রধান।

আর্যদের আগমনের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন

পারসীক বা গ্রীক আক্রমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক ভাগ্যের তারতম্য ঘটিলেও ভারতীয় সমাজের উপর এই সকল আক্রমণের কোন প্রভাব

---

* Vide A. L Basham : *The Wonder that was India*, pp. 25-26.

† *Ibid.*, p. 26.

পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল আক্রমণ, বিশেষভাবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ভারত ও পাশ্চাত্য জগতের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের উপরও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি প্রভৃতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল তেমনি ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

আর্যদের পরবর্তী বৈদেশিক জাতির ভারত আগমনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্বাবধি ভারতীয় সমাজের তথা ভারতবাসীর পরকে আপন করিয়া লইবার মত প্রতিভা ছিল। ফলে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগত জাতি ভারতের সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীকদেরও কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল এই প্রমাণও আছে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডরাস (Heliodoros) বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বেসনগর নামক স্থানে দেবাদিদেব বাসুদেবের নামে একটি গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উপরি-উক্ত উদাহরণ প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজের উদারতা ও পরকে আপন করিয়া লইবার মত বলিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

আর্যদের পরবর্তীকালে সমাজের উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং বাহিরাক্রমণের ফলে ভারত-ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ জাতির ভারত প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে সেই যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগসেন, গুণাঢ্য; চিকিৎসা ক্ষেত্রে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির অবদান সেই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির উপর প্রভাবের ফলাফল

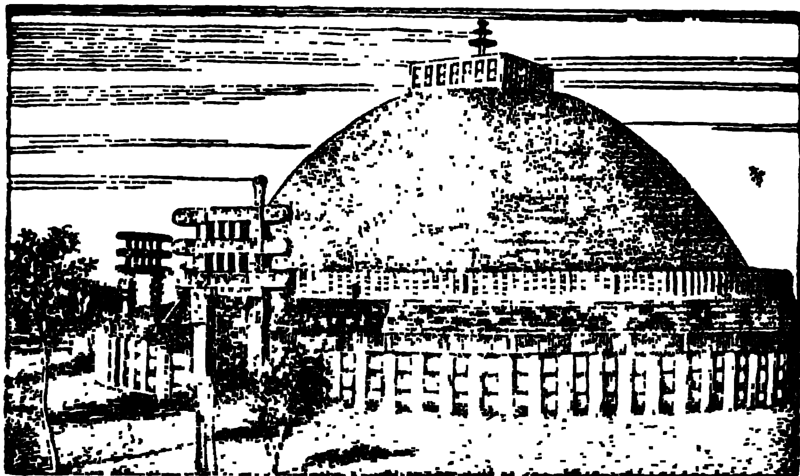
তক্ষশিলা সে-যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

শিক্ষা

বৈদেশিক প্রভাব গান্ধার শিল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেব-দেবী এ্যাপোলো, জিউস প্রভৃতি মূর্তির অনুকরণে গান্ধারের শিল্পিগণ বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া

যায়-সে-যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্প-রীতিতে। পুরুষপুরে কণিষ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারের আলঙ্কারিক কারুকার্য, কান্‌হেরী, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

শিল্প



সাঁচী স্তূপ ও তোরণ

মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে বৈদেশিক যোগাযোগের ফল হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসীক ও শক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শক 'স্যাট্রাপে'র (Satrap) অনুকরণে ভারতের শকরাজাগণ 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিতেন। গ্রীক 'স্ট্রাটিগোস' (Strategos)—অর্থাৎ সামরিক শাসনকর্তার অনুকরণে 'মহাসেনাপতি' উপাধি ভারতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও গ্রহণ করিতেন।

রাজনীতি

কুষাণ আমলে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চরম অভিব্যক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় ও অভ্যুত্থান (The Origin and Rise of the Rajputs): কাহিনী-কিংবদন্তীতে রাজপুত জাতি কোন কোন স্থলে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, কোন কোন স্থলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুত, তাহাদের আদি পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখা রামায়ণ-মহাভারতে উল্লিখিত বীরগণের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতীয় জাতির লোক। ইহার যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, রাজপুতগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতগণ যে মূলত ভারতীয় জাতির লোক এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ সে-যুগের হিন্দু সমাজের পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ছিল। ফলে মূলত বিদেশী হইলেও রাজপুতগণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বহু আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করিয়া থাকেন। শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির ন্যায়ই ইহারা হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপুত জাতির কোন কোন শাখা—যেমন মধ্য-ভারতের চন্দেল্ল বংশ ভারতীয় গোন্দ জাতি-সম্ভূত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কিছু বলা ঠিক হইবে না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান্, পরমার, তোমর, চন্দেল্ল, গাহড়বাল, কলচুরি, গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা

ভারত-ইতিহাসের দশম শতকে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। গুর্জর-প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যে-সকল স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজপুত রাজ্য।

বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব

গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে চৌলুক্য (ইহারা সোলাঙ্কি নামেও পরিচিত) রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল 'অনহিলবারা'। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে প্রথম ভীম (১০২২-৬৪ খ্রীঃ), জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৪ খ্রীঃ), কুমারপাল (১১৪৪-৭৩ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ভীমের (১১৭৮-১২৪১ খ্রীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌলুক্য বংশ প্রায় তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পর (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে) এই বংশেরই এক শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই নূতন রাজবংশ 'বাঘেলা বংশ' নামে পরিচিত। বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের রাজত্বকালে আলা-উদ্দিন খলজী গুজরাট জয় করিয়াছিলেন।

চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ

রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান্ বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চল লইয়া চৌহান্ বংশের রাজ্য গঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর—অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চৌহান্ বংশ প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে চৌহান্ রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব। তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে তৃতীয় পৃথ্বীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

চৌহান্ বংশ

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে প্রাধান্য অর্জন করে। এই বংশের সমরবিজয়ী বীর রাজা ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্রীঃ) ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দেল্ল বংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খজুরাহো। এই বংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় খজুরাহোর মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির সে-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

চন্দেল্ল বংশ

জব্বলপুর অঞ্চলে কলচুরি বা কলসুড়িগণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরি ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে বিক্রমাদিত্য (১০৩০-৪১ খ্রীঃ) ও লক্ষ্মীকর্ণ (১০৪১-৭০ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত এই বংশ শক্তি ও প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল।

কলচুরি বা কলসুড়ি বংশ

মালবের পরমার বংশ ছিল রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার অন্যতম প্রধান। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। পরমার বংশের রাজা বাক্‌পতি প্রতিবেশী রাজাগণের রাজ্যের কতক অংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজা ভোজ (১০১০-৫৫ খ্রীঃ)। রাজা ভোজ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পরমার বংশ

গাহড়বাল বংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র বারাণসীতে রাজত্ব শুরু করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি কনৌজ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে গোবিন্দচাঁদ (১১১৪-৫৪ খ্রীঃ), জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জয়চাঁদ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তিনি অবশ্য নিজে মহম্মদ ঘুরীকে বাধাদানে ত্রুটি করেন নাই। মহম্মদ ঘুরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন।

গাহড়বাল বংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্যিক ঐক্যের পথে

(Towards Imperial Unity)

মগধের অধীনে (Under Magadha)

(১) বিম্বিসার হইতে অশোক (From Bimbisara to Asoka) প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে মগধ রাজ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনে অগ্রসর হইয়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে। বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া

মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবার (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ) সঙ্গে সঙ্গে মগধ রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিম্বিসার মাত্র পনর বৎসর বয়সে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই তিনি অঙ্গ রাজ্যটি জয় করেন। অঙ্গ রাজ্য জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বিম্বিসার

কোশল-কাশী রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবী, লিচ্ছবি দলপতির কন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবী এবং মদ্র রাজ্যের রাজকন্যা ক্ষেমা ছিলেন যথাক্রমে তাঁহার প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থা পত্নী। এই সকল বিবাহ-সূত্রে বিম্বিসার মগধের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থাদিতে বিম্বিসারকে জৈনধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, উভয়ের সহিত বিম্বিসারের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লিখিত আছে।

বিম্বিসার কর্তৃক মগধের প্রাধান্যের সূচনা

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসন লাভ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনিও মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারে পিতার ন্যায়ই উৎসাহী ছিলেন কোশল রাজ্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি কোশল রাজ্যের উপর কতক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব-ভারতের শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘগুলি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে মগধের একটি বিকল্প রাজধানী—পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাকেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, গৌতম বুদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পর হইতে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজাগণের দুর্বলতা এবং তাঁহাদের পারিবারিক কলহ প্রভৃতিতে অতিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণ মন্ত্রী শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল, একথা সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে।

অজাতশত্রু

পাটলিপুত্র নগর বিকল্প রাজধানী হিসাবে নির্মিত

বিম্বিসারীয় বংশের পতন শিশুনাগের সিংহাসন লাভ

শিশুনাগ বহিরাক্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবন্তী রাজ্যকে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বৎস ও কোশল রাজ্যও তাঁহার আমলে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। শৈশুনাগ বংশের পরবর্তী রাজাগণ খুব শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মগধের সিংহাসন নন্দ বংশের অধিকারে চলিয়া যায়। নন্দ বংশের স্থাপয়িতা নীচ কুল-সম্ভূত ছিলেন একথা পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। মহাপদ্মনন্দ এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন। বিম্বিসার ও

শিশুনাগ কর্তৃক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

শিশুনাগ বংশের পতন—নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা মহাপদ্মনন্দ

অজাতশত্রু গঠিত মগধ সাম্রাজ্যকে মহাপদ্মনন্দ বিশালতর ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দ বংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেও নন্দরাজাগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই। বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাঁহার স্বার্থ-লোলুপতার জন্য জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ধননন্দ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলেকজাণ্ডার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু নন্দ বংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজ্যভোগ ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার জনৈক তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের হস্তে নন্দ বংশের পতন ঘটিয়াছিল।

'নব নন্দ' ('Nine Nandas')

ধননন্দ—নন্দ বংশের শেষ রাজা

মৌর্য বংশের উত্থান

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-৩০০ (Chandragupta Maurya): মগধের নন্দ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বংশ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন নীচ বংশ-সম্ভূত। হিন্দু কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মুরা' ছিলেন শূদ্রাণী। মুরার নাম অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'মৌর্য বংশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত, পিপ্পলীবনের ময়ূরপোষক প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মৌর্য বংশকে ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়াই মনে করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পরিচয়

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাঁহার মাতা শিশু চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একবার নন্দরাজসভায় চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে অপমান করা হইয়াছিল। এজন্য তিনি নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে তিনি রাজসদৃশ লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাঁহার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

চাণক্য বা কৌটিল্য

চাণক্যের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক শাসনকর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বৈদেশিক অধিকার হইতে মুক্ত করিলেন।

নন্দ বংশের উচ্ছেদ—গ্রীক প্রভুত্বের অবসান

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সীরিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত

অঞ্চল সেনাপতি সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকৃত হইলে সেলুকাস সেই অংশ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট এই কয়টি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তদুপরি উভয় পক্ষে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। সাধারণ্যে একথাই অবশ্য প্রচলিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শুরু করিয়া সীরিয়া তথা গ্রীক দেশগুলির সহিত মৌর্য বংশের সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল অটুট ছিল। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

সেলুকাসের ভারত আক্রমণ ও পরাজয়

সেলুকাস-চন্দ্রগুপ্ত মৈত্রী

মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুখ্যাত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক অধিকার হইতে দেশের একাংশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, সেলুকাসের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারত-ইতিহাসে সর্বপ্রথম শক্তিশালী ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন!

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

বিন্দুসার, খ্রীঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ (Bindusara) : চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'অমিত্রাঘাত' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নাই। গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে তাঁহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতবর্ষের সৌহার্দ্য পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল।

গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত সৌহার্দ্য

সম্রাট অশোক, খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৬ (Emperor Asoka) : বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে সিংহাসন অধিকার লইয়া এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদন্তীতে উল্লিখিত আছে। অশোক তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অনেকের প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সকল তথ্য কতদূর সত্য সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করিয়া থাকেন। অশোকের অভিষেকক্রিয়া চারি বৎসর পর (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর এক ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দিয়াছিল একথা সম্পূর্ণ

সিংহাসনলাভ -ভ্রাতৃবিরোধ

অগ্রাহ্য করা হয়ত ঠিক হইবে না। ভ্রাতৃহত্যার নির্মমতার কথা বাদ দিলেও ভ্রাতৃবিরোধ যে ঘটিয়াছিল একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না।



রাজর্ষি অশোক

সম্রাটসুলভ মনোবৃত্তি

অশোক মৌর্য সম্রাটসুলভ মনোবৃত্তি লইয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে তাঁহার স্বভাবতই আগ্রহ ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই তিনি তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেকের (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) নয় বৎসর পরে অর্থাৎ সিংহাসন লাভের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কলিঙ্গ নামক প্রতিবেশী রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কলিঙ্গরাজের সৈন্যসংখ্যা রাজ্যের আয়তন বা লোকসংখ্যার

কলিঙ্গ যুদ্ধ
যুদ্ধের মর্মান্তিকতা

অনুপাতে অত্যধিক ছিল। প্রতিবেশী কলিঙ্গ রাজ্যের এরূপ সামরিক শক্তি এবং সামরিক আস্ফালন মৌর্য সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক হইতে স্বভাবতই কাম্য ছিল না। এজন্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। এক লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনুষঙ্গিক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ফলে মারা গিয়াছিল। বহু স্ত্রী স্বামীহারা, বহু জননী পুত্রহারা হইয়াছিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের মর্মান্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পরিবর্তনসাধন করিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য দিগ্বিজয় ত্যাগ করিলেন। সাম্য,

অশোকের মর্মবেদনা ও
মানসিক পরিবর্তন

মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করাই হইল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি পর্বতগুহা এবং পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভে তাঁহার ধর্মমত ব্রাহ্মীলিপিতে খোদাই করিয়া দিলেন। অশোক পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে আশ্বাস বাণী শুনাইলেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন দিনই অস্ত্র ধারণ করিবেন না। দিগ্বিজয়ের পন্থা ত্যাগ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মানসিক পরিবর্তন মৌর্য সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিলেন। প্রত্যেক তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর তিনি রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের

আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

শাসন ও বিচার কার্যাদি পরিদর্শনের জন্য এক এক দল রাজকর্মচারী প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি সকল মানুষের

এমনকি জীবমাত্রেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজকর্তব্যের আদর্শ তিনি পরিবর্তন করিয়া জনগণের কল্যাণসাধনই একমাত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মৌর্য শাসনব্যবস্থা মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী হইয়া উঠিল। বিচার বিভাগের সংস্কার, রাজুক নামক রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া অশোক শাসনব্যবস্থাকেও

মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা

[illegible]

ব্রাহ্মীলিপি

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জনমঙ্গলকর করিয়া তুলিলেন। তিনি সকল মানুষকে নিজ সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পিতৃসুলভ দায়িত্ব লইয়া প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মঙ্গল কেবল পার্থিব মঙ্গলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরবর্তী জীবনেও প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা তাঁহার দায়িত্ব বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এজন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ

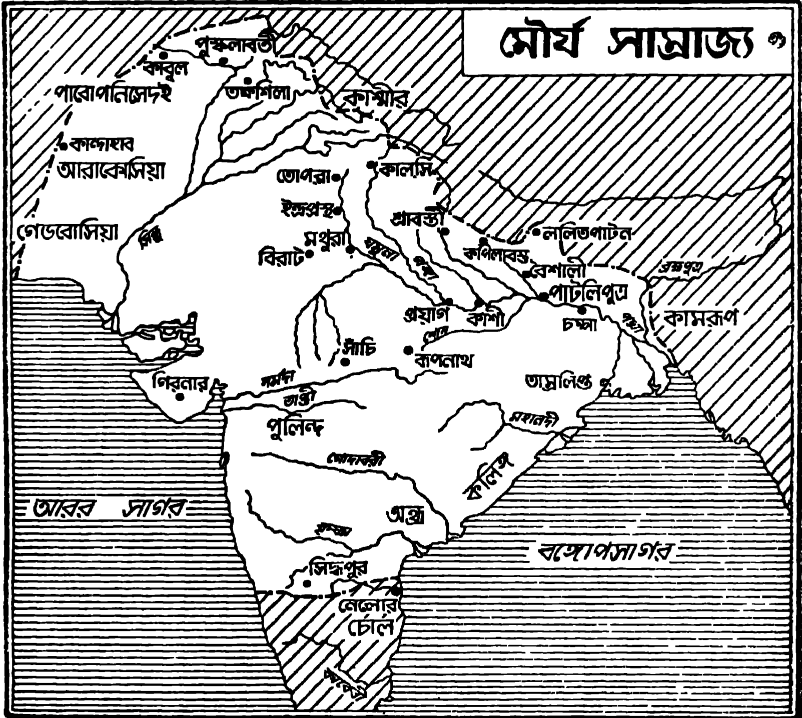
অশোকের সেবাধর্মী ও জনকল্যাণকর কার্যকলাপ কেবল মানুষের মঙ্গল সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি পশু সমাজেরও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে সংস্কারমূলক কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাস্তার পার্শ্বে তিনি কূপ খনন ও বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে মানুষ এবং পশু উভয়েরই উপকারে আসে। তিনি মানুষের জন্য যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনি পশু চিকিৎসার জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।*

সেবামূলক কার্যকলাপ

*দেবানাং পিয় পিয়দসী রাযো পংথেসু ব্রছা রোপাপিতা, কূপা চ খানাপিতা পরিভোগায পসু মনুসানাং। দে চিকিসা কত পসু চিকিসা, মনুসচিকিসা চ।" অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) পথে বৃক্ষ রোপণ এবং কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে মানুষ এবং পশু উভয়েই সেগুলি উপভোগ করিতে পারে। তিনি দুই প্রকার চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, মানুষের জন্য এবং পশুদের জন্য।

রাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও অশোক এক নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ের স্থলে ধর্মবিজয় শুরু করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল দেশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনে ব্রতী হইলেন। তিনি পররাষ্ট্রের প্রতি যুদ্ধনীতি নিজে ত্যাগ করিয়াছিলেন এমনকি নিজ পুত্র ও পৌত্রদেরও যুদ্ধনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতি : সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব



সম্রাট্ অশোক তাঁহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদর্শের জন্য পৃথিবীর সর্বকালের রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই যদি রাজার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানবিকতাই যদি মনুষ্যত্ব বিচারের মানদণ্ড হয় তাহা হইলে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট্ অশোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন রাজা বা সম্রাট্ কোন কালেই আবির্ভূত হন নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির রাজাগণের সহিত সম্রাট্ অশোকের তুলনা করিয়াছেন। সকলেই সম্রাট্ অশোককে সর্বকালের রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান দান করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ বা রাজা

কলিঙ্গ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া অশোকের অন্তরে যে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি

হইয়াছিল উহার ফলে তাঁহার রাজকর্তব্যের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী মৌর্য সম্রাট্ অশোক মানবধর্মী রাজর্ষি অশোকে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। অশোক এক নূতন আদর্শে—জনকল্যাণের তথা জীবজগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ও কার্যে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল না। সম্রাট্ অশোকের এই পরিবর্তন ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন বলিয়া বিবেচ্য।

অশোকের মানবতা

প্রজাবর্গের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভিন্ন অপর কোন সম্রাট্ কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই। অশোক রাজপদকে ভোগ-বিলাসের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। উপরন্তু তিনি মনে করিতেন যে, তিনি প্রজাবর্গের নিকট ঋণী। প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন দ্বারা তিনি সেই ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 'সব মানুষ আমার সন্তান'* এইরূপ উদারবাণী পৃথিবীর অপর কোন রাজার বা সম্রাটের মুখে উচ্চারিত হয় নাই। পররাষ্ট্রের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি যে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীতেও আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই মানবতার বাণীই হইল রাজর্ষি অশোকের বাণী—ইহাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা। অপরকে আপন করিয়া লইয়া যে বিরাট সমন্বয় সাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট্ অশোক নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই আদর্শই অদ্যাবধি ভারতবাসীর জীবনাদর্শ।

প্রজাবর্গের পার্থিব ও পারলৌকিক উন্নয়ন

সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অন্তর্বর্তীকালে শুঙ্গ বংশ, কাণ্ব বংশ, সাতবাহন বংশ ভারতের বিভিন্নাংশে শাসন স্থাপন করে। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগে যে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি ভারতে বিদ্যমান ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে বাহ্লিক গ্রীকগণ, শক ও পহ্লবগণ এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ করিয়া বিভিন্নাঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের মধ্যে কুষাণগণই বিচ্ছিন্ন ভারতকে পুনরায় একই রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আনিতে সমর্থ হয়। কুষাণদের মধ্যে কণিষ্কই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কুষাণ বংশের শাসন দুর্বল হইয়া পড়িলে গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা (Maurya Administration): মৌর্য শাসনব্যবস্থা বলিতে মূলত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক সংগঠিত শাসনব্যবস্থাকেই বুঝায়। সম্রাট্ অশোকের আমলে কতক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত-রচিত মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা'র উপর নির্ভর করিয়া-রচিত গ্রীক লেখক এ্যারিয়ান, স্ট্রাবো, জাস্টিন, হেরোডোটাস প্রভৃতি এবং

মৌর্য শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রচিত

* 'সব মুনিসে পজা মমা'। ('শ' বা 'ষ' ব্রাহ্মীলিপিতে ব্যবহৃত হইত না)

রোমান লেখক প্লিনির রচিত বিবরণ হইতে অনেক কিছু জানা সম্ভব হইয়াছে। সেই সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলা ও স্তম্ভলিপি হইতে মৌর্য শাসন সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

মৌর্য শাসনের ঐতিহাসিক উপাদান

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মৌর্য সাম্রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে মোট চারিটি প্রদেশ ছিল যথা, উত্তরাপথ, প্রাচ্য, অবন্তী ও দক্ষিণাপথ। অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গ বিজয়ের পর কলিঙ্গ আরও একটি প্রদেশ হিসাবে সংযুক্ত হয়।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার—প্রদেশসংখ্যা চার—অশোকের আমলে পাঁচ

কেন্দ্রীয় তথা সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। মৌর্য সম্রাটগণ নিজেদের "দেবতাদের প্রিয়" (দেবানাং পিয়) বলিয়া অভিহিত করিতেন। সম্রাট প্রশাসন বিভাগ, বিচার, সৈন্য, আইন প্রণয়ন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধর্ম সকল বিষয়েরই সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্মের অনুশাসন, অমাত্য, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী এবং সর্বোপরি মন্ত্রি-পরিষদের মতামত দ্বারা পরিচালিত হইতেন। ফলে স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ তাঁহার ছিল না। মৌর্য শাসনের মূল আদর্শ এবং নীতিই ছিল প্রজার সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। সম্রাট অশোকের আমলে এই প্রজানুরঞ্জন এবং জনসেবার মনোবৃত্তি কেবল শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল এমন নহে; প্রজাবর্গের, তথা মনুষ্য সমাজের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি সাধনও সম্রাট নিজ দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আইনত সম্রাটের ক্ষমতা সীমাহীন—কার্যত সীমিত

প্রজার প্রতি সেবার মনোবৃত্তি

যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে সম্রাট-ই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সেনাপতির পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক না হইলেও, সম্রাট তাহা গ্রহণে ত্রুটি করিতেন না। বৃহদাকার যুদ্ধে সম্রাট নিজেই সৈন্য পরিচালনা করিতেন।

সৈন্য পরিচালনা

মৌর্য-সম্রাট যুদ্ধ, শিকার, পূজা-পার্বণ ও বিচার এই চারি প্রকার কর্তব্য সম্পাদনকালে প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন। বিচারকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিলে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় একথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। মৌর্য-সম্রাট বিচারপ্রার্থীকে সেই কারণে যথাশীঘ্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিতেন।

বিচারকার্য

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সম্রাট পুরাতন রীতি-নীতি (পুরাণ-প্রকৃতি) মানিয়া চলিতেন। রাজ-অনুশাসন, রাজাদেশ প্রভৃতি দ্বারা তিনি নূতন আইন চালু করিতেন। কার্যনির্বাহক বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসক

আইন-প্রণেতা

হিসাবে তিনি পুরোহিত, হিসাব পরীক্ষক, পরিদর্শক, সচিব, অমাত্য প্রভৃতি নিয়োগ করিতেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য এক গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করা হইত। তাহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের যাবতীয় গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছাইয়া দিত।

কার্যনির্বাহক ক্ষমতা

গুপ্তচর

সচিব, অমাত্য প্রভৃতির মধ্যে এবং মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চপদে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা মহামন্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের বহু রাজকর্মচারী ছিল। ইহাদের এক-এক শ্রেণীর কর্মচারী এক-এক প্রকার কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।

মহামন্ত্রী

মন্ত্রিপরিষদ নামে মন্ত্রণা-সভা বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা করিবার এবং পরামর্শদানের জন্য সম্রাটের আদেশে সমবেত হইত। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে মহামন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকিতেন। প্রদেশপাল, উপরাজ্যপাল, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, প্রধান এবং অপরাপর বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিত।

মন্ত্রিপরিষদ

মৌর্য সম্রাটের বিশাল সামরিক বাহিনী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পদাতিক বাহিনীতে ছয় লক্ষ সৈন্য ছিল। সামরিক বাহিনী পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তীবাহিনী, রথবাহিনী নৌবাহিনী এবং খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহন বিভাগ এই ছয়টি অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি এক-একটি বোর্ডের অধীন ছিল।

সামরিক বাহিনী
ছয়টি বোর্ড

অনুরূপ, সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র এবং অপরাপর বৃহৎ শহর-নগর—যথা কৌশাম্বী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা প্রভৃতিতে পৌরসভা ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল। এক-একটি বোর্ডের উপর এক-এক প্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যথা: প্রথমটি ছিল শিল্পোৎপাদন সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, দ্বিতীয়টি, বিদেশী নাগরিকদের পরিদর্শনের; তৃতীয়টি, জন্ম-মৃত্যুর হিসাবরক্ষার, চতুর্থটি, ওজন, মাপ ইত্যাদির, পঞ্চমটি, শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর মান বজায় রাখা ও বিক্রয়ের এবং ষষ্ঠটি, বিক্রীত সামগ্রীর মূল্যের এক-দশমাংশ কর আদায় করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পৌরসভা - ছয়টি
বোর্ডে বিভক্ত

উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-দশমাংশ পর্যন্ত 'বলি' অর্থাৎ রাজস্ব এবং জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ বাজার 'ভাগ'—অর্থাৎ অংশ দিতে হইত। বিক্রীত সামগ্রী মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে, জন্ম ও মৃত্যু কর, বন-সম্পদ, খনি-সম্পদ হইতে আয়, জরিমানা সবকিছু মিলিয়া সম্রাটের রাজস্ব আয় হইত।

রাজস্ব আয় বলি,
ভাগ, কর, জরিমানা

অপরাধের শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জরিমানা প্রভৃতি। অপরাধীর নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দৈহিক অত্যাচার করা হইত।

অপরাধের শাস্তির কঠোরতা

প্রাদেশিক শাসন রাজ্যপাল বা প্রদেশপাল পরিচালনা করিতেন। রাজপরিবারের লোকদের মধ্য হইতে এইসব পদে নিয়োগ করা হইত। প্রদেশ কতকগুলি জনপদে বিভক্ত ছিল। 'প্রদেষ্ট্রি', 'সমাহরত্রি' প্রভৃতি জনপদের শাসন পরিচালনা করিতেন। জনপদের এক-চতুর্থাংশে এক-এক জন 'স্থানিক' দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পাঁচ হইতে দশটি গ্রাম এক-এক জন 'গোপ'-এর অধীন থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের পরিচালনা ভার ছিল একজন 'গ্রামিকে'র উপর।

প্রাদেশিক শাসন

জনপদ

জনপদের এক-চতুর্থাংশ ভাগ

গোপ

গ্রামিক

অশোক মৌর্য শাসনব্যবস্থাকে মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাজুকের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া, রাজকর্মচারীদিগকে নিজ দায়িত্বে স্বাধীন-ভাবে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকার দিয়া, নিজ প্রজা তথা মানুষ মাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য "ধর্মমহামাত্র" নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া মৌর্য শাসনকে জনকল্যাণকর করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতি তিন বৎসর এবং পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন ও বিচার কার্য কিভাবে চলিতেছে সে-বিষয়ে পরিদর্শনের ভার একদল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের ক্ষমতাকে অধিকার ভোগের সুযোগ হিসাবে মনে না করিয়া প্রজা তথা মানুষ এমনকি, পশুরও মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ করাই রাজপদের দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজেকে প্রজার নিকট ঋণী মনে করিতেন এবং তাহাদের পার্থিব ও পরজন্মের উন্নতি বিধান করিয়া সেই ঋণ শোধ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকর্তব্যের এক নূতন দৃষ্টান্ত ও ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন।

অশোকের সংস্কার

প্রজাবর্গ তথা মনুষ্যমাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধন

রাজকর্তব্যের নূতন ধারণা ও দৃষ্টান্ত

অশোকের ধর্ম ও ধর্মপ্রচার (Asoka's Dharma and its Spread). অশোকের 'ধম্ম'—অর্থাৎ ধর্ম প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ছিল কি না সে-বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক, যেমন ঐতিহাসিক ফ্লীট, প্রভৃতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ডক্টর ফ্লীট অশোকের ধর্মকে নীতিসম্পন্ন রাজাগণের কর্তব্যের মূল সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অশোকের শিলালিপি (Minor Rock Edict I) হইতে আমরা তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা পাই। তিনি সঙ্ঘের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াছেন এই কথা হইতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ ভিন্ন অন্য কোন সঙ্ঘের কথা মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। রোমিলা থাপার অবশ্য অশোকের ধর্মকে তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত একটি ধর্ম বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, ভাণ্ডারকর এবং

অশোকের ধর্ম

আধুনিক অপরাপর ঐতিহাসিকগণ অশোকের ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম বলিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অশোক তাঁহার ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমেই তাঁহার 'ভেরিঘোষ' অর্থাৎ যুদ্ধের দামামা বন্ধ করিয়া সেই স্থলে 'ধর্মঘোষ' অর্থাৎ ধর্মের দামামা (অর্থাৎ ধর্ম প্রচার) শুরু করিলেন। তিনি বিহার যাত্রা অর্থাৎ শিকার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাইবার ব্যবস্থার স্থলে ধর্মযাত্রা অর্থাৎ ধর্মস্থান দর্শনের জন্য যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান যাহা স্ত্রীলোকেরা পালন করিতেন তাহার পরিবর্তে 'ধর্মমঙ্গল' প্রবর্তন করিলেন। নিজদেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের জনসাধারণ যাহাতে অশোকের বাণী অনুসরণ করিতে পারে সেইজন্য রাজ্যের সীমান্তে ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্মস্থান ও তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানে নানাপ্রকার দান-দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের জন্মস্থানে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম অনুশীলনের মনোভাব জন্মাইবার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর প্রজার এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কতক ধর্মগত মতবিরোধ দেখা দিলে অশোক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া সেই বিরোধের মীমাংসা করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত সারনাথের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই সভা বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। কাশ্মীর, গান্ধার, সীরিয়া, মিশর, কাইরিনি, ম্যাসিডন, ইপাইরাস প্রভৃতি দেশে এবং নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা হইয়াছিল। অশোক নিজ পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলের রাজা তিস্য-এর আমন্ত্রণে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতের বাহিরে বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিক জে. কে. স্যাণ্ডার্স মন্তব্য করিয়াছেন।

ধর্মপ্রচার
ভেরিঘোষের স্থলে ধর্মঘোষ
বিহারযাত্রার স্থলে ধর্মযাত্রা
অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের স্থলে ধর্মমঙ্গল
ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করণ
বুদ্ধের জন্মস্থানে স্তম্ভ এবং জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানে দানের ব্যবস্থা
ধর্মমহামাত্র নিয়োগ
পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি
বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ
ধর্ম প্রচারের গুরুত্ব

১২ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of the Maurya Empire): প্রকৃতির অমোঘ বিধানেই মৌর্য সাম্রাজ্য পৃথিবীর অপরাপর সাম্রাজ্যের মত কালের অতল তলে তলাইয়া গিয়াছিল। এই পতনের পশ্চাতে যেমন ছিল আভ্যন্তরীণ কারণ তেমনি ছিল বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে সম্রাট্ অশোকের পশুবলি-বিরোধী অনুশাসন, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকল প্রজার প্রতি

সম-ব্যবহার ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মনে যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই মতবাদ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের গৌরব রবি যখন মধ্যাহ্ন গগনে সেই সময়েও তক্ষশিলায় বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এবং যুবরাজ অশোককে তাহা দমন করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। অশোক তাঁহার শিলালিপিতেও পদস্থ রাজকর্মচারীদের স্বার্থের সংঘাত ও কর্তব্যের অবহেলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অশোকের পরবর্তী রাজাগণের ব্যক্তিত্বের অভাব স্বভাবতই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অঞ্চলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, উৎপন্নের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন এই উচ্চহারে কর ভার প্রজাবর্গকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল এবং ইহা মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু সেই সময়ে জমির উর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উৎপন্নের প্রাচুর্যের অনুপাতে এই পরিমাণ রাজস্ব পতনের কারণ বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন।

প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ

পদস্থ কর্মচারীদের স্বার্থের সংঘাত

অশোকের পরবর্তী সম্রাট্‌দের ব্যক্তিত্বের অভাব

উচ্চহারে ভূমি-রাজস্ব

আভ্যন্তরীণ কারণে দুর্বলতা হেতু যখন বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা পরবর্তী রাজাগণের ছিলনা তখন ব্যাক্‌ট্রীয় গ্রীকদের আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে উপস্থিত হইল। বিদেশী আক্রমণের সুযোগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ শেষ মৌর্য সম্রাট্‌কে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল।

ব্যাক্‌ট্রীয় আক্রমণ

পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসন অধিকার

কেহ কেহ সম্রাট্ অশোকের শান্তি নীতি এবং সামরিক বাহিনীকে যথাযথভাবে প্রস্তুত, সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত না রাখিবার ফলে দুর্বলতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। অশোক 'ভেরিঘোষ'কে ধর্মঘোষে' পরিণত করিয়া রাষ্ট্রনীতি হিসাবে যুদ্ধনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া যে সামরিক দুর্বলতার সূচনা করিয়াছিলেন তাহার ফলে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি একদা দুর্ধর্ষ মৌর্য সেনাবাহিনীর মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু ইহা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, অশোক যদি সামরিক শক্তি অক্ষত এবং শক্তিশালী রাখিতেন তাহা হইলেও মৌর্য সাম্রাজ্য চিরকাল টিকিয়া থাকিত না। নিয়তির রথচক্রে সেই সাম্রাজ্য নিষ্পেষিত হইয়া অপরাপর সাম্রাজ্যের ন্যায়ই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করিয়া লইত। কিন্তু অশোক যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেই ক্ষমা, শান্তি, মৈত্রী এবং ধর্ম-বিজয় নীতির ফলে পৃথিবীর এক বিশাল অংশের উপর ভারতের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই নৈতিক সাম্রাজ্য আজও টিকিয়া আছে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোকের দায়িত্ব

নৈতিক প্রাধান্য আজও অটুট

(২) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত (From Chandragupta I to Skandagupta): মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বৈদেশিক আক্রমণ-জনিত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল। ইহার পর প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ গুপ্তদের উত্থান ঘটে। এই বংশের আদি রাজাগণের মধ্যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ), ঘটোৎকচগুপ্ত প্রভৃতি রাজার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা মগধের—অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কোন স্থানীয় সামন্ত রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta I): গুপ্ত বংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে (৩২০ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত বংশের ইতিহাসের তথা ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং তাঁহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা।

গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা

সমুদ্রগুপ্ত (Samudragupta): মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান। সমুদ্রগুপ্ত পিতার প্রথম পুত্র ছিলেন না, তথাপি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিজেকে 'একরাট্'—অর্থাৎ সার্বভৌম সম্রাটে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। আর্যাবর্তে তিনি 'সর্বরাজচ্ছেত্তা'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মতিল, অচ্যুত, গণপতি, নাগসেন, চন্দ্রবর্মণ, বলবর্মণ প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র আর্যাবর্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি মধ্য-ভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করিলেন। তারপর শুরু হইল তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান। আর্যাবর্তের রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অঞ্চলের রাজাগণের মধ্যে মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, দমন, বিষ্ণুগোপ, উগ্রসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া এবং তাঁহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ

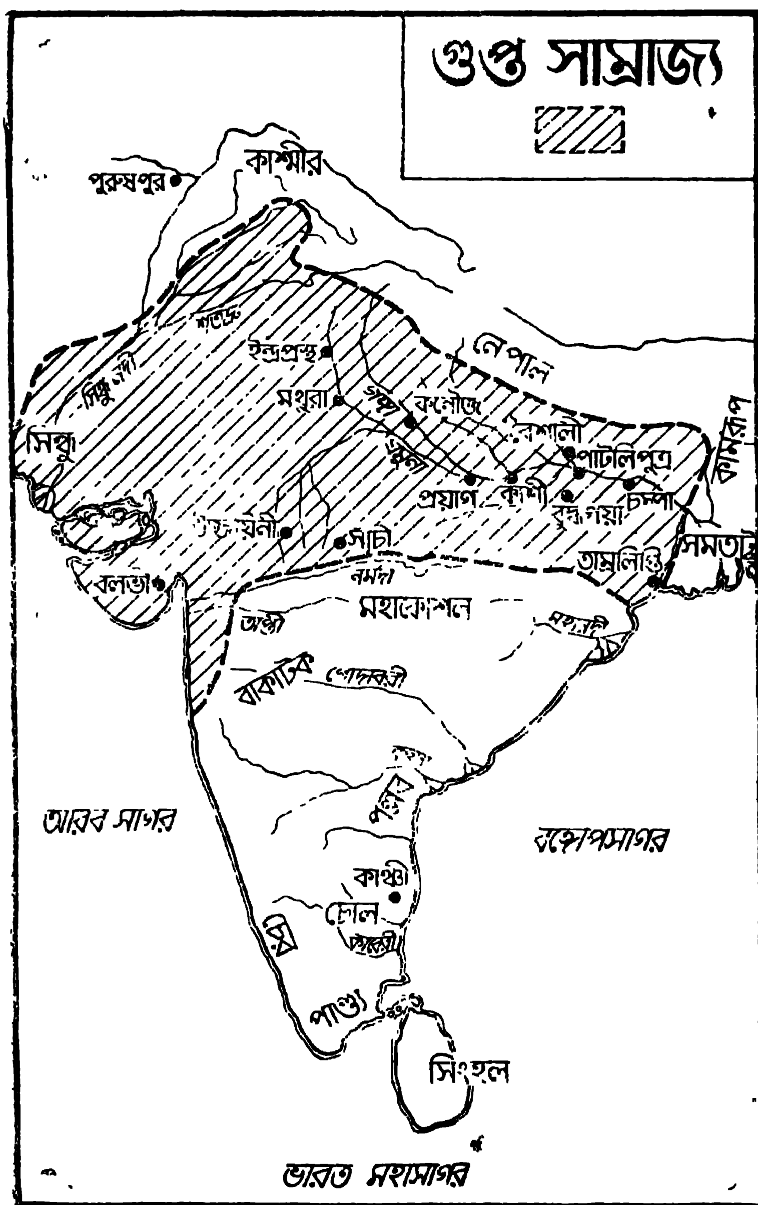
দিগ্বিজয়: উত্তর-ভারত তথা আর্যাবর্ত

মধ্য-ভারত

দাক্ষিণাত্য

রাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দূরদর্শী সমুদ্রগুপ্ত হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মগধ হইতে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলির উপর অধিকার রক্ষা করিবার একমাত্র পথ ছিল সেই সকল অঞ্চলের রাজাগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান করা।

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সাফল্য প্রতিবেশী, বিশেষভাবে ভারতের



পূর্বাঞ্চলীয় রাজাগণের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সমতট—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের একাংশ, কামরূপ, দাভক (ঢাকা?) প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মদ্রক, আভির, প্রার্জুন, যৌধেয় প্রভৃতি উপজাতীয় দলও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের মালব, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতির রাজাগণও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে বোধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারাও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইভাবে সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিজেতা হিসাবে তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, নেপোলিয়নের মতই তিনি ছিলেন সমর-কুশল সেনাপতি, সাম্রাজ্য সংগঠক এবং কেন্দ্রীভূত শাসনের সহিত স্থানীয় শাসনাধিকারের মধ্যে সমন্বয়সাধক।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আনুগত্য

ভারতের নেপোলিয়ন

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভৃতির জন্য তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয় শেষ করিয়াই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ থাকিলেও তিনি অপরাপর ধর্মের প্রতিও পরম শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি স্বয়ং কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তদানীন্তন বিদ্বজ্জন সমাজে 'কবি-রাজ'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে যে তাঁহার অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার বীণা-বাদনরত মুদ্রা হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত হরিষেণ কর্তৃক অলংকৃত ছিল। হরিষেণ-রচিত 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের এবং সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভে এই প্রশস্তিটি খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের অযাচিত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের ক্ষমতা, বীরত্ব, সমর-কুশলতা, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা—এই সকল বিভিন্ন দিক দিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতীয় রাজাগণের অন্যতম প্রধান হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সকল কারণেই ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে 'পরাক্রমাঙ্ক', 'অপ্রতিরথ', 'কৃতান্ত-পুরুষ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ ও ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতীয় রাজাগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' (Chandragupta II 'Vikramaditya'): সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সূত্রে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগ ও কদম্ব বংশের রাজকন্যাদের বিবাহ করিবার ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি শকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পথ সহজ করিয়াছিলেন। শক দলপতিকে তিনি তাঁহার নিজ দেশের সীমার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'সাহসাঙ্ক' ও 'শকারি'।

বৈবাহিক সূত্রে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় সেনাপতি বীরসেন সাবের সহিত যুগ্মভাবে মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিকল্প রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গুপ্ত শাসনকালেও পাটলিপুত্র ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী।

মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে পাটলিপুত্র নগর এবং বিশেষত মৌর্য সম্রাট্‌গণ নির্মিত প্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা সমসাময়িক কালের বহু বিদ্বান্ মনীষী কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য কি না সে-বিষয়ে কতক মতদ্বৈধ থাকিলেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই দুইজন এক ও অভিন্ন একথা মনে করেন। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে।

পাটলিপুত্র নগরের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা

ফা-হিয়েনের বিবরণ (Fa-hien's Account): চীনে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য পর পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি প্রায় দশ বৎসর (৪০১-৪১০ খ্রীঃ) এদেশে বাস করিয়াছিলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর তিনি বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যে অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর ছিলেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। গুপ্তরাজাগণ এক অতি উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি

বিরাজিত ছিল। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সেই সময়ে একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডবিধির উদারতায় ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

উদার শাসনব্যবস্থা, শান্তি ও সমৃদ্ধি

ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতেন। শাসনকার্যে দক্ষতা এবং রাজকর্মচারিগণের কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরীতে মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে উহা মানুষের দ্বারা নির্মিত নহে—এই মন্তব্য তিনি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মথুরায় তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এগুলিতে তখন বহু সংখ্যক (৩ হাজার) বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। একমাত্র চণ্ডাল শ্রেণী ব্যতীত মদ, মাংস তখন কেহ স্পর্শ করিত না এবং পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতিও কেহ খাইত না। জনসাধারণ কোন বিচারালয়ের ধার ধারিত না। জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ে রেজিস্ট্রি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। জনসাধারণ রাত্রিতে ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাইত। রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা লইত না। এই সকল উক্তি হইতে সে-যুগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত সৎ এবং সন্তোষপূর্ণ জীবনযাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজ-জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজাগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির লোকদের অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করা হইত।

রাজস্ব, শাসনকার্যে দক্ষতা

বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবিত জীবনযাত্রা

জনসাধারণের সন্তোষ

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। তাহাদের সততা ও সৎকার্যে কালাতিপাতের কথাও ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অংশ রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পার্শ্বে পান্থশালা প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরে একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আর্থিক অবস্থা

পরিবহণব্যবস্থা

দাতব্য চিকিৎসালয়

পরবর্তী গুপ্তরাজাগণ (The Later Guptas): দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পর প্রথম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় নাই। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পরধর্মের প্রতি পরম

সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। তিনি পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'ভারতের রক্ষাকর্তা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্কন্দগুপ্তই ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা।

প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫-৫৫ খ্রীঃ)

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ)

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুরু হয়। ক্রমে দুর্বল হইতে দুর্বলতর রাজাগণের অধীনে গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জীবিতগুপ্তের (দ্বিতীয়) আমলে উহার বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী-কালেও গুপ্ত উপাধিধারী স্থানীয় রাজাগণের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত বংশের পতন জীবিতগুপ্তের (দ্বিতীয়) আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of the Gupta Empire): সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির মধ্যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমতা লক্ষ্য করা যায়। মৌর্য সাম্রাজ্য বা ভারত-ইতিহাসে পরবর্তীকালে সুলতানি বা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি নীতিগতভাবে একই ধরনের বলা যাইতে পারে—যেমন আভ্যন্তরীণ কারণ এবং বহিরাগত কারণ।

সকল সাম্রাজ্যের পতনেরই নীতিগত-ভাবে একই প্রকার কারণ. আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের আভ্যন্তরীণ কারণগুলির মধ্যে (১) কুমারগুপ্তের রাজত্ব-কালে পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত দমন করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেও সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব দিতে পারেন নাই। (২) অল্পকালের মধ্যেই—অর্থাৎ পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ দমন করিতে-না-করিতেই হূণ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে পাঞ্জাব ও মালব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। (৩) স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজাগণের সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা ছিল না। ফলে হূণগণ মধ্য-ভারত পর্যন্ত প্রায় বিনা-বাধায়ই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। (৪) এইভাবে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিরাগত আক্রমণে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত সেই সময়ে সামরিক ও অসামরিক পদস্থ রাজকর্মচারিগণ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ

হূণ আক্রমণ

সম্রাট্‌দের অক্ষমতা

সামরিক ও অসামরিক রাজকর্মচারীদের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব

(৫) ইহা ভিন্ন, সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের শাসকগণও সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিলেন। বলভী, মৈত্রক, বাংলার শাসকবর্গ, মধ্য-ভারতে মৌখরিগণ স্বাধীন হইয়া গেলেন। (৬) যশোধর্মন তখনও গুপ্ত সম্রাটের অনুগত ছিলেন। তিনি হূণদের মধ্য-ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা

দিকে অগ্রসর হওয়া প্রতিহত করিলেন। যুদ্ধে হূণদিগকে পরাজিত করিয়া যশোধর্মন দেশরক্ষা করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার মর্যাদা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। (৭) এইভাবে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে গুপ্ত রাজপরিবারের যুবরাজগণও পশ্চাৎপদ রহিলেন না। তাঁহারাও স্বার্থ-দ্বন্দ্বে যোগ দিলে সাম্রাজ্যের শক্তি বা মর্যাদা বলিয়া কিছুই রহিল না। (৮) সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, হিন্দুধর্মাবলম্বী সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক ক্ষমতা ও দক্ষতা যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের কারণ ছিল, পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই দক্ষতা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ যে বৌদ্ধ ধর্মের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের বুধগুপ্ত, তথ গতগুপ্ত প্রভৃতি নাম হইতেই অনুমান করা যায়। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

যশোধর্মন কর্তৃক দেশ-রক্ষা—স্বাধীনতা ঘোষণা

যুবরাজগণের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব

পরবর্তী রাজাগণের বৌদ্ধ ধর্মভাব

সামরিক শক্তিনাশ

কনৌজের অধীনে (Under Kanauj)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে-সকল রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল সেগুলির মধ্যে কনৌজ, বঙ্গদেশ বা গৌড়, কাশ্মীর, বলভী বাকাটক প্রভৃতি রাজ্য উল্লেখযোগ্য।

পুষ্যভূতি হর্ষবর্ধন হইতে প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (From Pushyabhuti Harshavardhana to Pratihara Mahendrapala) : কনৌজের মৌখরি বংশ গুপ্ত সম্রাটদের সামন্তরাজ ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে এই বংশ উত্তর-ভারতে অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন হরিবর্মন। ঈশ্বরবর্মন, ঈশানবর্মন, সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন, গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। গ্রহবর্মন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে তিনি নিহত হইলে কনৌজ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের অধীন হইয়া গিয়াছিল।

গ্রহবর্মন—দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত

পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ হইতে পুষ্যভূতি বংশ থানেশ্বর নামক স্থানে ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। গুপ্ত বংশের সহিত পুষ্যভূতি বংশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। প্রভাকরবর্ধন কনৌজের মৌখরি বংশের সহিতও সম্পর্কিত ছিলেন। মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মনের সহিত তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাত হর্ষবর্ধন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬০৫ খ্রীঃ)। সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলিতেছিল। মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া

নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং কনৌজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। এমনকি, তাঁহার রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। রাজ্যবর্ধন ভগিনীপতিহন্তা দেবগুপ্তকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন।

রাজ্যবর্ধন

হর্ষবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ (Harshavardhana): রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুতে (৬০৬ খ্রীঃ) তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে তিনি যুবরাজ শিলাদিত্য নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন।* সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে, রাজ্যশ্রী বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন কাল বিলম্ব না করিয়া ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্বত্য জাতির লোকদের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইলেন। রাজ্যশ্রীকে লইয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসনলাভ

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লেখ আছে যে, হর্ষবর্ধন রাজপদ গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন না। নীলকন্ঠ শাস্ত্রী ও শ্রীনিবাসাচারীর মতে এই অনীহা কনৌজের সিংহাসন আরোহণ সম্পর্কেই সম্ভবত হর্ষবর্ধন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কনৌজের অভিজাতবর্গ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এক মহতী সভায় সমবেত হইয়া হর্ষবর্ধনকে কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিতে আমন্ত্রণ জানান, কারণ কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। রাজ্যশাসনে অবশ্য হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রী গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিতেন।† কনৌজের সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরই হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজধানী থানেশ্বর হইতে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। গঙ্গা-যমুনা বিধৌত সমতলখণ্ডে অবস্থিত উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে কনৌজের গুরুত্ব সেই সময় হইতেই স্বীকৃত ছিল। এই কারণেই পরবর্তী কালে কনৌজ অধিকার করিবার জন্য রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না।

কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ

থানেশ্বর হইতে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত

* Vide *An Advanced History of India*, p 149, Majumdar-Raychaudhuri-Datta.

† "His (Harsha's) reluctance was probably with reference to Kanauj, not to Thaneswar ······Harsha was invited to accept the throne of Kanauj by a great meeting of the nobles and dignitaries of the Kingdom, probably because the murdered King (Grahavarman) left no heir, and Rajyasri, the widow queen, played an important part in the affairs of the state. Soon after these events Harsha moved his capital from Thaneswar to Kanauj." *Advanced History of India*, p. 242, Nilkanta Sastri and Srinivasachari

ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। এজন্য তিনি প্রথমে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন, কিন্তু ভাস্করবর্মনের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও তিনি গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের অনিষ্টসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা

হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সাময়িকভাবে বলভী রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন তিনি এই প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। বলভীরাজ ধ্রুবসেন নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। ধ্রুবসেন ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ার পর এই দুই রাজ্যের পরস্পর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সিন্ধুদেশেও সাময়িকভাবে হর্ষবর্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে। হর্ষবর্ধন 'তুষারশৈল'—অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। পানিক্করের মতে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে যাবতীয় দেশ এমনকি, নেপালও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্যের দিকে হর্ষবর্ধনের বিজয় অভিযান চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধন মগধ, কঙ্গোদ প্রভৃতি স্থানও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয়

দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজয়


হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কোন কোন লেখক যেমন, কে. এম. পানিক্কর হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে সমগ্র উত্তর-ভারতের সম্রাট্‌ 'উত্তরাপথনাথ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুলকেশীও তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট্‌ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার হিউয়েন সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সাধারণত হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে যে ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত। তাঁহার মতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদ লইয়া গঠিত ছিল। বাংলাদেশের উপর হর্ষবর্ধনের অধিকার ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে একথা ডক্টর মজুমদার মনে করেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে মতানৈক্য

হর্ষবর্ধন কেবল বীরযোদ্ধা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে। সুশাসক হিসাবেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। শাসন-

কার্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টার কথা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। মৌর্য বা গুপ্ত আমলের মতই হর্ষবর্ধনের কালে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের শাসনের দক্ষতা ও উদারতার ভূয়সী প্রশংসা হিউয়েন সাঙ্ করিয়াছেন।

শাসনব্যবস্থা

জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ পরবর্তীকালের মুসলমান আমলের জায়গির প্রথার মত জমি তাঁহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে পাইতেন। রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য অতি সামান্য পরিমাণ করও আদায় করা হইত।

রাজস্ব জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ

ধর্ম-বিষয়ে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতীয় সহিষ্ণুতা-নীতি অনুসরণ করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি শিব এবং সূর্যের উপাসনা করিতেন।* প্রজাবর্গের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া উহার পার্শ্বে সরাইখানা, বিশ্রামাগার তিনি স্থাপন করাইয়াছিলেন। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থে কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভায় ভাস্করবর্মন, বলভীর ধ্রুবসেন প্রভৃতি মোট আঠার জন করদ-মিত্র রাজা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম-নীতি

জনকল্যাণক: কার্যাদি কনৌজের ধর্মসভা

কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগে তাঁহার পঞ্চবার্ষিক মেলার আয়োজন করেন। হিউয়েন সাঙ্‌কেও এই মেলায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরিয়া এই মেলার অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের তিনি নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পূর্ণভাবে দান করিয়া, এমনকি, একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার নিজের মূল্যবান রাজকীয় বস্ত্রখানিও তিনি দান করিয়া দিতেন।

প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলা

হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধনের সাহিত্যসেবা ও সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করিয়াছেন। নাগনন্দা, প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী—এই তিনখানি নাটক তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। বাণভট্ট, হরিদত্ত, জয়সেন, ময়ূর প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যসেবী হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসেবা

ধর্মের ব্যাপারেও হর্ষবর্ধন ছিলেন অত্যন্ত উদার। তিনি নিজে যেমন শিব, সূর্য ও বুদ্ধের উপাসনা করিতেন তেমনি সকল ধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন।

ধর্ম-সহিষ্ণুতা

* Vide *An Advanced History of India*, p. 152 (3rd Ed. 1967).

হিউয়েন সাঙ্ (Hiuen Tsang): চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধ তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থানে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক তথ্যবহুল বিবরণ তিনি লিখিয়াছেন।

হিউয়েন সাঙের ভারত পর্যটন (৬৩০-৪৪ খ্রীঃ)

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া হিউয়েন সাঙ্ বারাণসী নগরে উপস্থিত হন। জনবহুল বারাণসী নগরে তিনি বহু হিন্দু মন্দির দেখিতে পান। হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম ছিল না তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্য আমলের পাটলিপুত্র নগরী, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি গিয়াছিলেন। নালন্দা ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে হিউয়েন সাঙ্ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কাটান। সেই সময়ে চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ হইতে বহু ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আসিতেন।

হিউয়েন সাঙের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ

তাম্রলিপ্ত বন্দরকে হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপগুলিতে ভারতীয় বণিকগণ তাম্রলিপ্ত হইতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতেন।

তাম্রলিপ্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর



হিউয়েন সাঙ্

হিউয়েন সাঙ্ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশী ও হর্ষবর্ধনকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দুইজন রাজা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী ও হর্ষবর্ধন শ্রেষ্ঠ রাজা

হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক ধর্মমেলায় হিউয়েন সাঙ্কে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই উভয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায়।

কনৌজ ও প্রয়াগের ধর্মানুষ্ঠান

দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কৃষকদের পীড়নের কোন প্রমাণ যে তিনি পান নাই, এইসব কথা বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া ভারতবাসীর শ্লাঘার বিষয়। জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজ-কর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগদখল করিতেন, কিন্তু

দণ্ডবিধির কঠোরতা

উদার শাসনব্যবস্থা

এইভাবে যে সামন্তব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সামন্তপ্রথার অত্যাচারী দিকটা মোটেই ছিল না। শ্রমের অনুপাতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

ফসল ও ফল

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম, সরিষা, আদা, লাউ, কুমড়া ; ফলের মধ্যে আম, আপেল, বেদানা, পেয়ারা, তরমুজ, আঙুর, কমলালেবু প্রভৃতির উল্লেখ হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীর সততা ও সরলতা

ভারতবাসীর সততা, ব্যবহারিক সরলতা, সহজ জীবনযাপন প্রভৃতির কথা হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করিয়াছেন। রাস্তাঘাট অবশ্য পূর্বেকার মত ততটা নিরুপদ্রব ছিল না।

প্রতিহার সাম্রাজ্য

হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে কনৌজের সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে সাময়িক-ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পর কনৌজের রাজনৈতিক ইতিহাসের অস্পষ্টতা যখন দূর হইল তখন কনৌজের সিংহাসনে যশোধর্মন অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রকুট-পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব (Conflict between Rastra-Kuta-Pala-Pratihar) : হর্ষবর্ধনের আমলে কনৌজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কনৌজ হর্ষবর্ধনের অধীনে যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল হর্ষের পরবর্তী যুগে সাময়িকভাবে উহা বিস্মৃতির অন্তরালে থাকিলেও কনৌজ ভারতের সাম্রাজ্যিক মর্যাদার কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত হইতে লাগিল। এই কারণে হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে যে তিনটি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছিল। কনৌজ অধিকার করা সাম্রাজ্যের মর্যাদার দিক দিয়া অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকুটশক্তি, বাংলার পালবংশ এবং গুর্জর দেশের প্রতিহার রাজাগণের মধ্যে কনৌজ অধিকার করিবার এক ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ হইতে দশম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উপরি-উক্ত তিনটি শক্তির মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছিল।

কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রকুট-পাল-প্রতিহার বংশের ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্ব

প্রথমে রাষ্ট্রকুট শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম ইন্দ্রের পুত্র দন্তিদুর্গের রাজত্বকালেই রাষ্ট্রকুট-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। দন্তিদুর্গ চালুক্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রকুট শক্তিকে সাম্রাজ্যের মর্যাদায় স্থাপন করেন। ঐ সময়ে বাংলার পালবংশের রাজা ধর্মপাল বাংলা রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। কিছুকালের মধ্যে রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার বংশ উত্তর-ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। গুর্জর-প্রতিহার রাজা বৎসরাজ কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি কনৌজের তদানীন্তন রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ দখল করিলেও ইন্দ্রায়ুধকেই তিনি তাঁবেদার রাজা হিসাবে কনৌজের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন। বৎসরাজের

ত্রি-পাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সাফল্যে ঈর্ষাকাতর হইয়া পালবংশের রাজা ধর্মপাল বৎসরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু ধর্মপাল পুনরায় বৎসরাজের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। এদিকে রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব কনৌজ দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হন। বৎসরাজ এবং ধর্মপাল উভয়েই ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইলেন কিন্তু ধ্রুব নিজ রাজধানী হইতে কনৌজের দূরত্ব এবং নিজের বৃদ্ধাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কনৌজ অধিকার না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (৭৯০ খ্রীঃ)। ধর্মপাল নিজ পরাজয়ের গ্লানি শীঘ্রই দূর করিয়া পুনরায় কনৌজের দিকে অগ্রসর হইলেন। এইবার তিনি কনৌজ অধিকার করিয়া ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন এবং নিজ তাঁবেদার চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু গুর্জর-প্রতিহার রাজা নাগভট্ট (২য়) চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। পালরাজবংশও গোবিন্দের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কনৌজের উপর রাষ্ট্রকূট প্রাধান্যও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রতিহার বংশের অর্থাৎ গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন এবং প্রতিহার সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল পিতার সাম্রাজ্য-সীমা যে কেবল অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন তাহাই নহে পূর্ব দিকে তিনি সাম্রাজ্য-সীমা আরও বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতিহার শাসনাধীনে কনৌজ রাজনৈতিক শক্তি, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়াছিল।

বিভিন্ন সময়ে ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্বে বিভিন্ন পক্ষের সাফল্য অর্জন

সর্বশেষে কনৌজে প্রতিহার প্রাধান্য স্থাপন

গৌড়ের অধীনে (Under Gauda)

শশাঙ্ক হইতে দেবপাল (From Sasanka to Devapala). গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া 'বঙ্গ' নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে—যথা, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তাঁহাদের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলে সম্ভবত বঙ্গ রাজ্য তাঁহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।*

সূচনা

বঙ্গ. গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

* *Classical Age*, p. 79.

গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পরবর্তী গুপ্ত বংশের (Later Guptas) রাজা মহাসেনগুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে তাঁহারই এক বাঙালী সামন্তরাজ গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কেবল স্বাধীন গৌড় রাজ্যের স্থাপয়িতাই ছিলেন না, তিনি গৌড়কে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

গৌড় . শশাঙ্ক

প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ

প্রাচীন নাম	বর্তমান নাম
সোমপুর (পাহাড়পুর)	রাজশাহী জেলা
পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড়)	বগুড়া জেলা
লক্ষ্মণাবতী (গৌড়)	মালদহ জেলা
মুদ্গগিরি	মুঙ্গের
দ্বারবঙ্গ	দ্বারভাঙ্গা
পাটলিপুত্র	পাটনা
উদ্দণ্ডপুর	বিহারশরিফ
সপ্তগ্রাম	ত্রিবেণী
তাম্রলিপ্ত	তমলুক

তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি সে-যুগে কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। গৌড়াধিপতি শশাংক ছিলেন সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কনৌজের মৌখরি বংশের সাম্রাজ্য-স্পৃহা হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করাই ছিল শশাংকের মূল উদ্দেশ্য। মালবরাজ দেবগুপ্তকে তিনি সপক্ষে টানিয়া মৌখরি বংশের বিরুদ্ধে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধন এজন্য দেবগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্তের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দেবগুপ্তের মিত্র রাজা শশাংকের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভ্রাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাংককে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু শশাংকের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মন তাঁহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কঙ্গোদ শশাংকের অধীনে ছিল বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

মালবরাজ দেবগুপ্ত ও শশাংকের মিত্রতা

শশাংক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত

হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে শশাংকের আত্মরক্ষার সামর্থ্য

শশাংক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি তেমন উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল; পাল বংশের উত্থানের পূর্বাবধি এই অরাজকতা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল।

শশাংকের পরবর্তীকালে অরাজকতা

গৌড়াধিপতি শশাংকের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন গৌড় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। নিধনপুর তাম্রশাসনে ভাস্করবর্মন বঙ্গ রাজ্যের রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রকে সামন্তরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ভাস্করবর্মন সাময়িক কালের জন্য বঙ্গ রাজ্যেরও আনুগত্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর অধিককাল জ্যেষ্ঠভদ্রের বংশধরগণ বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। খড়্গ বংশ নামে অপর এক বংশ কর্তৃক ভদ্র বংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল। খড়্গ বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে কনৌজের যশোবর্মন বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই প্রাধান্য অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। খড়্গ বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গ রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল।

ভদ্র বংশ—জ্যেষ্ঠভদ্র

খড়্গ বংশ—ললিতচন্দ্র

যাহা হউক, শশাংকের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর গৌড় রাজ্য রক্ষা করিবার মত আর কোন ক্ষমতাশালী শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই। শশাংকের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সর্বত্র এক ব্যাপক অরাজকতা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 'মাৎস্য-ন্যায়' নামে

'মাৎস্য-ন্যায়'

অভিহিত করা হইয়া থাকে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ ধনী দরিদ্রের উপর, শক্তিশালী দুর্বলের উপর অপ্রতিহতভাবে অত্যাচার চালাইতেছিল. তাহাদের সম্পত্তি গ্রাস করিতেছিল। ক্ষত্রিয়, অভিজাত শ্রেণী, বণিক সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবার ফলে বাংলাদেশে এক ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে শৈলোদ্ভব বংশের রাজাগণ, চন্দেল্লরাজ যশোবর্মন, জয়াপীড় প্রভৃতি বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে স্বভাবতই সাহসী হইয়াছিলেন।

বৈদেশিক আক্রমণ

দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ অরাজকতা চলিতে থাকিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় রাজাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (৭৫০ খ্রীঃ)। দেশ ও দশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক উপায়ে গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন সেই যুগের বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত, বলা বাহুল্য। গোপালের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

গোপালের নির্বাচন (৭৫০ খ্রীঃ)

বাঙালীর দেশাত্মবোধ

গোপাল, ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ (Gopala): ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা সন্দেহ নাই। সিংহাসনে নির্বাচিত হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানত শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালের পত্নীকে চন্দ্র, অগ্নি, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পত্নীদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে গোপাল ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, কুবের প্রভৃতি দেবতার ন্যায় ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, একথা অনুমান করা ভুল হইবে না। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে গোপালের রাজ্য 'সমুদ্র পর্যন্ত' বিস্তৃত ছিল একথা উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিয়া বঙ্গ রাজ্যকে সংহতি দান করিয়াছিলেন একথা অনায়াসে স্বীকার করা যায়। গোপাল ঠিক কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।* মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল।

খালিমপুর তাম্রশাসন

গোপাল কর্তৃক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন

ধর্মপাল, ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ (Dharmapala): গোপালের পুত্র ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলেই

* Vide *History of Bengal* (D. U.) Vol. 1. p. 103.

বাংলার পাল রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মপাল বঙ্গোপসাগর হইতে জলন্ধর, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে (বা ইন্দ্রায়ুধকে) পরাজিত করিয়া কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রায়ুধকে স্থাপন করিয়াছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধের সিংহাসনে আরোহণকালে এই সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন। একথা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপাল উত্তর-ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক গুজরাটী কবি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের সরাসরি শাসনাধীন; কিন্তু উত্তর-ভারতের কনৌজ ও উহার নিকটবর্তী অপরাপর বহু দেশ ধর্মপালের আনুগত্যাধীন ছিল। ধর্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া কনৌজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে ধর্মপাল পরাজিত হইয়াছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ট স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই বলিয়াই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সীমা

কনৌজের উপর প্রাধান্য

'পরমেশ্বর পরমভট্টারক' উপাধি ধারণ

দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে পরাজয়

ধর্মপাল যে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পিতার নিকট হইতে তিনি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসন উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাহায্যে তিনি সেই ক্ষুদ্র রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের ব্যক্তিগত প্রতিভা

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে মগধে বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে-সময়কার শিল্পী ধীমান ও বীতপাল এই মহাবিহারের নির্মাণ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছয়টি মহাবিদ্যালয়-সমন্বিত এই মহাবিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য ধর্মপাল প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মহাবিহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখণ্ডে একই সঙ্গে আট হাজার লোক বসিবার

বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবস্থা ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে তিন হাজার বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত। এই মহাবিহারের মধ্যস্থলে একটি মন্দির ছিল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে মোট ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন। নেপাল ও তিব্বত হইতে বহু বিদ্যার্থী এই মহাবিহারে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যোগদান করিত। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্নাকর শান্তি, আচার্য শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অভয়াকরগুপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, রত্নবজ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্যগণ রাজার নিকট হইতে 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের প্রতিকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত থাকিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দীর্ঘ চারিশত বৎসর উহার কীর্তি ও যশ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর অনেকের মতে উহা গোপাল ও দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

ওদন্তপুরী মহাবিহার

ওদন্তপুরী মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। কোনপ্রকার সম্মান-দক্ষিণা না লইয়াই মেধাবী বিদ্যার্থীদিগকে এই মহাবিহারে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। অতীশ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিলে পর আচার্যদেব স্বয়ং তাঁহার নাম রাখেন 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতরাজের অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার ও প্রচারার্থে তিব্বত গিয়াছিলেন।

সোমপুরী মহাবিহার

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল সোমপুরী মহাবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েকটি সীলমোহর হইতে জানা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে এই মহাবিহারটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সাহিত্যিক হরিভদ্র ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করিলেও ধর্মপাল ধর্ম-বিষয়ক ও শান্তিমূলক কার্যাদিতেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইলেও ধর্মপাল পরধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু দেবতার উপাসনার ব্যয়-সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে তিনি জমি দান করিয়াছিলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায়।

মন্তব্য

দেবপাল, ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ (Devapala) : দেবপাল পিতা ধর্মপালের ন্যায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি উৎকল, হূণ, গুর্জর ও দ্রাবিড়দের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক লিপিতে উল্লিখিত আছে। উৎকলের রাজা দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নেতৃত্বে

সামরিক অভিযানের সংবাদ পাইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি লবসেন বা লোসেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা বিনা যুদ্ধে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবপালের আমলে গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট অর্থাৎ দ্রাবিড়দের সহিত পুনরায় পাল বংশের যুদ্ধের সূচনা হয়। দেবপাল গুর্জররাজ প্রথম ভোজকে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

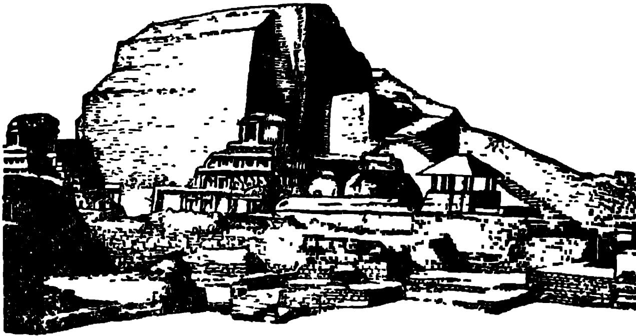
সামরিক অভিযান

দেবপাল দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের গৌরব চরমে পৌঁছিয়াছিল। আসাম হইতে কাশ্মীরের সীমা, হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া সুবর্ণভূমি—অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দেবপালের নিকট এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বহির্দেশেও আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মাত্রেরই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানা ছিল। দেবপাল বালপুত্রদেবের অনুরোধ অনুযায়ী পাঁচখানি গ্রাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেবপালের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। নগরহার (জালালাবাদ) নামক

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

বালপুত্রদেবের দূত প্রেরণ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ

স্থানের ইন্দ্রগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

(Society and Culture from the 4th Century B. C. to 14th Century A. D.)

সমাজ (Society) : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। বৈদিক যুগে জীবনযাত্রা যেমন চতুরাশ্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল সেরূপ চতুরাশ্রমের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস অবশ্য ভারতীয় সমাজকে সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া এগুলিকে সাতটি জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ সাতটি জাতি তখন ছিল না। এগুলি ছিল বৃত্তি অনুসারে সমাজের সাতটি ভাগ। মেগাস্থিনিস এই বৃত্তিমূলক ভাগকেই 'জাতি' বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সমাজের চারি ভাগ · চারি বর্ণ ও চতুরাশ্রম

জীবনের চারিটি আশ্রমেই কতকগুলি সদাচারের কথা কৌটিল্য উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বজীবে অহিংসা, সত্যবাদিতা, শুচিতা, অপরের গুণগ্রাহিতা, সহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা-পরায়ণতা ও নৃশংসতা ত্যাগ করা ছিল অবশ্যপালনীয় আদর্শ। সহজ ও সরল জীবন যাপন এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করা (plain living and high thinking) ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীনতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কার্যকলাপে মনোযোগ, নির্ভীকতা, মৃত্যুভয়-শূন্যতা প্রভৃতিও সেই সময়কার অনুসরণীয় আদর্শ ছিল। সম্রাট অশোকের কাল হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই সকল আদর্শ ভারতীয়দের জীবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে।

সমাজ-জীবনাদর্শ

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং পরবর্তীকালেও পরিবারই ছিল সমাজের মূলভিত্তি। যৌথ পরিবার প্রথা প্রাচীন যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতি আধুনিক কালে অবশ্য যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। অবশ্য সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। বৈদিক যুগ ও উহার পরবর্তীকালে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা লাভ, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতেও স্ত্রীজাতির পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত আছে। মৌর্য যুগে স্ত্রীলোক-প্রহরীরা রাজার দেহরক্ষীর কাজ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির শাসনকার্যে অংশগ্রহণেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবার সমাজের ভিত্তি

মেগাস্থিনিস দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য জাতির শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাসদের প্রতি উদার ব্যবহার করা হইত। মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতীয় সমাজে মিতব্যয়িতা, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয়গণ তখন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত।

মৌর্যোত্তর যুগ

মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে বাহ্লিক, পহ্লব, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোক ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে কতক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তখনকার ভারতীয় সমাজ ছিল অত্যন্ত উদার। পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা তখন ভারতীয় সমাজের ছিল। বাহ্লিক, পহ্লব, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোককে ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সাতবাহন আমলের ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় যে, সাতবাহন রাজপরিবারের সহিত বিদেশী রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে সমাজের চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনুর ধর্মশাস্ত্রে যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতিকে 'নীচ ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, তখনকার সমাজে 'নীচ জাতি' নামেও নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

নূতন নূতন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

গুপ্ত আমলের প্রারম্ভে মনুর ধর্মশাস্ত্র চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাগকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে। এই শ্রেণীবিভাগ জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে অবশ্য উচ্চতর জাতির পুরুষ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে জাতি-ভ্রষ্ট হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। মনু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারের যে সংকীর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশে অনুসৃত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীজাতির প্রতি যে উদার ব্যবহার ভারতীয় সমাজে করা হইত তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণী হইলেও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। সমাজ-জীবনাদর্শ পূর্বের মতই সত্যবাদিতা, সংযম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সমাজ তখন পিতৃতান্ত্রিক ছিল—অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ও তাঁহার আদেশ পরিবারস্থ অপরাপর সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। সেইখানে বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকই ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী।

মনুর ধর্মশাস্ত্র
জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল এবং উহার পরবর্তী যুগে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন বর্ণ, অর্থাৎ জাতির নির্ধারিত বৃত্তি অনুসরণ

আর তখন আবশ্যিক ছিল না। বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের বা জাতির লোকগণকে যেমন বড় বড় রাজ্যের রাজা হিসাবে শাসন করিতে দেখা যায়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকগণকে ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোককে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে এবং রাজ-মহিষীকে রাজার সহিত সম-মর্যাদার আসন গ্রহণ করিতে দেখা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে গুপ্ত যুগের সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। অতিথির প্রতি সেবা-পরায়ণতা, বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মকদ্দমা হইতে নিরস্ত থাকা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। চুরি, মিথ্যাবাদিতা, অসদ্ব্যবহার তখনকার ভারতীয়দের জানা ছিল না। হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতেও হর্ষবর্ধনের আমলের জনসাধারণের সাধুতা ও সরলতার কথা জানা যায়। জীবনযাত্রা তখন ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, অসাধুতা তখনকার ভারতবাসী করিত না।

গুপ্ত যুগ ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় সমাজ

বাংলাদেশের পাল ও সেন যুগে সমাজে চারি জাতি বিদ্যমান ছিল। তদুপরি আরও বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর উদ্ভব তখন ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির লোকের সংমিশ্রণে বহু সঙ্কর শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াতে সেই যুগের বাঙালী সমাজ আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৈদ্য, কায়স্থ, সৎ-শূদ্র বা গন্ধবণিক, মোদক প্রভৃতি নূতন নূতন শ্রেণী পাল ও সেন যুগ হইতে শুরু হইয়াছিল। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া বিবাহ, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম ও রীতি মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজব্যবস্থা

মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি যে-সকল বহিরাগত জাতি ভারতে বসবাস শুরু করিয়াছিল তাহাদের সকলেই হিন্দু সমাজের অংশরূপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতার ফলেই এরূপ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভারতে প্রবেশকারী মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ এবং সে-সম্পর্কে তাহাদের সচেতনতা, মুসলমান আক্রমণকালে ভারতীয়দের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল 'যবন' এবং মুসলমানদের কাছে অ-মুসলমানগণ ছিল 'জিম্মি'। এই সকল কারণে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধ চালু করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সমাজের

মুসলমান আমলে সমাজ

ন্যায় হিন্দু সমাজেও পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এই যুগে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অত্যধিক মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছিল।

কিন্তু মুসলমানদের আগমনে ভারতীয় সমাজে এক নূতন শ্রেণীর সূত্রপাত ঘটে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের এবং পারস্পরিক প্রভাব ও যোগাযোগের ফলে এই দুই শ্রেণী, অর্থাৎ হিন্দু তথা অ-মুসলমান ও মুসলমান উভয় সমাজেরই আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। একটি অপরটির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে এক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই এই ধারণা হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই জাগিয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সহিত এই ঐক্যবোধ সেই সময়কার ভক্তিবাদ ও সুফী ধর্মমতের প্রসারে পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধর্মমতের ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান প্রাপ্তি এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের উদারতা হিন্দু সমাজে সেই সময়ে যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূর করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজ করিয়াছিল।

মুসলমান আমলে সমাজ
হিন্দু-মুসলমান সমাজে পারস্পরিক প্রভাব

সংস্কৃতি (Culture) : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের সহিত যে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্য যুগের সংস্কৃতি

ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রা নীতির উপর যেমন গ্রীক ও রোমান প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল সেইরূপ ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মৌর্য যুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের কথা সেই যুগের কয়েক শতক পর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতেও জানা যায়। মৌর্য প্রাসাদের নির্মাণকৌশল দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। সেই যুগের নির্মিত গুহা, স্তম্ভশীর্ষে পশুমূর্তির নিখুঁত গঠন ও আলংকারিক কারুকার্য সে-যুগের ভাস্কর্য শিল্পে উৎকর্ষের পরিচয় আজিও বহন করিতেছে।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সংস্কৃতির প্রভাব

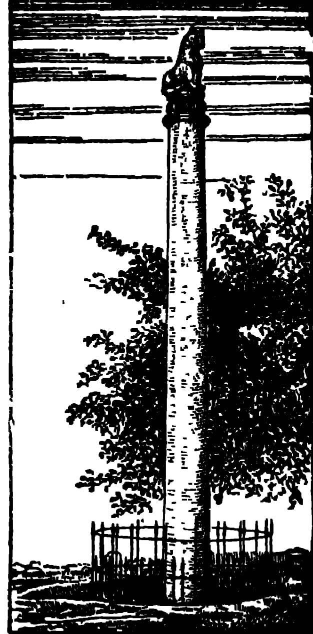
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বহিরাগত আক্রমণে ভারতীয় ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এক সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারত-প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সহিতও

বৈদেশিক সংস্কৃতি প্রভাব

সেই যুগে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে যে বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল সে-যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।



অশোক স্তম্ভশীর্ষ



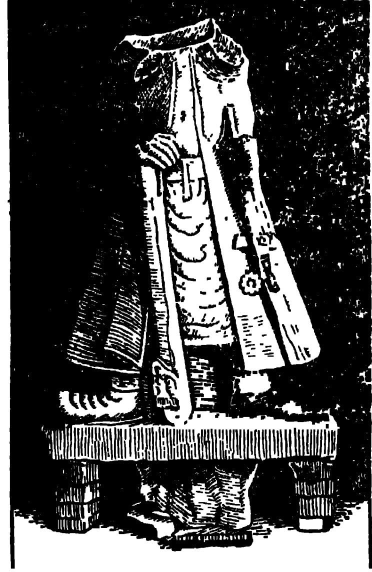
অশোক স্তম্ভ

কুষাণ আমলের শিল্প

কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবতাদের প্রতিকৃতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই শিল্প সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গান্ধার শিল্পে বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাব কতকটা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বস্তুত, গান্ধার শিল্প নিদর্শনগুলিতে প্রধানত ভারতীয় শিল্পী মনেরই অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে মথুরা এবং অমরাবতী উপত্যকায় বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অমরাবতীতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-পদক এবং মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। পুরুষপুরে কণিষ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারের আলংকারিক কারুকার্য, কানহেরি, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত বা ভারহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে কুষাণ যুগে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্ধ-চরিত', 'সৌন্দরনন্দ', 'সূত্রালঙ্কার' (?), 'বজ্রসূচী' প্রভৃতি; নাগসেন-রচিত 'মিলিন্দপঞ্‌হো'; নাগার্জুন-রচিত 'মাধ্যমিক সূত্র' বা 'মধ্যমক কারিকা' ও 'সুহৃল্লেখ'; বসুমিত্র-রচিত 'মহাবিভাষা', গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'; আর্যশূরের 'চর্যাপিটক' প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকের 'চরক সংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতা', কাত্যায়নের 'বিভাষা', পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' প্রভৃতিও সে-যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। 'রামায়ণ-মহাভারত', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', যাজ্ঞবল্ক্যের 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', মনুর 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি সে-যুগেই সঙ্কলিত হয়।

সাহিত্য



কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

তক্ষশিলা সেই যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

শিক্ষা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে এক সুবর্ণ যুগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, এই যুগের ব্যাপক উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ হিসাবে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এই উৎকর্ষ শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

গুপ্ত যুগ

গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দীর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ এবং গুপ্ত শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কাল হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল উহা মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই যোগাযোগের ফলে যে নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল দেখা গেল গুপ্ত যুগের বলিষ্ঠ সৃজনী শক্তিতে। সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহা পরিলক্ষিত হইল। রাজনৈতিক শান্তি এই সৃজনী শক্তির প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ

সুবর্ণ যুগের আলোচনায় গুপ্তরাজাগণের সুদক্ষ, পরধর্ম-সহিষ্ণু শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই সুবর্ণ যুগের

রচনা সম্ভব হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বলিয়াই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্তরাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সাহিত্য

তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি অমর কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থ-রচয়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু এবং শূদ্রক, বিশাখদত্ত, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান্ মনীষী সে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস, শূদ্রক, অমর, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু প্রভৃতি মনীষীর সাহিত্য-সেবায় সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার বহুগুণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই যুগকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

সঙ্গীতশাস্ত্র

গুপ্ত যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদনরত মুদ্রার প্রতিকৃতি হইতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্ত আমলের শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্র-বিশারদ। বরাহমিহির ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। কাহিনী-কিংবদন্তীর নবরত্নের সকলেই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভুল হইবে না। গুপ্ত যুগের চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অস্ত্রোপচার সে-যুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান আরব, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। গুপ্তরাজাগণ নিজেরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেদের উন্নত মনের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের উপাসনারই ব্যাপক প্রচলন ছিল। গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক 'পরম ভাগবত' উপাধি ধারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হইলেও উহার অবনতির সূত্রপাত হইতে থাকে।

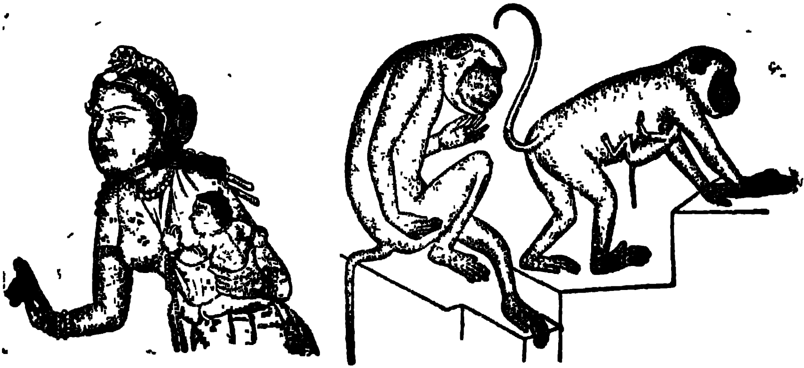
গুপ্তরাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় সবকিছুই মুসলমান আক্রমণকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ) ও ভিটারগাঁওয়ে আবিষ্কৃত দুইটি মন্দির হইতে গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ও অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা যায় সে-যুগে নির্মিত অজন্তার গুহাগুলিতে। কয়েকটি গুহা গুপ্ত যুগে নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলির দেওয়ালের মসৃণতা আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সকল গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র সে-যুগের চিত্রশিল্প উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন। গুপ্ত যুগের দেবদেবীর মূর্তি, পশুমূর্তি ও বৃক্ষলতাদি সে-যুগের ভাস্কর্য ও আলংকারিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। গুপ্ত যুগে নির্মিত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তম্ভ ঐ যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির নিদর্শন-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্ত যুগের মুদ্রা এবং নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তিও সে-যুগের ধাতু-শিল্পের নিদর্শন বহন করে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

চিত্রশিল্প

ধাতুশিল্প



অজন্তার চিত্র

পরবর্তী কালে পাল সাম্রাজ্যের আমলে উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। পাল যুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাল বংশের রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী মহাবিহারগুলি নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে মোট ১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ছিল। পাল যুগে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই সকল মঠের নির্মাণ-পদ্ধতি সে-যুগের স্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক। সোমপুরী মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ রাজসাহী জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে-যুগের স্তূপ, মঠ ও মন্দিরের নির্মাণকৌশল ছিল বিভিন্ন ধরনের। পাল যুগে নির্মিত কয়েকটি

পাল যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির গড়ন দৃষ্টে পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের ধারণা লাভ করা যায়। ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বীতপাল ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও ধাতুমূর্তি-নির্মাতা। তাঁহাদের শিল্পকৌশলের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

ধীমান ও বীতপাল


পাল যুগের ভাস্কর্য নিদর্শন

পাল যুগ শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাল যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাঁহাদের রচনা দ্বারা সে-যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় আদি রচনা বৌদ্ধ চর্যাপদ পাল যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। ঐ যুগের বহু বাঙালী মনীষী বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। সুমাত্রা অঞ্চলের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের কুলগুরু ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত কুমার ঘোষ। নানা বিষয়ে শিক্ষার্জনের জন্য বাঙালী শিক্ষার্থীদের ভারতের অপরাপর স্থানে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে বহু বাঙালী শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যাইবার কথাও জানা যায়।

সাহিত্যসেবী


অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বাংলাদেশ সেই যুগে এশিয়া মহাদেশের এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। বাংলাদেশের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব ব্রহ্মদেশ, নেপাল, তিব্বত, যবদ্বীপ তথা সুবর্ণভূমি, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত

বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

হইতে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রেরিত হইত। বাঙালী আচার্য অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত হন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে তথাকার বৌদ্ধ ধর্মের ত্রুটি সংশোধন ও ব্যাপক প্রচারের জন্য তিব্বত গিয়াছিলেন।

অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

সেনবংশীয় রাজাগণও শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন 'আচার্য-সাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থখানি সম্ভবত তিনি নিজে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতী পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহার অসম্পূর্ণ অংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি এখনও বিদ্যমান। বল্লাল সেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। গুণবিষ্ণু, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, উমাপতিধর, ঈশান, পশুপতি প্রভৃতি ছিলেন সে-যুগের বিশ্বান্ মনীষী। ধোয়ী-রচিত 'পবনদূত' এবং জয়দেবের 'পদাবলী' তদানীন্তন সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ব রত্নস্বরূপ।

সেন যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি

সেন বংশের রাজাগণ ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহারা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম

সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন শূলপানি। পালবংশীয় রাজাগণের আমলে বাঙালী মনীষার যে প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা সেন যুগেও অব্যাহত ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রে পাল ও সেন বংশীয় রাজাগণের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ, বলা বাহুল্য।

শিল্প

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য শিল্পের মধ্যেই প্রধানত নিবদ্ধ ছিল। এই শিল্পরীতি উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়—এই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই শিল্পরীতিতে নির্মাণকৌশলের পার্থক্য ছিল। দেব-দেবীর মন্দিরই ছিল সেই সময়ের প্রধান স্থাপত্য শিল্পকার্য। উত্তর-ভারতের মন্দির-গুলির চূড়া বা শিখর ছিল দেখিতে কতকটা কলসীর ন্যায় এবং উহার উপরিভাগ সূঁচালো। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরসমূহের শিখর ছিল ধাপে ধাপে পিরামিডের ন্যায় নির্মিত। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির, মধ্য-ভারতের খাজুরাহো মন্দির, রাজস্থানের দিলওয়ারা মন্দির এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্য শিল্প

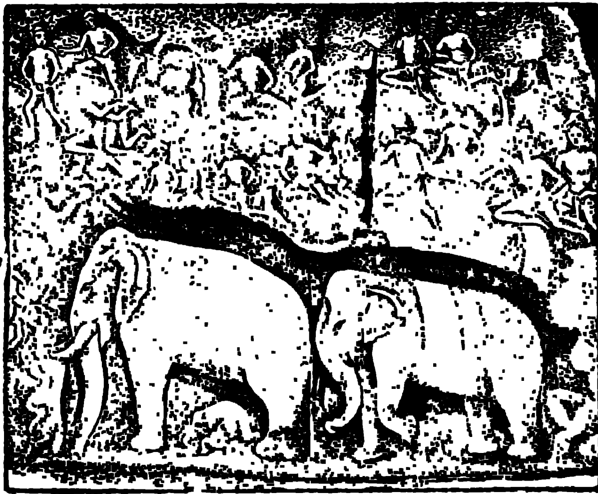
ভুবনেশ্বরের রাজরাণী মন্দির, লিঙ্গরাজের মন্দির, কোণারকের সূর্য মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, খাজুরাহোর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে আজিও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

রাজস্থানের মাউণ্ট আবুতে দিলওয়ারা মন্দিরের নির্মাণকৌশল, উহার স্তম্ভ ও ছাদের কারুকার্য অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তেজপাল মন্দিরও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর-ভারতের স্থাপত্য রীতি

দক্ষিণ-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি : দক্ষিণ-ভারতে আর্য সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতি রামায়ণ অর্থাৎ মহাকাব্যের যুগের পূর্বে বিস্তার লাভ করে নাই। দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ হইতে দক্ষিণ-ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। রামচন্দ্রের গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনে বাস, লঙ্কা বিজয় প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতে বৈদিক যুগের শেষে আর্য সভ্যতা বিস্তারের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-ভারতে আর্য সভ্যতার প্রসার



পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্পকার্য (মহাবলীপুরম)

মৌর্য আমলে সুদূর দক্ষিণের চের, চোল, পাণ্ড্য এই তিনটি স্বাধীন তামিল রাজ্য ভিন্ন সমগ্র দক্ষিণ-ভারত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আর্য সভ্যতা তথা উত্তর-ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-ভারতে বিস্তার লাভ করিলেও সেই অঞ্চলে দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব বিলীন হয় নাই। বস্তুত, আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা তথা উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রভাবের পারস্পরিক সংমিশ্রণে দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালে এই সাতটি শ্রেণী ছিল সাতটি পেশাগত ভাগ। সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ-ভারতে

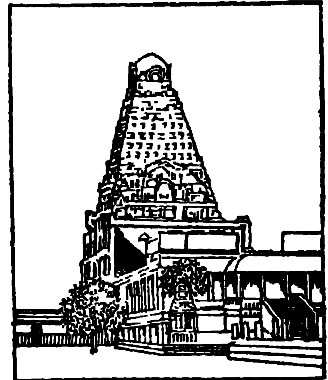
মোট পাঁচটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জনসাধারণ, পুরোহিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসক ও মন্ত্রী—এই পাঁচটি শ্রেণী।* মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাণ্ড্য দেশের শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত একথার উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ-ভারতে সমাজ মোটামুটিভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। মৌর্য শাসনকালে উত্তর-ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য ক্রীতদাসদের প্রতি যে উদার ব্যবহার করা হইত তাহা দেখিয়া মেগাস্থিনিস ভুল করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা বলিয়া কিছু নাই। যাহা হউক, সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ-ভারতের তামিল রাজ্যগুলিতে (চের, চোল, পাণ্ড্য) ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল না। দক্ষিণ-ভারতের সহিত উত্তর-ভারতের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের জাতিপ্রথা (caste system) দক্ষিণ-ভারতে ক্রমে প্রচলিত হইতে থাকে, কিন্তু উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা বহুগুণে বেশী ছিল। আধুনিক কালেও এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ-ভারতে পরিলক্ষিত হয়। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তামিল দেশগুলির সমাজ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া ভিল্লবার বা ভিল এবং মিন্নাবার বা মৎস্যজীবী এই দুই বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ধ্র বংশের রাজা গোতমীপুত্র সাতকর্ণী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

সমাজ

দক্ষিণ-ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা

প্রাচীনকালে সুদূর দক্ষিণ-ভারতে কোট্রাভাই নামে এক দেবীর আরাধনা করা হইত। এই কোট্রাভাই পরবর্তীকালে উমা বা দুর্গায় রূপান্তরিত হয়। মৌর্য সম্রাট্ অশোকের আমলে দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। ইহা ভিন্ন, জৈন ধর্মও দক্ষিণ-ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া শেষ বয়সে মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রবণবেলগোলা জৈন ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কুমারিল ভট্ট বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এই দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন। শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকা মঠ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন মঠ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করিয়া শিবের উপাসনা জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। পরবর্তীকালে বসব নামে অপর একজন ধর্মপ্রচারক শিবের উপাসনা

ধর্ম


চোল স্থাপত্য শিল্প (তাঞ্জোর)

* Smith : *Early History of India*, p. 460.

প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণ বীরশৈব নামে পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন রামানুজ ও মাধবাচার্য।

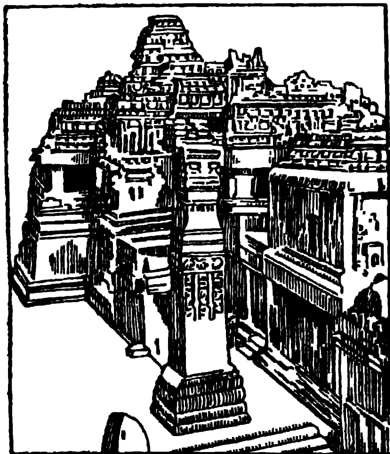
দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সেই যুগে এক অত্যাশ্চর্য শিল্পকীর্তি। দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা পল্লব রাজত্বকাল হইতে শুরু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এখানে দ্রাবিড় শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাঞ্চী নগরের মন্দিরসমূহ, মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরমে পাথরের পাহাড় কাটিয়া নির্মিত রথ আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই স্থানে সাতটি রথ—ধর্মরাজরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ প্রভৃতি পাণ্ডবদের নামে নির্মিত হইয়াছে। এগুলি পল্লব শিল্পের অমর কীর্তি হিসাবে আজিও বিদ্যমান।

সুদূর দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পরীতি



নটরাজের মূর্তি (চোল শিল্প)

দক্ষিণ-ভারতের গোঙ্গকোণ্ড চোলপুরমে বৃহদাকার বহু মন্দির রাজেন্দ্র চোল নামক চোলরাজা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই শহরটি তিনি নূতন রাজধানী হিসাবে নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একটি অতি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং পনর মাইল দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। চোল স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পীরা বড় বড় পাথর হইতে মন্দির নির্মাণ করিলেও মণিকারের সূক্ষ্মতা সেই সকল মন্দিরের আলঙ্কারিক কারু-কার্যে পরিলক্ষিত হয়। চোল শিল্পে কিছুকাল পরে একটি নূতন রীতি চালু হইয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশপথে একটি বিশাল গোপুরম, অর্থাৎ তোরণ নির্মাণ করা হইত। এই সকল তোরণের



ইলোরার কৈলাস মন্দির

কারুকার্য ছিল যেমন নিখুঁত তেমনি সুন্দর। কুম্ভকোনমের গোপুরম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম এবং অন্যান্য স্থানে নির্মিত সেই যুগের মন্দির এবং সেগুলির স্তম্ভ প্রভৃতি শিল্প-কীর্তির বিস্ময় হিসাবে আজিও বিদ্যমান। চোল শিল্পীগণ ধাতু দ্বারা মূর্তি নির্মাণে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। ব্রোঞ্জ-নির্মিত নটরাজের মূর্তি চোল শিল্পীগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য নিদর্শন

দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট শিল্পের উৎকর্ষের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। চালুক্যদের রাজধানী বাদামী বা বাতাপি নামক স্থানে বহু গুহা-মন্দির সেই যুগে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে ইলোরার কৈলাস মন্দির পাথরের পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের সন্নিকটে এলিফ্যাণ্টা গুহাগুলিও নির্মাণ-কৌশলের অপূর্ব কীর্তি। পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূটদের ন্যায় হোয়সল রাজাগণও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দোরসমুদ্রের হোয়সলেশ্বরের মন্দির হোয়সল শিল্পরীতির নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে হাতী, ঘোড়া ও নানাপ্রকার পশুমূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করা ছিল।

দাক্ষিণাত্যের শিল্প

চিত্রশিল্পেও সেই যুগ সমৃদ্ধ ছিল। কৈলাস মন্দির, বাঘ গুহা, অজন্তার গুহা, মন্দির, তাঞ্জোরের শিব মন্দির প্রভৃতির গায়ে চিত্রশিল্প অত্যন্ত উন্নত ধরনের চিত্রকলার পরিচায়ক। সেই সময়কার পূর্ব-ভারত, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চিত্রশিল্প

মুসলমানদের আগমন ভারতীয় সমাজের উপর যেমন কতকটা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতীয় সমাজ কর্তৃক তাহারা নিজেরা প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই পারস্পরিক প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ভক্তিবাদের উপর রচনা এবং অনুবাদ সাহিত্য ও বিবরণী ছিল তখনকার সাহিত্যচর্চার নিদর্শন। শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেশীয় চিরাচরিত রীতির সহিত মুসলমানদের নিজস্ব শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ তখনকার মসজিদ ও অপরাপর স্থাপত্য কার্যে দেখা যায়। (দশম অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।)

হিন্দু-মুসলমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণ

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

(Indian Culture and Civilization outside India)

বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ (India's Contacts with Outside World) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। রোম, মিশর, ব্যাবিলন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (অধুনা শ্রী লঙ্কা), সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিত এবং কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জনৈক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথিয়োন সী' (The Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক ভারতের বন্দরসমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ভারতে সেই সময়ে সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত নির্মিত হইত, সেই কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক 'প্লিনি'র (Pliny) রচনায়ও 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।* বাণিজ্যের মাধ্যমে উপরি-উক্ত দেশসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান স্বভাবতই চলিত। মৌর্য সম্রাট্ অশোকের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা এবং সেজন্য বিদেশে দূত প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ও যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অঞ্চলের সহিত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

কুষাণ আমলে কুষাণ রাজাগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় উপনিবেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বর্তমান খোটান অঞ্চলে স্যার্ অরেল স্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সেই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), ব্রহ্মদেশ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপরি-উক্ত দেশসমূহের অনেকগুলি হইতেই বিদ্যার্থীরা বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিতেন। ধর্ম সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া যে যোগাযোগ শুরু হইয়াছিল তাহা মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ

* Vide Majumdar, Raychaudhuri and Datta : *An Advanced History of India*

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের অন্তর্বর্তীকালে এই সকল দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, একথা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি ও চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় উপনিবেশ মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল।



(১) মধ্য-এশিয়া (Central Asia): প্রাচীনকাল হইতে মধ্য-এশীয় অঞ্চলসমূহের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেই সকল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কুষাণ যুগে কুষাণ রাজাগণের মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সহিত জন্মগত যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ যুগে যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত পরিভ্রমণে আসিবার কালে এবং সেই পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে হিউয়েন সাঙ্ সেই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়াই চীনে, চীন হইতে কোরিয়ায়, এবং কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। স্যার্ অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ, বুদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায়

মধ্য-এশিয়ার ভারতীয় উপনিবেশসমূহ

রচিত হয়, প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল সে-সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত। স্যার অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়ায় খননকার্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্বংসাবশেষগুলির মাঝখানে চলাফেরা করিবার কালে একথাই মনে হইয়াছে যে তিনি কোন প্রাচীন ভারতীয় নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছেন।* এই সকল অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

স্যার অরেল স্টাইনের মন্তব্য

২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia) ভারতীয় উপনিবেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল—অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই ভারতীয় নামধারী রাজাগণ এই সকল অঞ্চলের কোন কোন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল ভারতে সুবর্ণদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল এবং বহু ভাগ্যান্বেষী ভারতীয় রাজকুমার নিজ দেশ হইতে রাজ্যচ্যুত হইয়া বা পৈতৃক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত অথবা সর্বস্বান্ত হইয়া সুবর্ণদ্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইবার বহু কাহিনী প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশসমূহের ইতিহাস এই সকল দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি এবং চৈনিক ঐতিহাসিক রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত অঞ্চলসমূহ: মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জিতে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলি বিশাল রাজ্য হিসাবে শাক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি বাজ্য হাজার বৎসরেরও অধিক কাল, এমনকি ভারতে হিন্দুশাসন অবসানের পরও স্ব-পরাক্রমে বজায় থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুইটি রাজ্য এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ভিয়েৎনামের প্রায় সমগ্র অঞ্চল (আনাম) লইয়া চম্পা রাজ্য গঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চম্পা রাজ্যের রাজাগণ যথেষ্ট পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন। কম্বোজ রাজ্যের আক্রমণ এবং মোঙ্গল নেতা কুবলাই খানের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এই রাজ্যটি নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে জয় রমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন,

চম্পা রাজ্য

জয় রমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন, ... প্রভৃতি রাজাগণ

* 'Sir Aurel Stein has remarked that whilst he moved in these excavated areas under the ground he could have believed himself to be in the familiar surroundings of an ancient Indian city in the Punjab, so complete was the Indianisation of these out-of-the-way colonies.' Vide *An Advanced History of India* (3rd edn. 1967), p. 204.

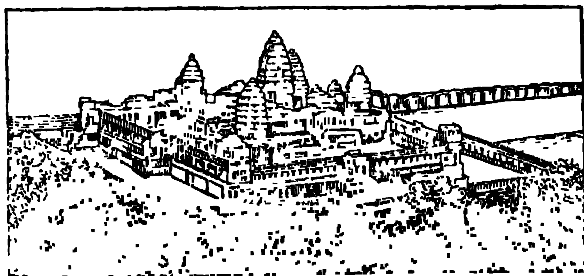
ইন্দ্রবর্মন, জয়সিংহবর্মন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, একদল ভারতীয় বণিক এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ অঞ্চলের নাম 'চম্পা'র (বর্তমানে বিহার রাজ্যে অবস্থিত) অনুকরণে তাঁহারা নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির নাম দিয়াছিলেন চম্পা। এই রাজ্যে প্রাপ্ত সে-যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় আজিও বহন করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

চম্পা

ইন্দো-চীনে স্থাপিত অন্যতম হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য ছিল কম্বোজ। কাহিনী-কিংবদন্তীতে কৌণ্ডিণ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। আবার অপর এক কাহিনীতে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা আদিত্য বংশের পুত্র এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেই যে এই রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত। চৈনিকগণ এই রাজ্যটির নাম দিয়াছিল ফুনান। জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিকের রচনা হইতে জানা যায় যে, ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। কম্বোজ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজাগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যটি ক্যাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, লাওস, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের একাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক সংস্কৃত লিপি হইতে এই রাজ্যের রাজাগণ সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন, অ্যাঙ্কোরভাট ও আঙ্কোরথোম নামক দুইটি মন্দির কম্বোজ রাজ্যের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে এই রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কম্বোজ রাজ্য

জয়বর্মন, যশোবর্মন, সূর্যবর্মন শ্রেষ্ঠ রাজাগণ



অ্যাঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

অ্যাঙ্কোরভাট মন্দিরটি বিষ্ণুর উপাসনার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২১৩ ফুট উচ্চ, পূর্ব-পশ্চিমে ১ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ½ মাইল প্রশস্ত

এই মন্দিরটি পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই। ৭০০ ফুট চওড়া একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরটির ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা হইয়াছে। শিব, অর্জুন, যম প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এই মন্দিরটির গাত্রে খোদিত আছে।

আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল আঙ্কোরথোম। রাজা সপ্তম জয়বর্মন কর্তৃক এই রাজধানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরটি দুই মাইল দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। আঙ্কোরথোম নগরটির কেন্দ্রস্থলে পিরামিড-আকারে নির্মিত তিন ধাপযুক্ত বেয়ন মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিতে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের শীর্ষদেশে একটি করিয়া চতুর্মুখ-বিশিষ্ট ধ্যানরত মূর্তি আছে। আঙ্কোরথোম শহরে ১০০ ফুট প্রশস্ত পাঁচটি রাজপথ আছে। ইহা ভিন্ন, প্রাচীর-বেষ্টিত বহু-সংখ্যক জলাশয় এই নগরের শোভাবর্ধনের জন্য খনন করা হইয়াছিল। আঙ্কোরথোম নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা যে একটি অতি সুন্দর পরি-কল্পনা অনুযায়ী নির্মিত নগরী ছিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আঙ্কোরথোম—কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী : বেয়ন মন্দির



আঙ্কোরথোমের বেয়ন মন্দির

মালয় উপদ্বীপে একাদিক্রমে দুইটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের অধীনে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি যাবতীয় দক্ষিণ পূর্ব ভারতীয় ঔপনিবেশিক অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠে। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্‌গণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। আরব বণিকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্‌গণের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ভারত ও চীনের রাজাগণও শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্‌গণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে ত্রুটি করিতেন না। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্ বালপুত্রদেব বাংলার পাল বংশীয় রাজা দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করাইয়া

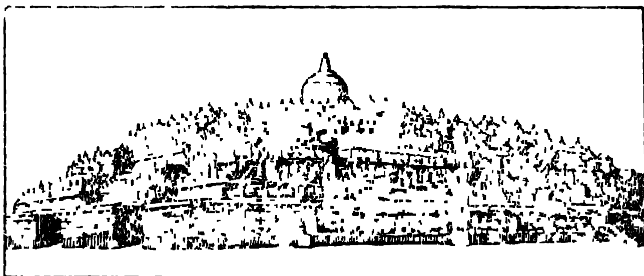
শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

দিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল এই মঠের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ বাংলাদেশের সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বস্তুত, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাংলাদেশের প্রভাবাধীনে ছিলেন। কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের ধর্মগুরু।

বালপুত্রদেব ও দেবপালের সৌহার্দ্য

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মগুরু কুমার ঘোষের নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট্ তারা মন্দির নামে একটি অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বরবুদরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্তূপটি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের আমলে যবদ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। যবদ্বীপ (জাভা) সেই সময়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। বরবুদরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল এবং প্রায় ৪০০ × ৪০০ বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে এবং মন্দিরগাত্রে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় ও যবদ্বীপের

শিল্পকলা. তারা মন্দির, বরবুদরের মন্দির



যবদ্বীপ (জাভা)-এর বরবুদর

ভাস্কর্য শিল্পকলার এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। প্রধানতঃ জাতকের বিভিন্ন কাহিনীকে দেওয়ালগাত্রে ভাস্কর্যে রূপদান করা হইয়াছে।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজাগণের এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিবার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলদেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন. কিন্তু কিছুকাল পরই শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া লন। কিন্তু ইহার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের গৌরব আর বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমেই স্তিমিত হইতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের জনৈক রাজা সিংহলের (অধুনা শ্রীলংকা) বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

পড়ে। নবম শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ক্রমে যবদ্বীপও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। বিজয় নামে জনৈক রাজা ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে তিক্ত-বিল্ব নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া যবদ্বীপ (জাভা) রাজ্যটিকে শক্তি ও সম্মানের পথে ধাবিত করেন। ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে - অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, যবদ্বীপ সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। এই রাজ্যের জনৈক স্থানীয় নেতা দেশত্যাগ করিয়া গিয়া মালাক্কা দ্বীপে এক নূতন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মালাক্কার রাজা ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে ক্রমে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদের আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে এবং এই রাজ্যে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারিত হয়। সেই সময়ে একদল হিন্দু বলী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে একটি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইস্‌লাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও আজও বলী দ্বীপটি হিন্দু ধর্মের অনুরাগী রহিয়াছে।

যবদ্বীপ (জাভা)

মালাক্কা

বলী

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুদের যে সাহসিকতা, উদ্যমশীলতা ও কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ছিল না এবং তাহারা বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনে পশ্চাৎপদ ছিল না একথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

নবম অধ্যায়

(ক) তুর্ক-আফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন

(Rise, Growth and Decline of Turco-Afghan Power)

আরবগণ : সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চলে আরব অধিকার স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আরব রাজ্য এক দুর্ধর্ষ শক্তি লইয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অষ্টম শতকের শেষদিকে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত আরব রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে উত্তর-ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য, দূরের কথা, সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কতকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। এই রাজনৈতিক অনৈক্য উত্তর-ভারতের বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য, আরব অধিকার

সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া আরবগণ ক্রমে সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করিল। কিন্তু তাহারা যখন আরও দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা শুরু করিল তখন চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার ও কার্কটদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধিল। এই কারণে এবং বিশেষভাবে আরবদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী ধর্ম-দ্বন্দ্বে আরবদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় আরব শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও লোপ পাইল।

সিন্ধু-উপত্যকায় আরব অধিকারের অবসান

গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্থায়ী শাসনের সূত্রপাত হয় দশম শতকের শেষদিক হইতে। আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে গজনী রাজ্যের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের শাহীয়া বংশের রাজা জয়পালের যুদ্ধ বাধে (৯৭৫ খ্রীঃ)। জয়পাল ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা। তাঁহার রাজ্য চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘমান্ নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল উদ্‌ভাণ্ড-পুর। গজনীর সৈন্য শক্তিবৃদ্ধি জয়পালের রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে না, এজন্য জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পাল সাফল্যলাভ করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হইল। ইহার পর গজনীর সুলতান সবুক্তগীন একাধিকবার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত কাবুল এবং উহার নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর সবুক্তগীন আর ভারতবর্ষ অভিযানে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের যে ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তীকালে উহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

গজনী কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ

সুলতান মামুদ ঠিক কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও তিনি মোট সতর বার আক্রমণ করিয়াছিলেন এই সংখ্যা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

১৭ বার আক্রমণ

সুলতান মামুদ পিতৃশত্রু জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু জয়পালের প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করায় জয়পাল নিজপুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার দিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আনন্দপাল উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিওর, দিল্লী, কনৌজ, আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণের সাহায্য লইয়া এক সম্মিলিত বাহিনী-সহ সুলতান মামুদকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। নিশ্চিত জয়ের মুখে আনন্দপালের হস্তী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলে আনন্দপালের সেনাবাহিনী আনন্দপাল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন মনে করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিল। সুলতান মামুদ জয়ী হইলেন। ইহার পর নগরকোট, বর্তমান কাংড়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের অভিযানের মধ্যে মথুরা লুণ্ঠন, কনৌজ লুণ্ঠন এবং সোমনাথের মন্দির আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোমনাথের মন্দিরটি অপবিত্র করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থিত দুই কোটি মুদ্রা লইয়া

সুলতান মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ

সুলতান মামুদ চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের ভারতবর্ষ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন। ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। পুনঃ পুনঃ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার এবং ফিরিয়া যাইবার ফলে সেই অঞ্চলে গজনীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদের সভায় সদ্ব্যবহার না পাইয়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ মনীষীর অন্যতম অল্‌বিরূণী ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার রচিত 'তহ্‌কিক্‌-ই-হিন্দ্‌' সমসাময়িক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিন্দু রীতি-নীতি সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ঘুর বংশ : ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ অভিযান করিয়াছিলেন ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরী। তিনি কাবুল ও গজনী রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে (১১৭৫ খ্রীঃ) তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন। ইহার পর তিনি ক্রমে উচ্‌ ও পেশোয়ার জয় করিলেন। লাহোরও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। রাজপুত জাতি তাঁহার অগ্রগতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হইল এবং ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী চৌহান্‌ বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্যাংশ ভাতিন্দা জয় করিলে পৃথ্বীরাজ উত্তর-ভারতের রাজাগণের সাহায্য লইয়া মহম্মদ ঘুরী অধিকৃত ভাতিন্দা পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া মহম্মদ ঘুরীকে শক্তি সঞ্চয় করিবার এবং পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজাগণ পরাজিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। মহম্মদ ঘুরী নব-বিজিত ভারতীয় রাজ্যের ভার তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও ক্রীতদাস কুতব উদ্দিনের উপর ন্যস্ত করিয়া (১১৯২ খ্রীঃ) স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারতবর্ষ বিজয়

দিল্লী সুলতানি

দাস সুলতান বংশ

কুতব-উদ্দিন অইবক্‌ : কুতব-উদ্দিন অইবক্‌ শাসনভার গ্রহণ করিয়া দিল্লী, অন্‌হিলবার, কনৌজ, গোয়ালিওর প্রভৃতি জয় করিলেন। সিংহাসনে আরোহণের অনতিপরেই উচ্‌ ও মুলতানের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচা এবং কিরমান প্রদেশের শাসক তাজ-উদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলে কুতব-উদ্দিন তাহা প্রতিহত করেন। তিনি তাঁহার সহকর্মী ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌-বখ্‌তিয়ার খল্‌জীকে বিহার ও বাংলা দেশ জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর পুত্র ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জী বিহার জয় করিয়া বাংলাদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্য আক্রমণ করেন। আকস্মিক আক্রমণের প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনায় লক্ষ্মণসেন নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান

কুতব-উদ্দিন অইবক্‌ (১২০৬-১০ খ্রীঃ)

(১১৯৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ)। ইহার পর ঢাকার নিকট রাজধানী স্থাপন করিয়া লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইয়া বসিলেন। তাঁহার সুলতান-পদ লাভের সময় হইতে যেমন দিল্লী সুলতানির পত্তন (১২০৬ খ্রীঃ) হয়, তেমনি ঐ সময় হইতে সুলতানি শাসনের কেন্দ্র হিসাবে দিল্লী পরিচিতি লাভ করে। 'চৌগান' বা 'পোলো' খেলিবার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল (১২১০ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজ্য দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার, বাংলাদেশের একাংশ, গুজরাট ও কালিঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যক্তি-বিচারে কুতব-উদ্দিন ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ, দানশীল শাসক ছিলেন। তাঁহার সীমাহীন দানের জন্য ভারত-ইতিহাসে তিনি "লাখবক্স" উপাধিতে ভূষিত।

আরাম শাহ্ : ইল্‌তুৎমিস্ : পরবর্তী সুলতান আরাম শাহ্ ছিলেন কুতব-উদ্দিনের পোষ্য পুত্র। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি আরামপ্রিয়। দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌গণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুতব-উদ্দিনের জামাতা ইল্‌তুৎমিসকে সিংহাসনে বসাইলেন। ইল্‌তুৎমিস্ ইল্‌বেরি তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ছিলেন বদায়ুনের শাসনকর্তা। আরাম শাহের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি প্রায় টলমল করিতেছিল। রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌দের একাংশ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইল্‌তুৎমিস্‌কে বাধা দিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস্ কঠোর হস্তে সেই সকল ষড়যন্ত্রকারীকে দমন করিয়া এবং রাজ্যের যে-সকল অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিস খাঁ পশ্চিম এশিয়ার খারিজম রাজ্য আক্রমণ করিলে সেখানকার শাহ্ জালাল-উদ্দিন মঙবরণী পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। সেই সূত্রে চিঙ্গিস খাঁর সহিত যাহাতে দিল্লী সুলতানির সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় সেজন্য ইল্‌তুৎমিস্ জালাল-উদ্দিন মঙবরণীকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। এই দূরদর্শিতার ফলে তিনি মোঙ্গল আক্রমণ এড়াইয়া গিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লী সুলতানির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে সুদৃঢ় করিয়া উহার স্থায়িত্বদান করিয়াছিলেন ইল্‌তুৎমিস্। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান ধর্মজ্ঞানী খাজা কুতব-উদ্দিনের কবরের উপর কুতব মিনার নির্মিত হইয়াছিল। বাগদাদের খলিফা ইল্‌তুৎমিস্‌কে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আরাম শাহ্ (১২১০-১১ খ্রীঃ)

ইল্‌তুৎমিস (১২১১-৩৬ খ্রীঃ)

রাজিয়া : ইল্‌তুৎমিস্ তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে সুলতানি-পদে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পুত্রগণ ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎ-মিসের মৃত্যুর পূর্বে প্রথম পুত্র মারা গিয়াছিলেন। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী। কিন্তু দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌গণ স্ত্রীলোকের শাসন মানিবেন না স্থির করিয়া ইল্‌তুৎমিসের শেষ নির্দেশ অমান্য করিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র রুকন্-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতা ও অলসতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহারা

রাজিয়া (১২৩৬-৪০ খ্রীঃ) ও পরবর্তী বিশৃঙ্খলা

রাজিয়াকেই সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করিলেন। রাজিয়ার শাসনদক্ষতা অনেক আমীর-ওমরাহের পছন্দ হইল না। ফলে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং রাজিয়াকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পর পর সুলতান পরিবর্তন করিয়া শেষ পর্যন্ত ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে তাঁহারা সিংহাসনে বসাইলেন (১২৪৬ খ্রীঃ)।

নাসির-উদ্দিন মামুদ
(১২৪৬-৬৬ খ্রীঃ)

নাসির-উদ্দিন মামুদ ছিলেন উদার, নির্বিরোধী, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু সুলতান। তিনি তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ খাঁর উপর সম্পূর্ণ শাসনভার ছাড়িয়া দিলেন। উলুঘ খাঁর মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিয়াছিল। অপুত্রক অবস্থায় নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু (১২৬৬ খ্রীঃ) হইলে উলুঘ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান হইলেন।

গিয়াস-উদ্দিন বলবন
খ্রীঃ

গিয়াস-উদ্দিন বলবন: গিয়াস-উদ্দিন বলবন উদ্ধত আমীর-ওমরাহদের দমন করিয়া এবং সেনাবাহিনী সুসংগঠন করিয়া দিল্লী সুলতানির শক্তি বৃদ্ধি করেন। বলবন ছিলেন ইলতুৎমিসের চল্লিশজন প্রধান ক্রীতদাস 'বন্দেগান-ই-চাহেলগানে'র অন্যতম। তিনি ইহার পর মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া এবং মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেন। মেওয়াটি দস্যুদের দমন, বাংলাদেশের বিদ্রোহী স্বাধীন সুলতান তুঘ্রিল খাঁকে দমন, নিজপুত্র বুগরা খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত প্রভৃতি কাজ করিয়া বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং দিল্লী সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

বলবনের সুদক্ষ শাসনাধীনে দিল্লীর স্বার্থান্বেষী আমীর-ওমরাহ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দিল্লীর সুলতানি নিজেদের প্রভাবে আনিতে চাহিলেন। বলবন তাঁহার পৌত্র কাইখসরুকে পরবর্তী সুলতান মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমীর-ওমরাহ তাঁহার অপর এক পৌত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

বলবনের পরবর্তী-কালের দুর্বলতা:
কাইকোবাদ
(১২৮৭-৯০ খ্রীঃ)

কাইকোবাদ ছিলেন অত্যন্ত অকর্মণ্য ও অলস ব্যক্তি। তিনি বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। তুর্কী অভিজাতগণ ও খলজী অভিজাতগণ সেই সুযোগে প্রাধান্য অর্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলে দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সুযোগে খলজী বংশের জালাল-উদ্দিন ফিরুজ কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া নিজে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।



গিয়াস-উদ্দিন বলবন

খলজী বংশ

জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খলজী : জালাল-উদ্দিন ফিরুজ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বৃদ্ধ বয়স। তিনি কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি। তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে জালাল-উদ্দিন দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগকে বিনা বাধায় ফিরিয়া যাইতে দিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, একদল মোঙ্গল দিল্লীর সন্নিকটে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে চাহিলে তিনি সেই অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'নব-মুসলমান' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলা-উদ্দিনকে তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন মালব জয় করিলে তিনি তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদও দান করেন। আলা-উদ্দিন বৃদ্ধ জালাল-উদ্দিনকে সরাইয়া কিভাবে নিজে সুলতান হইতে পারেন সেই পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। এজন্য কিছু ধনদৌলত হাতে থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া সুলতানের বিনা অনুমতিতে দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। রামচন্দ্র প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া আলা-উদ্দিনের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিলেন। দেবগিরি অভিযানে আলা-উদ্দিন কেবল প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এমন নহে, এই অভিযান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে মুসলমান অভিযানের পথও প্রশস্ত করিয়াছিল। ইহাই ছিল আলা-উদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

খলজী বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরুজ (১২৯০-৯৬ খ্রীঃ)

আলা-উদ্দিন খলজী : আলা-উদ্দিন দেবগিরি হইতে আনীত ধনরত্ন দিল্লীর রাজকোষে জমা দিলেন না। কিন্তু স্নেহশীল জালাল-উদ্দিন ইহা দোষের কারণ বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি আমীরদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া আলা-উদ্দিনেরই ইঙ্গিতে প্রাণ হারাইলেন। আলা-উদ্দিন আমীর-ওমরাহদের প্রচুর অর্থ উৎকোচ প্রদান করিয়া সকলকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আলা-উদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)



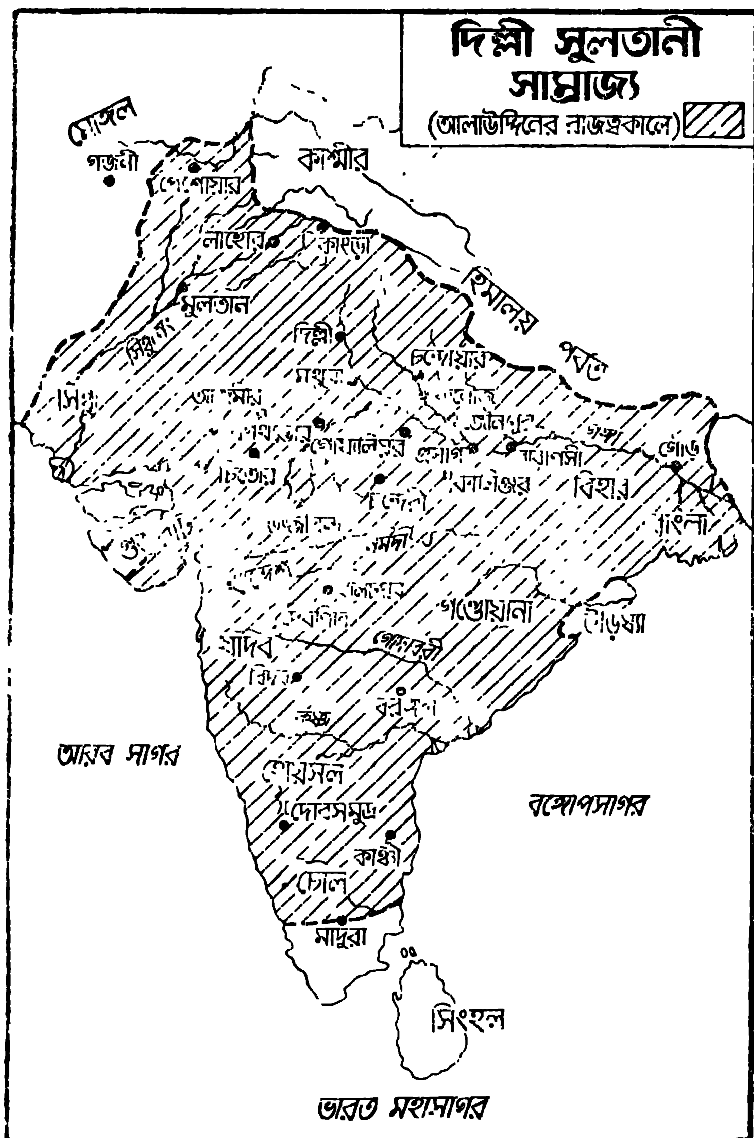
আলা-উদ্দিন খলজী

হত্যালীলা ও অর্থ বণ্টনের মাধ্যমে সিংহাসন আরোহণ নিষ্কণ্টক হইলেও আলা-উদ্দিনের সমস্যার শেষ হইল না। উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিক হইতে মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ, রাজপুতানা, মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ,

মোঙ্গল আক্রমণ

তুর্কী অভিজাতবর্গের আলা-উদ্দিনের শাসনের বিরোধিতা, দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের মনোবৃত্তি, সবকিছু আলা-উদ্দিনের পরিস্থিতি জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ মোট পাঁচবার হানা দিয়াছিল। কিন্তু আলা-উদ্দিনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবারই তাহারা পরাজয়



স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর মোঙ্গলগণ আলা-উদ্দিনের আমলে আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। আলা-উদ্দিন ছিলেন দূরদর্শী শাসক। মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়ী প্রতিরোধের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধন করিয়া দেশকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তিনি সামান ও দীপালপুর নামক স্থানে স্থায়ী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন।

মোঙ্গলদের প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানির রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহাসন আরোহণ করিবার পূর্বে মালব ও দেবগিরি জয়ের সাফল্য আলা-উদ্দিনের মনে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বিশ্ব-বিজেতা হইবার স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু কোতোয়াল নিজাম-উল্-মুলক্-এর উপদেশে পৃথিবী জয়ের কল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, ধার, চন্দেরী জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে সেনাপতি মালিক কাফুর ও খাজা হাজির চেষ্টায় মুসলমান অধিকার দক্ষিণ-ভারতের বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য, দোরসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য, মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বে দিল্লী সুলতানি রাজ্য এইরূপ বিশালতা লাভ করে নাই। আলা-উদ্দিনের সমর বিজয়ের প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সৈনিকদের স্বল্প বেতনে দৈনন্দিন ব্যয়-সঙ্কুলান সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম আলা-উদ্দিন খল্জীই ভারতবর্ষে চালু করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মূল্য নির্ধারণ উৎপাদনকারী অর্থাৎ কৃষক ও শিল্পোৎপাদকদের আর্থিক দুর্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মূল্য এমন স্তরে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, উৎপাদন-ব্যয়ের পর মুনাফা তাহাদের থাকিত না বলিলেই চলে।

রাজ্য জয়

মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আমীর ওম্‌রাহ্‌গণ অত্যধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহাদের অবাধ আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান প্রভৃতি সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে এই বিবেচনা করিয়া আলা-উদ্দিন সরকারী অনুমতি ভিন্ন আমীর-ওম্‌রাহ্ বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হিন্দুদের হাতে যে-পরিমাণ অর্থ ছিল তাহা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ভিন্ন নানাপ্রকার করভার তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে বিদ্রোহ করিবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু—অর্থ, তিনি কাহারও হস্তে রাখিতে দেন নাই। আলা-উদ্দিন শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরুণী, কবি হুসেন দেহ্‌লবী প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। আমীর খস্‌রু ছিলেন তাঁহার সভাকবি। ইনি তাঁহার সুন্দর কাব্যরচনা ও

শাসনব্যবস্থা

যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য 'ভারতের তোতাপাখী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নৃশংসতা দোষে দুষ্ট হইলেও আলা-উদ্দিন শাসনকার্য পরিচালনায় অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আলা-উদ্দিনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণী ও আফ্রিকার পর্যটক ইবন্-বতুতা পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন। জিয়া-উদ্দিন বরণী আলা-উদ্দিন খলজীর শাসনকালের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি আলা-উদ্দিনের শঠতা ও নির্মমতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে মিশরের ফারাও (Pharaoh) অর্থাৎ রাজা অপেক্ষাও অধিক অত্যাচারী এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের রক্তপাতে সিদ্ধহস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, আফ্রিকার পর্যটক ইবন্-বতুতা তাঁহাকে দিল্লী সুলতানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলা-উদ্দিনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

আপাতদৃষ্টিতে বরণী ও বতুতার মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও সামান্য তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উভয় মন্তব্যের মধ্যেই যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। প্রশাসনের দিক দিয়া বিচার করিলে অথবা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে আলা-উদ্দিনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া বিবেচনা করা সুযৌক্তিক। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য সৈনাবাহিনী গঠন এবং মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অনুরূপ, আমীর-ওমরাহদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নাশ করিবার এবং হিন্দুদের আর্থিক শক্তি নাশ করিয়া তাহাদের বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা হ্রাস, সবকিছু তাঁহার প্রশাসনিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

বরণীর মন্তব্য

বতুতার মন্তব্য

কেমব্রিজ ইতিহাসে আলা-উদ্দিনকেই সুলতানি শাসনের প্রকৃত সংগঠক বলা হইয়াছে। আলা-উদ্দিন উলেমাদের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া প্রশাসনকে ধর্মনিরপেক্ষ করিবার প্রাথমিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, আলা-উদ্দিনের সিংহাসন লাভের পূর্বে পিতৃব্য জালাল-উদ্দিনের মত না লইয়া দেবগিরি অভিযান এবং ইহার পর পিতৃব্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করান এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে এইরূপ সকলের প্রাণনাশ তাঁহার শঠতা নির্মমতা এবং চরিত্রের নীচতার পরিচায়ক। এইদিক দিয়া বরণীর মন্তব্যও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং বতুতা ও বরণী উভয়ের মন্তব্যেই গ্রহণযোগ্য যুক্তি আমরা লক্ষ্য করি।

উভয় মতবাদে সামঞ্জস্য

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী খলজী সুলতানগণ দিল্লী সুলতানির উপর তাঁহাদের অধিকার বজায় রাখিতে পারিলেন না। আলা-উদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর নিজ ইচ্ছামত আলা-উদ্দিনের নাবালক পুত্র শিহাব্-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিন্তু তিনিও বেশীদিন সেই ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া আলা-উদ্দিনের কয়েকজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা করিল। তাহারা আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র

মোবারক শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। ইহাতেও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিল না। দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পর পর সুলতান পরিবর্তন এবং ফলে অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে আমীর-ওমরাহ্ গাজী মালিককে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হইলেন। এইভাবে খলজী বংশের অবসান ঘটিল (১৩২০ খ্রীঃ)।

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী-কালে দুর্বলতা
খলজী বংশের অবসান (১৩২০)

তুঘলক বংশ

গিয়াস উদ্দিন তুঘলক: গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাঁহার ছিল। তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া এবং সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি আলা-উদ্দিনের কঠোর নীতিরও তিনি কতকটা হ্রাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশে বগ্রা খাঁর বংশধরগণের মধ্যে শাসক-পদ লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হইলে গিয়াস-উদ্দিন স্বয়ং বাংলাদেশে আসিয়া নাসির-উদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থাপন করিয়া (১৩২৩ খ্রীঃ) দিল্লী ফিরিয়া যান। দিল্লী প্রবেশ কালে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ নির্মিত হইয়াছিল উহা ভাঙিয়া পড়ে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ ই এজন্য দায়ী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

তুঘলক বংশ:
গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫)

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক: জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চরিত্রে নানা পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। নিজে কবি, সুসাহিত্যিক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ধর্মান্ধতা, ব্যভিচার, মদ্যাশক্তি, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি সবকিছুর তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি ছিলেন মুসলমান সুলতান বাদশাহদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও গুণসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা এবং বিভিন্নমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবহেতু তিনি নিজ পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই। একবার কোন কার্যে অকৃতকার্য হইলে তিনি ধৈর্যহীন হইয়া পড়িতেন ফলে পরবর্তী পদক্ষেপে তাঁহার ভুলভ্রান্তি ঘটিত। এই সকল কারণে ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌-স্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ্ প্রভৃতি তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার যৌক্তিকতার কথা বিচার করিয়া গার্ডনার, ব্রাউন, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিক মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ

মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-৫১)

মস্তিষ্কতার অভিযোগ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। ইবন্-বতূতা বা জিয়া-উদ্দিন বরণীর রচনায় বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি একদিকে যেমন মুক্তহস্তে দান করিতেন অন্যদিকে তেমনি রক্তপাত করিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই কথা উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন।

দোয়াব অঞ্চলের কৃষক প্রজাবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের শাস্তি হিসাবেই মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তাহাদের উপর অত্যধিক করভার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, সুলতান মহম্মদ-বিন্ তুঘলক তাঁহার সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের ব্যয়-সংকুলানের জন্য এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এবং করভার এই দুই মিলিয়া গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের কৃষকদের অবস্থা এমন অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, অনেকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুলতান যখন কৃষকদের দুর্দশার সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন তাহাদের সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন সাহায্য লইবার মত আর কেহই ছিল না। কারণ অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, অন্যরা স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

দেবগিরি পরিকল্পনা, পরিকল্পনার ব্যর্থতা

দিল্লী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ ইহা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন, মোঙ্গল আক্রমণের দিক হইতে বিচারে দিল্লী অপেক্ষা দূরবর্তী হওয়ায় অনেক বেশী নিরাপদ ছিল। কিন্তু স্থানান্তরের কাজ কিভাবে করা উচিত ছিল তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি দিল্লীর সকল লোককে দেবগিরি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সেখানে যাইবার পর সেই স্থানটি ভাল না লাগায় তিনি পুনরায় সকলকে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করেন নাই যে, তাঁহার রাজসভা ও দপ্তর, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিলে দিল্লীর জনসাধারণ আপনা হইতেই দেবগিরি যাইতে বাধ্য হইত। অনুরূপে, তাঁহার কারাজল অভিযান, খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনাও যুক্তির দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য ছিল। চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কারাজল বা কুর্মাচলের পার্বত্য জাতি ভারতের সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। কারাজল অভিযানের পর এই আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ হইয়াছিল। সুলতান চীন জয়ের জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহা সত্য নহে। জিয়া-উদ্দিন বরণী স্পষ্টভাবে এই অভিযান কারাজলের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারাজল অভিযান সুলতানের সাফল্যের পরিচায়ক। পারস্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে খোরাসান, ইরাক প্রভৃতি জয়ের পরিকল্পনা করা অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু মিশরের সুলতান এই অভিযানে যোগদান করিবার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পালন করিতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করায় মহম্মদ-বিন্-তুঘলক উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তামার নোট প্রচলন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। চীনের অনুকরণে তামার নোট চালু করিতে গিয়া উহা যাহাতে কেহ নকল করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিবার

প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। রাজ্যের সর্বত্র উহা নকল করা শুরু হওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের পরিকল্পনাগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হইলেও এগুলির ব্যর্থতা, তাঁহার নিজের অব্যবস্থিত চিত্ততা প্রভৃতি তাঁহার শাসন-ব্যবস্থাকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় মোঙ্গল নেতা তরমরিশ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১৩২৭-২৮ খ্রীঃ) এবং পাঞ্জাব অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ফেরিস্তার বিবরণ হইতে জানা যায়, তরমরিশ খাঁকে সুলতান প্রভূত ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া নিরস্ত্র করেন। এই সকল দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-ভারত সুলতানি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেখানে বিজয়নগর ও বাহ্মনী নামে দুইটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। বাংলাদেশে ফখ্রুদ্দিন মুবারক শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা (১৩৩৮ খ্রীঃ) করিলেন। সিন্ধু অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াই মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩৫১ খ্রীঃ)। দিল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানির পতনের সূত্রপাত তাঁহার রাজত্বকালেই হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ: সুলতানির পতনের সূত্রপাত



মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক

তথাপি বিচারকার্যে ন্যায় ও সততা, শাসন ব্যাপারে ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রচলন, কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎসাহ দান প্রভৃতি মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য।

সাফল্য

তাঁহার রাজত্বকালে বিদেশী পর্যটক ইবন্-বতুতা ভারতবর্ষে আসেন (১৩৩৩ খ্রীঃ)। সুলতান মহম্মদ-বিন্ তুঘ্লক তাঁহাকে দিল্লীর প্রধান কাজীর (বিচারপতির) পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে চীনে ভারতীয় দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। ইবন্-বতুতা সুলতানের সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ আট বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন। ইহার নাম 'সফরনামা'।

ইবন্-বতুতা

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক ছিলেন এক অদ্ভুত, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের লোক। ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।

ফিরুজ তুঘ্লক: পরবর্তী তুঘ্লক সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের পিতৃব্য রজবের পুত্র (খুড়তুত ভাই) ফিরুজ তুঘ্লক। কারণ, মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি তেমন সামরিক দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

ফিরুজ তুঘ্লক (১৩৫১ ৮৮)

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের রাজত্বকালের শেষদিকে সিন্ধু ও বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। শামস্-উদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪১-৫৭ খ্রীঃ) অধীন স্বাধীন বাংলাদেশ তিনি পুনর্দখল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ যখন বাংলার সুলতান তখন ফিরুজ শাহ্ পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু তাঁহার এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। পরবর্তী দুই শত বৎসর বাংলাদেশ নিরুপদ্রবে স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে। সিন্ধু অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার পথে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, কাংড়া (নগরকোট) দুর্গটিও তিনি পুনর্দখল করিয়াছিলেন। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের রাজত্বকালের অব্যবস্থার সুযোগে নগরকোট স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। নগরকোট দুর্গ জয় করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ জ্বালামুখী মন্দিরে প্রাপ্ত তিনশত সংস্কৃত পুস্তক ফিরুজ তুঘ্লক তাঁহার সভাকবি আজ-উদ্দিনকে দিয়া ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘ্লক প্রজাহিতৈষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থার প্রসার, রাজস্বভার লাঘব প্রভৃতি করিয়াছিলেন। সেচের জন্য শতদ্রু নদী হইতে ঘাঘর পর্যন্ত এবং অপরটি যমুনা হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত খাল তিনি খনন করাইয়াছিলেন। আরও দুইটি সেচখাল একটি মাণ্ডবী ও সিরমুরা পাহাড় হইতে হিসার ও হান্সি পর্যন্ত এবং অন্যটি ঘাঘর হইতে হিরণীরেখা গ্রাম অবধি তিনি খনন করাইয়াছিলেন। সেচখাল ভিন্ন বহু উদ্যান ও শহর ফিরুজ তুঘ্লক নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি 'নিয়োগ পরিষদ' (Employment Bureau), পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় 'দার-উল-সফা', দরিদ্রদের ভিক্ষা দিবার জন্য 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। অ-মুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর, কৃষি-জমির ফসলের এক-দশমাংশ (খারাজ), সরকারের সাহায্যার্থে দান (জাকাৎ) এবং যুদ্ধকালে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ও খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (খামস্) ধার্য করিয়াছিলেন। এইগুলি ভিন্ন তিনি আরও কয়েক প্রকার কর স্থাপন করিয়াছিলেন। বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু সংখ্যক মাদ্রাসা মক্তব স্থাপন এবং ইস্লাম ধর্মজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ফিরুজ তুঘ্লকের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। ইস্লাম ধর্মজ্ঞানী বিখ্যাত রুমী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরুজ তুঘ্লক সামরিক সংগঠন করিতে গিয়া উহাকে সামন্তপ্রথা ভিত্তিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি জমি ভোগদখলের অধিকার—অর্থাৎ জায়গির দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ক্রীতদাসের সংখ্যাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমীর-ওমরাহ্গণ ফিরুজ তুঘ্লকের নিকট হইতে কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে তাঁহাকে ক্রীতদাস উপঢৌকন দিতেন। এইভাবে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জায়গির প্রথা চালু হওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনীতির উপর চাপ পড়িয়াছিল। ফিরুজ তুঘ্লকের শাসনের

তাঁহার সংস্কার কার্যাদি

শাসনে ত্রুটি

ত্রুটি হিসাবে ইহা উল্লেখ্য। ইহা ভিন্ন ধর্মের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধাবশত তিনি ধর্মান্ধনীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। নিজে তিনি ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। সুন্নী সম্প্রদায় ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে শিয়া সম্প্রদায় এবং অ-মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ধর্মান্ধতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ইস্‌লাম ধর্ম-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

দিল্লী সুলতানির পতনের জন্য তাঁহার দায়িত্ব

ফিরুজ তুঘ্‌লকের শাসন কতক পরিমাণে জনপ্রিয় হইলেও দিল্লী সুলতানির ভিত্তি তিনি দুর্বলতর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব বিস্তার, পদস্থ কর্মচারীদের অক্ষমতা ও অদক্ষতা, সামরিক কর্মচারীদের ও অভিজাতবর্গের প্রতি তাঁহার অযৌক্তিক ঔদার্য, ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন দিল্লী সুলতানির পতনের পথ সহজতর করিয়া দিয়াছিল।

সৈয়দ বংশ : লোদী বংশ : মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিরুজ তুঘ্‌লক বা তাঁহার পরবর্তী সুলতানদের ছিল না। দিল্লী সুলতানির শাসন যখন ক্রমেই শিথিল এবং দিল্লী সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই ক্ষুদ্র পরিসর হইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন (১৩৯৮ খ্রীঃ) দিল্লী সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়াছিল। দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশ এই দুর্বলতার সুযোগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তুঘ্‌লক বংশের শাসনকালের শেষে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তী কালে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের যে অংশ টিকিয়াছিল উহার উপর সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘ্‌লক বংশের শেষ সুলতান মামুদ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ দৌলত খাঁ লোদীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু মুলতান ও দীপালপুরের শাসনকর্তা এবং ভারতে নিযুক্ত তৈমুরের প্রতিনিধি খিজির খাঁ দৌলত খাঁ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসন হইতে সরাইয়া নিজে শাসনকর্তা হইয়া বসিলেন।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১)

খিজির খাঁ নিজেকে "সৈয়দ" অর্থাৎ হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশ সৈয়দ বংশ নামে ইতিহাস-খ্যাত। খিজির খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোবারক শাহ্‌ চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোবারক শাহের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন আলম শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্য দিল্লী ও উহার চতুষ্পার্শ্বে সীমাবদ্ধ ছিল। আলম শাহ্‌ নিজের অকর্মণ্যতা হেতু বহ্‌লুল লোদী নামে জনৈক ওম্‌রাহের উপর শাসনভার অর্পণ করিয়া বদাউনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯ খ্রীঃ) জাতিতে আফগান বা পাঠান ছিলেন। কাশী হইতে বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার

পুত্র নিজাম খাঁ (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) সিকন্দর লোদী নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার শাসনদক্ষতায় রাজ্যে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। গরীব-দুঃখী প্রজারাও তাঁহার নিকট সরাসরি আবেদন করিবার সুযোগ পাইত। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক বিধ্বস্ত আগ্রা শহরের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি তাঁহার ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সিকন্দর লোদীর পর তাঁহার অকর্মণ্য ও উদ্ধত পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার ব্যবহারে আত্মীয়-স্বজনগণও প্রীত ছিলেন না। এমতাবস্থায় ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ লোদী ও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য কাবুলের শাসনকর্তা বাবরকে গোপনে আমন্ত্রণ জানাইলেন। বাবরের হস্তে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলে দিল্লীর তুর্কআফগান সুলতানির অবসান ঘটে।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

দিল্লী সুলতানির পতনের কারণ নানাবিধ কারণে দিল্লী সুলতানির পতন ঘটিয়াছিল। এই সকল কারণকে আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরাগত এই প্রধান দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্য সুলতানদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের আনুগত্য বা সহযোগিতার উপর উহা গড়িয়া উঠে নাই। এজন্য দিল্লী সুলতানির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন, সুলতানি শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ত প্রথার উপর নির্ভরশীল। (২) এই প্রকার শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্য দুর্বল হইলে সামন্তগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিত। বড় বড় জমিদার, অভিজাত ব্যক্তি, আমীর-ওমরাহ্, জায়গিরদার প্রভৃতি দিল্লী সুলতানি শাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। স্থানীয় এলাকায় তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অত্যধিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়া মাত্র তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও এইরূপ ব্যবহার করিতেন। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের রাজত্বকাল হইতেই এই দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। (৩) এই সকল কারণ ভিন্ন ক্রীতদাসের সংখ্যাধিক্য ও অকর্মণ্যতা এবং সরকারের উপর তাঁহাদের জন্য খরচের চাপ শাসনব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া উহা দুর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। সুলতানি আমলের প্রথম দিকে কুতব-উদ্দিন, ইলতুৎমিসের ন্যায় সুদক্ষ ক্রীতদাস শেষদিকে আর পাওয়া যায় নাই। (৪) সুলতানি আমলের শেষদিকে সুলতানদের অধিকাংশই যেমন ছিলেন শাসনকার্যে অক্ষম তেমনি নৈতিকতা-বর্জিত। তাঁহাদের পক্ষে সুলতানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। (৫) রাজকর্মচারীদের ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি, বিলাস-ব্যসন তাঁহাদের কর্মদক্ষতা লোপ করিয়াছিল। শাসনযন্ত্র স্বভাবতই অকর্মণ্য ও অচল হইয়া

দিল্লী সুলতানির পতন

পড়িয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা, উচ্ছৃংখলতা এবং রাজস্ব অপহরণের প্রবণতাও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণ হইয়াছিল। (৬) বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয়, অসংখ্য ক্রীতদাসের ভরণ-পোষণের ব্যয়, সৈনিকদিগকে জায়গির দান প্রভৃতি এবং কৃষকদের উপর অত্যধিক করভার সুলতানি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করিয়া সুলতানি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বাড়াইয়া দিয়াছিল। (৭) হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, তাহাদের সম্পত্তি বিনাশ, তাহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে অনুসরণ করিয়া দিল্লী সুলতানগণ ভারতবর্ষের জাতীয় সুলতানে পরিণত হইতে পারেন নাই। এই সংকীর্ণতার ফলে প্রজাবর্গ সুলতানদের প্রতি অকপট আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই এবং অকপট আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরূপ সাম্রাজ্য সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (৮) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও দুর্বলতা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে সেই সময়ে তৈমুর লঙ্ (খোঁড়া) কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়া ছিয়াছিল (১৩৯৮ খ্রীঃ)। (৯) ইহার পর লোদী বংশের শাসনকালে অভিজাতদের মধ্যে কলহ প্রশাসন বিভাগকে দুর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। এই অন্তর্কলহের সর্বনাশাত্মক ফল হিসাবে আলম খাঁ লোদী ও দৌলত খাঁ লোদী বিদেশী আমির মোগল বীর বাবরকে সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রে এক নূতন প্রভুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর জয়লাভ করিয়া দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

তৈমুর লঙ ও বাবরের আক্রমণ : দিল্লী সুলতানির অবসান

(খ) মোগল বা মুঘল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতনোন্মুখতা
(Rise, Growth and Decline of Mughal Power)

মোগলগণ : মোগল বা মুঘল কথাটি মোঙ্গল শব্দ হইতে উদ্ভূত। মধ্য-এশিয়ার বর্তমান মোঙ্গলিয়ায় মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ছিল। চিঙ্গিস খাঁ ছিলেন মোঙ্গল উপদলের নেতা। 'চিঙ্গিস' কথাটির অর্থ হইল 'অসাধারণ শক্তিশালী'। তিনি একবার খারিজমের শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। খারিজমের শাহ্ ভারতবর্ষে আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া গেলে চিঙ্গিস খাঁও ফিরিয়া যান। চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মধ্য-এশিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘ্তাইয়ের অধিকারে আসে। এই রাজ্যের পশ্চিম অংশে তাতারদের সংখ্যা বেশী থাকায় ঐ অঞ্চলের তাতার ও মোঙ্গল জাতির মধ্যে বিবাহাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে। এই মোঙ্গল-তাতার জাতি হইতে তৈমুর লঙের উদ্ভব ঘটে। তৈমুর ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মোঙ্গল নেতা যিনি দিল্লী পর্যন্ত

মোগলদের আদি পরিচয়

প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৈমুরের বংশধরই পরে দিল্লীতে মোঙ্গল বা মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবর: জহির-উদ্দিন মহম্মদ বাবর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতার দিক দিয়া তৈমুরের এবং মাতার দিক দিয়া চিঙ্গিসের তিনি বংশধর ছিলেন। এই দুই দুর্ধর্ষ বীরের রক্ত তাঁহার শিরায় প্রবাহিত ছিল; সুতরাং তিনি নিজেও একজন অসাধারণ বীর হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি? মোঙ্গল বংশের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে মোগল—অর্থাৎ মোঙ্গল নামেই পরিচয় দিতেন। এজন্য ভারতবর্ষে তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা মোগল বংশ নামে পরিচিত। মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে পিতা ওমর শেখকে হারাইলে, তুর্কিস্তানের ফরঘনা রাজ্যের শাসনভার তাঁহার উপর পড়িল। বালক বাবর সিংহাসনে আরোহণ করিলে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বাবর ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি। বাবর কথাটির অর্থ হইল 'সিংহ'। বস্তুত বাবর ছিলেন পুরুষসিংহ। তিনি শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, স্বার্থান্বেষীদের তিনি কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে দিলেন না। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ নিজ অধিকারে আনিয়া বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় উজবেগ সর্দার সাইবানী খাঁ সমরখন্দ দখল করিয়া লইলেন। ফরঘনা হইতেও বাবর বিতাড়িত হইলেন। ভাগ্যবিড়ম্বিতের ন্যায় তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় কাবুল রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে অতি অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া তিনি কাবুল দখল করিয়া লইলেন। কাবুলের আমীর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় লোদী বংশের আত্মকলহে যখন দিল্লীর সুলতানি রাজত্ব টলটলায়মান সেই সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার আশায় বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দুস্থান জয়ের সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর তখন ভুল ভাঙিল। বাবর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়া নিজে দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বাধ্য হইয়া বাবর নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৫২৬ খ্রীঃ) এক বিশাল

বাবর (১৫২৬-৩০)



বাবর

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

বাহিনী, কামান, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদী তাঁহাকে বাধা দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। বাবর কামান ও বন্দুকের সাহায্যে ইব্রাহিম লোদীর এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করিয়া ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের সূচনা করিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সুলতানি শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু মেবারের রাজপুত রাজ্য এবং বাংলা-বিহারের আফগান রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাবরের ভীতির সঞ্চার করিল। বাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে আফগানদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। হুমায়ুন কয়েক মাসের মধ্যেই এটক হইতে বিহারের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দকে বাবরের প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাবর স্বয়ং মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে 'রাণা সঙ্গ' খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন (১৫২৭ খ্রীঃ)। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাবর রক্ষা পাইলেন। তাঁহার দিল্লীর বাদশাহীও সুদৃঢ় হইল। ইহার পর চান্দেরী দুর্গ অধিকার করিয়া বাবর তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণ সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে বাবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে গোগ্রার যুদ্ধে বাবর তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ফলে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত বাবরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। অলপকালের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হইল (১৫৩০ খ্রীঃ)। বাবর অসামান্য কর্মশক্তি, অপরিসীম উদ্যম, ধৈর্য ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। সামরিক সংগঠন, তুর্কী ও ফারসী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি নিজ জীবনস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাস-সাহিত্যে ইহা একটি সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

গোগ্রার যুদ্ধ (১৫২৯)

হুমায়ুন: বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ্ হইলেন। বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন উহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার অবকাশ তিনি পান নাই; সুতরাং সেই দায়িত্ব পড়িল তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের উপর। বাবর মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুনকে নিজ ভ্রাতাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। হুমায়ুন পিতার শেষ নির্দেশ পালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দালকে মেওয়াট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্‌করীকে সম্বল নামক স্থানটি দিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কামরান সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি পাঞ্জাব, হিসারফিরোজা প্রভৃতি অঞ্চল বলপূর্বক দখল করিয়া লইলেন। হুমায়ুন

হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬)

ভ্রাতার এই বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক পাঞ্জাব ও হিসারের উপর তাঁহার অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের ঐক্য হুমায়ুন নিজেই বিনাশ করিলেন।


হুমায়ুন

আফগান দলপতিগণ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজপুতদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চিতোর অধিকার করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মনোযোগী হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন দৌরাহের যুদ্ধে আফগানদিগকে পরাজিত করিলেন বটে কিন্তু বিহারের আফগান বীর শের খাঁ সেই সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

শের শাহ্ শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তিনি ছিলেন সাসারামের জায়গিরদার হাসানের পুত্র। বিমাতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। এই দুই ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান জন্মায়।

শের শাহের পরিচয়

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ইহার পর কিছুকাল তিনি সাসারামে পিতার সহিত বাস করেন এবং পিতা সাসারামের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু বিমাতার ঈর্ষা তাঁহাকে পুনরায় গৃহত্যাগে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁহাকে সাসারামের জায়গির দান করেন। তারপর তিনি বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার কর্মদক্ষতা অল্প কালের মধ্যেই বহর খাঁর সন্তুষ্টি বিধান করিলে ফরিদ খাঁ-এর পদমর্যাদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বহর খাঁর অধীনে কার্য করিবার সময় তিনি একা একটি বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বাঘটি মারিয়াছিলেন। এজন্য বহর খাঁ তাঁহাকে 'শের'— অর্থাৎ 'বাঘ' উপাধি


শের শাহ্

দিয়াছিলেন। বিহারের অভিজাতবর্গের অনেকে শের খাঁর ভাগ্যোন্নতিতে ঈর্ষাকাতর হইয়া বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ফলে শের খাঁর চাকরি গেল, সাসারামের জায়গিরও বাজেয়াপ্ত হইল। ইহার পর কিছুকাল বাবরের অধীনে সৈনিকের চাকরি করিয়া তিনি বাবরের সন্তুষ্টিবিধান করিলে শের খাঁকে সাসারামের জায়গির ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এদিকে বহর খাঁ লোহানীর মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য শের খাঁকে আমন্ত্রণ জানান হইল। শের খাঁর উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় তিনি ক্রমেই বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মদক্ষতা সমরবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর তাঁহার প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিল। চুণার দুর্গের অধিপতি সেই সময়ে মারা গেলে শের খাঁ তাঁহার বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করিয়া চুণার দুর্গের অধিপতি হইলেন। শের খাঁর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া হুমায়ুন শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। শের খাঁ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য সময় লইবার উদ্দেশ্যেই তিনি করিয়াছিলেন।

জালাল খাঁ ইতিমধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। তিনি এবং শের খাঁর প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ অভিজাতবর্গ শের খাঁকে বিহারের শাসন অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে সুরজগড়ের যুদ্ধে শের খাঁ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নামে ও কাজে বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। শের খাঁর আকাঙ্ক্ষা এখন স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ফলে হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর সংঘর্ষ শুরু হইল।

সুরজগড়ের যুদ্ধ (১৫৩৪)

চুণার দুর্গ অবরোধ করিবার পর শের খাঁ কূটকৌশলে হুমায়ুনের বশ্যতা মুখেই স্বীকার করিয়া নিজ শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন শের খাঁর মৌখিক আনুগত্য স্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ ক্রমেই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন এমনকি হুমায়ুনের বিরুদ্ধবাদী আফগান দলপতিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া হুমায়ুনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। হুমায়ুন বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে সেই সুযোগে শের খাঁ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া কিউল হইতে সক্রিগলি পর্যন্ত স্থান দখল করিয়া লইলেন। ইহার পর অপর এক অভিযানে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ুন শের খাঁকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রথমেই তিনি কূটনৈতিক ভুল করিয়া বসিলেন। বাংলার শাসনকর্তার সহিত যুগ্মভাবে শের খাঁকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি প্রথমে চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিতে হইল। সেই সুযোগে শের খাঁ গৌড় অধিকার করিলেন। হুমায়ুন যখন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন শের খাঁ গৌড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হুমায়ুন গৌড় দখল করিয়া যখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত

শের খাঁ সেই সময়ে চুণার দুর্গটি পুনর্দখল করিয়া লইলেন এবং জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এইভাবে তিনি হুমায়ুনের দিল্লী ফিরিবার পথ নিজ অধিকারে লইয়া গেলেন। হুমায়ুন কালক্ষেপ না করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধের পর নিজেকে প্রকৃত রাজমর্যাদার অধিকারী মনে করিয়া শের খাঁ 'শাহ্' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিলেন। কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া হুমায়ুন আগ্রা ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫৪০ খ্রীঃ) হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহ্ তাঁহাকে পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শের শাহের অধিকারে চলিয়া গেল। পরাজিত হুমায়ুন ভ্রাতাদের কাহারও কাছে এই দুর্দিনে আশ্রয় পাইলেন না। অমরকোটের রাজার নিকট তিনি আশ্রয় পাইলেন। সেখানেই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রীঃ)। আকবরের মাতার নাম হামিদাবানু। কিছুকাল পর তিনি সপরিবারে পারস্যে চলিয়া যান।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯)

হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত

শের শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ্ হইয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি উহা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। গোয়ালিওর, মালব, রায়সিন দুর্গ জয় করিয়া মেবারের দিকে অগ্রসর হইলেন। মারবাড়রাজ রাণা মালদেবও শের শাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। চিতোর বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। বুন্দেলখণ্ডে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫ খ্রীঃ)। এইভাবে শের শাহ্ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায়ও শের শাহ্ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এক সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালেও এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছু অপরিবর্তিত ছিল। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি (ইহার মধ্যে বাংলাদেশে ১৭টি) 'সরকার' এবং প্রতি সরকারকে কতকগুলি 'পরগনায়' বিভক্ত করেন। তিনি নানা পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়া এবং কিছুকাল পর পর তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলির ব্যবস্থা করিয়া এক পক্ষপাতশূন্য সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্বব্যবস্থা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে জমি জরিপ করাইয়া মোট জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিলেন এবং জমির উর্বরতার ভিত্তিতে তিনি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করিয়া 'কবুলিয়ত' নামক দলিল গ্রহণ করিবার এবং সরকারেরও

শের শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ্

শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা

শের শাহের রাজস্ব-ব্যবস্থা

পক্ষ হইতে জমির উপর প্রজার স্বত্ব, জমির সীমা ও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া 'পাট্টা' নামক দলিল প্রজাকে দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায় যাহাতে নিয়মিতভাবে হইতে পারে সেজন্য শের শাহ্ আমিন, শিকদার, কানুনগো, পাটোয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবরের আমলে শের শাহের রাজস্বব্যবস্থার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামরিক সংস্কার

শের শাহের সামরিক সংস্কার বহুলাংশে আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক রীতি-নীতির অনুকরণ বলা যাইতে পারে। শের শাহ্ জায়গির প্রথা রহিত করিয়া সরাসরি সেনাবাহিনীকে মাসিক বেতনে নিজ অধীনে নিয়োগ করিবার প্রথা চালু করেন। সেনাবাহিনী কোন অবস্থায়, এমনকি যুদ্ধের সময়েও, কৃষিজমি বা কৃষকের ক্ষতিসাধন করিতে না পারে, তাহার জন্য শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। তিনি গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগের উন্নতিসাধন করিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

আইনের চক্ষে শের শাহ্ মুসলমান ও অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে জাতিভেদহীন সমতার আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করিবার নীতি চালু করেন। ফৌজদারী আইন সেই সময় অত্যন্ত কঠোর ছিল। বাদশাহের আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগেও কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আমিন-কাজী ও মুনসেফ্-ই-মুনসেফান বিচারকার্যাদি পরিচালনা করিতেন। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন সম্রাট্ স্বয়ং।

বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (সড়ক-ই-আজম) শের শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করাইয়া হিন্দু ও মুসলমান পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য পথপার্শ্বে নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর ধর্মশালা ও মুসাফিরখানা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ছায়াবৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন।

ঘোড়ার পিঠে করিয়া ডাক এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা শের শাহ্-ই প্রথম প্রচলন করিয়া ছলেন। শের শাহ্ পূর্ববর্তী মুদ্রার প্রচলননীতি সংশোধন করিয়া সরকারী মুদ্রার মূল্যমান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

জাতীয় সম্রাট্

শের শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ ছিল এই যে, উহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ক্ষমতানুযায়ী কর্মচারিপদে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হইত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করিতেন না; হিন্দুপ্রধান ভারতের জাতীয় বাদশাহ্ বা সম্রাট্ হইতে হইলে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা মূর্খতা হইবে একথা শের শাহের ন্যায় দূরদর্শী বাদশাহ্-ই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আকবরের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য শের শাহ্ উল্লেখযোগ্য অবসর পান নাই সত্য, কিন্তু তিনি ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে জনৈক হিন্দু বাঙালীকে তাঁহার অন্যতম সেনানায়ক পদে নিয়োগ করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রথার প্রথম সূচনা করেন। তাঁহারই

পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবি মালিক মহম্মদ জয়সী মেবারের রাণী পদ্মিনীর উপাখ্যান অবলম্বনে 'পদ্মাবত' কাব্য হিন্দীতে রচনা করেন (১৫৪০ খ্রীঃ)।

শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতার জন্য শের শাহ্ প্রতিষ্ঠিত আফগান বাদশাহী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। শের শাহের পরবর্তী বাদশাহদের অক্ষমতা ও আত্মকলহ হুমায়ুনকে তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ দান করিল। শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের সাহায্য লইয়া ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা দখল করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে হুমায়ুন পারস্য সম্রাট্কে কান্দাহার অঞ্চলটি দিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পর নিজ গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হুমায়ুন কর্তৃক মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সম্রাট্ আকবর। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র আকবর মাত্র তের বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বৈরাম খাঁ নামক হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধুর চতুরতায় হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে আকবরের সিংহাসনলাভে কোন অসুবিধা ঘটে নাই।

আকবরের সিংহাসন লাভ। ১৫৫৬ খ্রীঃ।

হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং দক্ষিণ-ভারতে খান্দেশ, বেরার, আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য নিজ নিজ স্বাধীন সুলতানের অধীনে ছিল। আফগান অভিজাতগণও ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশে তখনও স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছিল। এদিকে পোর্তুগীজ বণিকগণও গোয়া, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং বৈরাম খাঁ ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে শূরবংশীয় অর্থাৎ শের শাহের বংশের আফগানদের জনৈক বংশধর মহম্মদ আদিল শাহ্ ছিলেন খুব শক্তিশালী। তিনি আফগান প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার হিন্দু সেনাপতি হিমুকে দিল্লী ও আগ্রা দখল করিতে প্রেরণ করেন। হিমু এই দুই স্থান দখল করিয়া নিজে 'বিক্রমজিৎ' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব শুরু করেন। এদিকে বৈরাম খাঁ আকবরকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাঞ্জাব

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ)


মহামতি আকবর

হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পাণিপথের প্রান্তরে হিমুর সহিত আকবরের যুদ্ধ হয়। হিমু পরাজিত হইলে, আকবর দিল্লীতে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই যুদ্ধ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

ইহার পর আকবর কিছুকাল বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। বৈরাম খাঁ আফগান দলপতি মহম্মদ আদিল শাহকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অপরাপর আফগান নেতাও আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। আকবর বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন তিন বৎসরের মধ্যে আজমীর, গোয়ালিওর ও জৌনপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁর নিকট হইতে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আরও দুই বৎসর আকবরকে তাঁহার ধাত্রীমাতা মহম্ অনগা ও তাঁহার পুত্র আদম খাঁর প্রভাবাধীনে থাকিতে হইল। ঐ সময়ে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আদম খাঁ ও পীর মহম্মদের নেতৃত্বে মালব রাজ্য আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই প্রভাব কাটাইয়া সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে অসিরগড় দুর্গ জয় করা পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া আকবর সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিলেন। তিনি কৌটিল্যের সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুরূপ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। "রাজ্য মাত্রেই প্রতিবেশী রাজ্য জয় করা প্রয়োজন নতুবা প্রতিবেশী রাজ্য কর্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইবার আশংকা থাকিবে"—এই কথা তিনি মনে করিতেন।

রাজ্য জয়

সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি :

খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের (১৫২৭) পরও রাজপুত শক্তি সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয় নাই। আকবর এই শক্তিশালী রাজপুতদিগকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য তাহাদের সৌহার্দ্য অর্জন করিতে চাহিলেন। ইহার পশ্চাতে সাম্রাজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তা, রাজপুতানার মধ্য দিয়াই উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্ভব ছিল। এই সকল কারণে আকবর রাজপুত জাতির প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল্ল পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ-সহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, এবং আকবরের সহিত নিজ কন্যা মানবাঈ-এর বিবাহ দিলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খাঁকে গণ্ডোয়ানা রাজ্য জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। সাম্রাজ্য বিস্তার-ই ছিল এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

রাজপুতদের সৌহার্দ্য লাভের চেষ্টা

গণ্ডোয়ানার নাবালক রাজা বীরনারায়ণের অভিভাবিকা রাণীমাতা যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন, বীরনারায়ণ বীরের মতই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। গণ্ডোয়ানার অধিকাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অবশিষ্টাংশ গণ্ডোয়ানার রাজপরিবারের এক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করিলে

গণ্ডোয়ানা জয়

সংগ্রাম সিংহের দুর্বলচেতা পুত্র উদয় সিংহ পলাইয়া গিয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। তিনি অবশ্য বিহারীমল্লের ন্যায় আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই, মোগলদের সহিত বিবাহসূত্রেও আবদ্ধ হন নাই। তিনি পলাইয়া গেলেও জয়মল্ল ও পত্ত নামে দুই রাজপুত বীর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন রাজপুত রমণীগণ 'জোহর ব্রত' পালন করিলেন - অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মোগল হস্তে বন্দী হইবার অপমান এড়াইয়া গেলেন। চিতোর মোগল অধিকারভুক্ত হইল। চিতোরের পতন হইলে (১৫৬৯) কালিঞ্জর, রণথম্ভোর, বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্য একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল। চিতোর মেবারের হস্তচ্যুত হইলে উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ উহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপ মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। তাঁহার কাজ যে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি তখন নিজ রাজধানী হইতে বিতাড়িত, স্বজাতি এমনকি, নিজ ভ্রাতার সাহায্য হইতে বঞ্চিত। অথচ প্রতিপক্ষ কেবল ভারতের সর্বাধিক বিত্তশালী ও শক্তিশালী সম্রাট্ই ছিলেন না, তিনি রাণা প্রতাপের স্বজাতির সাহায্যপুষ্ট দুর্ধর্ষ শত্রু ছিলেন। কিন্তু এইসব কোনকিছুই রাণা প্রতাপকে তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

রাণা প্রতাপ

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্ধর্ষ রাজপুত বীর মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহ এবং সহকারী সেনাপতি আসফ খাঁর বিরুদ্ধে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলেন। এইভাবে আকবর রাণা প্রতাপকে পরাজিত করিলেন সত্য, কিন্তু প্রতাপের স্বাধীনতাস্পৃহাকে জয় করিতে পারিলেন না। রাণা প্রতাপের দুর্গগুলি একে একে আকবরের অধিকারে আসিলে রাণা প্রতাপ পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার হীন চেষ্টা তিনি কল্পনায়ও আনিলেন না। অনিদ্রা, অনাহার--সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি মেবার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা চালাইলেন। তাঁহার চরম অর্থাভাবে তাঁহারই অনুগত মন্ত্রী ভামশা তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সকল অর্থ রাণা প্রতাপের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং দেশ উদ্ধারের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। নূতন উৎসাহ লইয়া রাণা প্রতাপ মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত মেবার রাজ্যের বহু স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। অবশ্য তাঁহার

হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীঃ)

রাণা প্রতাপের দেশপ্রেম



রাণা প্রতাপ (১৫৪০-৯৭ খ্রীঃ)

জীবনে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাণা প্রতাপ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অমরসিংহ মোগলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। মানসিংহ মোগল বাহিনী লইয়া মেবার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পর আকবরের জীবদ্দশায় মেবার আক্রমণের চেষ্টা আর করা হয় নাই।

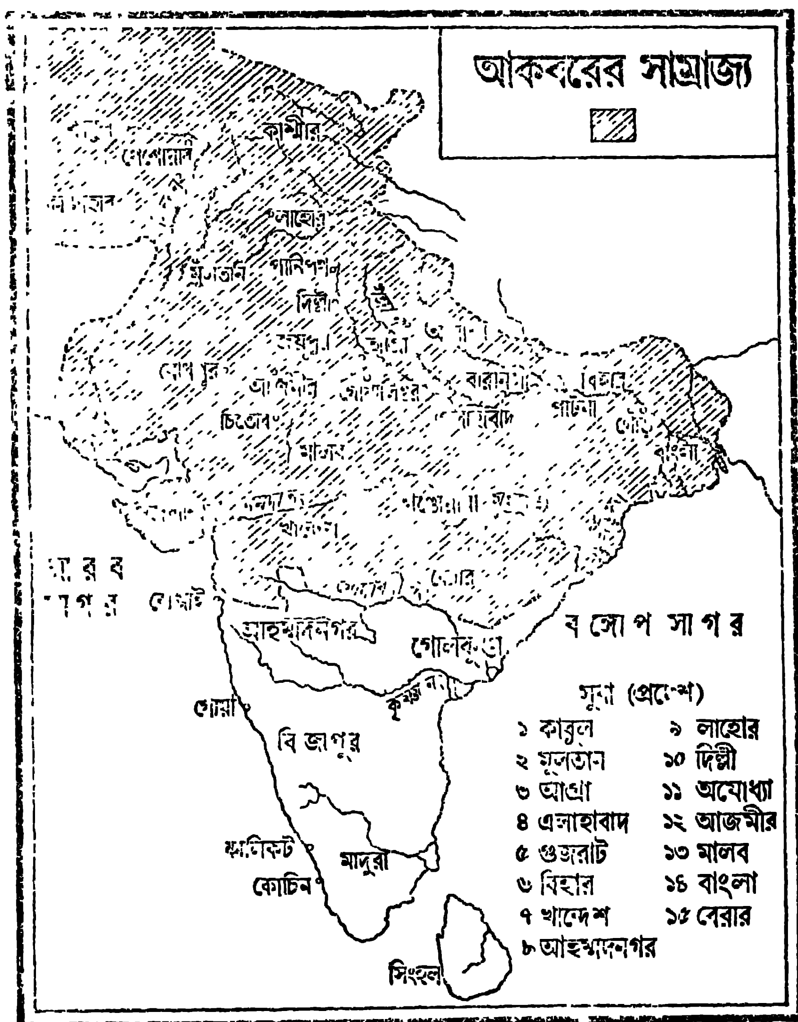
গুজরাট, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও সুরাট জয়

আকবরের রাজ্যবিস্তার রাণা প্রতাপের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি গুজরাট, সুরাট, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। গুজরাট উপকূলের সমৃদ্ধ বাণিজ্য বন্দরগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া আকবর গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন। আকবর স্বয়ং এই যুদ্ধে তৃতীয় মজফ্ফর শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া গুজরাট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। গুজরাটের পর আকবর বাংলাদেশ জয় করিতে অগ্রসর হইলে বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তা সুলেমান কর্‌রাণী আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। সুলেমান কেবল বাংলারই শাসক ছিলেন না, তিনি উড়িষ্যাও তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুলেমানের পর তাঁহার পুত্র দাউদ কর্‌রাণী আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করিলে আকবর দাউদকে পাটনা ও হাজিপুর হইতে বিতাড়িত করেন। মনিম খাঁ ও টোডরমলের সেনাপতিত্বে মোগল সৈন্য মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি জয় করিলে দাউদ কর্‌রাণী উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি মোগল হস্তে পরাজিত হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে রাজমহলের সন্নিকটে মোগল বাহিনী তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ফলে বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহার আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুরাট অধিকারের ফলে পোর্তুগীজদের সহিত আকবরের সৌহার্দ্য জন্মায়। ফলে পোর্তুগীজগণ ভারতের মুসলমানগণের নৌপথে মক্কা যাওয়া-আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আকবর কাবুল, সিন্ধু, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যের আহ্‌ম্মদনগর, খান্দেশও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আহ্‌ম্মদনগরের নাবালক সুলতানের পিতৃস্বসা (পিসি) চাঁদবিবি আহ্‌ম্মদনগর রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মোগল পক্ষকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে বেরার মোগলদের নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইয়াছিল, আর আহ্‌ম্মদনগর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই চুক্তি পরবর্তীকালে চাঁদবিবির সতর্কবাণী সত্ত্বেও লঙ্ঘন করা হইলে মোগল সৈন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগরের একাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করে। খান্দেশের সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ মোগল বশ্যতা অস্বীকার করিলে আকবর খান্দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু খান্দেশের রাজধানী বুর্‌হানপুর দখল করিতে পারিলেও শ্রেষ্ঠ ও সুরক্ষিত অসীরগড়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্য জয়

দাক্ষিণাত্য জয়

দুর্গটি জয় করা সম্ভব হইল না। আকবর খান্দেশের রাজকর্মচারীদিগকে ঘুষ দিয়া অসীরগড় দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও মর্যাদাকে কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। অসীরগড় দুর্গ জয়ই আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বশেষ পদক্ষেপ (১৬০১ খ্রীঃ)।



'মহামতি' আকবর : একমাত্র শের শাহ্ ভিন্ন আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতান-বাদশাহ্‌গণ ধর্ম বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। কেহই রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া দেখিবার মত মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। ফলে তাঁহাদের রাজনীতি ধর্মমত দ্বারা আচ্ছন্ন হইত। ভারত সম্রাটের পক্ষে কেবল

মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ করিলেই চলিবে না, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতের প্রকৃত জাতীয় সম্রাট্ হইতে পারা যাইবে এই সত্য আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে একমাত্র শের শাহ্ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আকবরের এই উদারতার পশ্চাতে তাঁহার মাতা হামিদাবানু ও শিক্ষক আব্দুল লতিফের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ফৈজী, আবুল ফজ্‌ল, শেখ মুবারক প্রভৃতির প্রভাবে আসিয়া ধর্ম সম্পর্কে আকবরের অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম জানিয়া আকবর সর্বধর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের এক উদার ধর্মমতে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি 'দিন্-ইলাহি' (=দিব্য বিশ্বাস) নামে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্মমতের সূক্ষ্ম নীতি জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই।

আকবরের ধর্মমত : হিন্দু, রাজপুত প্রভৃতির প্রতি তাঁহার নীতি

আকবর বলপূর্বক তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক, বলা বাহুল্য। হিন্দুদের প্রতি উদারতা, রাজপুতদের প্রতি উদারতা—এমনকি রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আকবর তাঁহাদিগকে এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও রাজপুতগণ তাঁহার শাসনব্যবস্থায় সেই নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। উদার মনোবৃত্তির সহিত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটিলে যে-সুফল পাওয়া যায়, আকবরের সংস্কার কার্যাদিতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। তাঁহার সংস্কারগুলি যেমন ছিল তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক তেমনি ছিল প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক। অ-মুসলমানদের উপর হইতে তিনি জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজার সমান অধিকার—এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

তাঁহার সংস্কার কার্যাদি

প্রায় দুই কোটি টাকা রাজস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুসৈন্যকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রচলিত রীতি তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ করা, অপরিণত বয়সে বিবাহ না করা, বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি ছিল তাঁহার সংস্কার কার্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ, বিদ্বান্ মনীষীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক ছিল। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত, সংস্কৃত-সাহিত্য, ইতিহাস-সাহিত্য, কাব্য সবকিছুরই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তানসেন ও বাজবাহাদুর ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, আবুল ফজ্‌ল ছিলেন ঐতিহাসিক এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী এক মনীষী। তাঁহার 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' আকবরের আমলের ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। আবুল ফজ্‌ল-এর ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি। বদাউনি ও নিজাম-উদ্দিন আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে দুইখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। বীরবল ছিলেন আকবরের অপর একজন স্বনামধন্য সভাকবি। আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, অনন্যসাধারণ প্রতিভা,

সম্রাট্‌সুলভ মর্যাদা, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের জন্য আকবর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাগণের অন্যতম বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার "মহামতি" আখ্যা সার্থক।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব : আকবর তথা আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আকবর তাঁহার চরিত্রের মাধুর্যে, প্রজার মঙ্গলসাধনের ঐকান্তিকতায়, সর্বোপরি তাঁহার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোকের প্রতি সমদৃষ্টি দ্বারা নিজেকে ভারতীয় সম্রাট্‌দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে নিজেকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নহে, পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌দের তিনি অন্যতম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সাহসী সৈনিক, প্রতিভাবান সেনাপতি, সফল রাজ্য-বিজেতা, প্রজারঞ্জক শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক হিসাবে আকবর নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌দের অন্যতম

বিজেতা হিসাবে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তাঁহার সামরিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। শাসক হিসাবে আকবর ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাঁহার সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে প্রদেশ বা সুবায় ভাগ করিয়া বা বিভিন্ন-পর্যায়ের কর্মচারী নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, শাসন ব্যাপারে ক্ষুদ্রতম বিষয়ের উপরও তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। আকবর ছিলেন এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে স্থায়ী, সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন ছিল হিন্দু-মুসলমান তথা বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোকের আন্তরিক আনুগত্য। এই কারণে তিনি হিন্দু তথা রাজপুতদের প্রতি এক উদার নীতি অনুসরণ করিয়া নিজেকে কোন বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় সম্রাটের আসনে নিজেকে আসীন করিয়াছিলেন। পরধর্মসহিষ্ণুতা 'সুলহ্-ই-কুল' ছিল তাঁহার ধর্ম-নীতির মূল সূত্র। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ। প্রশাসনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। এমনকি, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সকল মনীষী সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার শাসনকালের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাঁহাদের যে একুশজনের নাম আবুল ফজ্‌ল দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। আকবরের ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ শাসন সমগ্র ভারতবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিল। আকবর বিশাল পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর এবং তীর্থকর রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি সকল প্রজাকে সমমর্যাদায় স্থাপন করিয়া প্রকৃত জাতীয় সম্রাটের কর্তব্য

শ্রেষ্ঠ বিজেতা —শ্রেষ্ঠতর প্রশাসক

হিন্দু তথা রাজপুতদের প্রতি উদার নীতি

পরধর্মসহিষ্ণুতা

সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার কার্যাদি সেই যুগে তাঁহার মানসিক অগ্রসরতার পরিচয় বহন করে। তিনি ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে 'অভ্রান্ত ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallible Decree) দ্বারা নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 'দিন-ইলাহী' নামে এক একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রবর্তন করেন। অবশ্য ইহার সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় এই ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই।

তাঁহার সংস্কার কার্যাদি

বলপূর্বক সতীদাহের রীতি তিনি নিষিদ্ধ করেন। আকবর যুদ্ধবন্দীদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রচলিত প্রথা রহিত করেন। আকবর ধর্মের ভিত্তিতে প্রজাবর্গের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করিয়া, নিজে হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়া এবং নিজ পুত্রকে হিন্দু রমণী বিবাহ করাইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণের পথ প্রদর্শন

আকবর তাঁহার সম্রাট্সুলভ দায়িত্বজ্ঞান ও মর্যাদাবোধ, সামরিক ও প্রশাসনিক কৃতিত্ব, প্রজাহিতৈষণা, সর্বোপরি তাঁহার মানবতা ও উদার মনোবৃত্তির জন্য ভারত-ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছেন। এই কারণেই তাঁহাকে 'মহামতি' (Great) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হিসাবে খ্যাতি অর্জন

জাহাঙ্গীর : আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫) পর মানবাঈ-এর পুত্র সেলিম 'নূর-উদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত রাণা প্রতাপের পুত্র মেবারের রাণা অমর সিংহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীর অমর সিংহকে চিতোর ফিরাইয়া দিয়া এবং অমর সিংহের পুত্র করণ সিংহকে পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। অমর সিংহ ও করণ সিংহের মর্মর মূর্তি নির্মাণ করাইয়া জাহাঙ্গীর আগ্রার মোগল উদ্যানে স্থাপন করিয়া রাজপুতদের প্রতি তাঁহার পিতার অনসৃত উদার-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মেবার বিজয়

আকবরের আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে জমিদারগণ মোগল আধিপত্য অস্বীকার করিয়া চলিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে ইস্লাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশের উপর মোগল আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন।

বাংলা জয়

মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কান্দাহার সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া মোগল সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য উভয়ের নিকটই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যুবরাজ খুস্রু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে সেই সুযোগে পারস্য সম্রাট্ শাহ্ আব্বাস একবার কান্দাহার আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীরের প্রতি মিত্রতাসূচক ব্যবহার করিয়া কান্দাহার আক্রমণের বিষয়কে মিটাইয়া লইলেন। কিন্তু তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে কান্দাহার দখল

করিলেন। যুবরাজ খুর্‌রমকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া খুর্‌রম এই আদেশের পশ্চাতে নূরজাহানের চক্রান্ত রহিয়াছে মনে করিয়া সেই আদেশ পালন করিলেন না। উপরন্তু, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কান্দাহার জয় করা সম্ভব হইল না।

আকবর আহ্‌মদনগরের একাংশের বশ্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালিক অম্বর নামক মন্ত্রীর পরিচালনায় অপরাংশ স্বাধীন রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে মালিক অম্বর সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বাবধি মোগল বাহিনী দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। জাহাঙ্গীরের আমলের একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য ছিল শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত দুর্ভেদ্য কাংড়া বা নগরকোট নামক দুর্গটি জয়। এই দুর্গ ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তজা খাঁকে কাংড়া জয়ের জন্য প্রেরণ করিলে সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তারপর জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুর্‌রমকে (শাহ্‌জাহান) কাংড়া জয়ের ভার দিলে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর যুঝিয়া তিনি কাংড়া মোগল অধিকারে আনিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কামরূপ অর্থাৎ পশ্চিমে আসাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

আহ্‌মদনগর জয়ের চেষ্টা



নূর-উদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ

কাংড়া বিজয়

জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থায় তাঁহার প্রধানা মহিষী নূরজাহান (প্রকৃত নাম মেহরুউন্নিসা, মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা এবং আলিকুলি বেগের বিধবা মহিষী) অপরিসীম ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর একাধারে অমায়িক, স্নেহশীল, উদারচেতা এবং নৃশংস ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু ছিলেন। পিতার ন্যায় ধর্ম সম্পর্কে উদারতা তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তিনি অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ন্যায় বিচার, শিল্পের, বিশেষভাবে চিত্রশিল্পের, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মদ্যাসক্তি ও অহিফেন সেবন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহার মহিষী নূরজাহান (=জগতের আলো) শাসনব্যবস্থার উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে শাহ্‌জাহান ও মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের অদূরদর্শিতা

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৮ খ্রীঃ) ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্ উইলিয়াম হকিন্‌সকে দূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দৌত্যের

উদ্দেশ্য ছিল জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ইংরেজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। কিন্তু পোর্তুগীজদের বাধাদানের ফলে এই দৌত্য ব্যর্থ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেমস্ পুনরায় টমাস রো-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এইবার বহু চেষ্টায় টমাস রো জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ইংরেজ বণিকদের জন্য বিনা শুল্কে ভারতে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য করিবার অধিকার আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমস্ এর নিকট হইতে হকিন্স ও টমাস রো-র দৌত্য

শাহ্জাহান : জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহ্জাহান (শাহ্জাদা খুররম) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন নূরজাহান শাহ্জাহানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্রিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপন করিলে আসফ্ খাঁ শাহ্রিযারকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন এবং শাহ্জাহানকে দ্রুত দিল্লী পৌঁছিবার জন্য জানাইলেন। শাহ্জাহান দিল্লী পৌঁছিয়া ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শাহ্জাহান প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহী রাজা যুঝর সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী সুবাদার খান্ জাহানকে দমন করিলেন। পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে লুঠতরাজ, জলদস্যুতা, দেশীয় প্রজাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় প্রভৃতি ঔদ্ধত্য-পূর্ণ কাজ চালাইতেছিল। শাহ্জাহানের পত্নী মমতাজ বেগমের জন্য প্রেরিত দুইজন পরিচারিকাকে তাহারা ধরিয়া লইয়া যায়। শাহ্জাহান পোর্তুগীজদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাসেম আলিকে জানাইলে তিনি হুগলী আক্রমণ করিয়া পোর্তুগীজদিগকে উচিত শিক্ষা দিলেন। ইহার পর পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে আর ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় নাই।

শাহ্জাহান (১৬২৮-৫৮ খ্রীঃ)



শাহ্জাহান=দুনিয়ার শাসনকর্তা

সম্রাট্ আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য জয়ের নীতি নানা কারণে সাফল্যমণ্ডিত হয়। আহ্মদনগরের স্বাধীনচেতা মন্ত্রী মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ পিতার মৃত্যুর পর আহ্মদনগরের মন্ত্রী হন, কিন্তু তাঁহার না ছিল পিতার ন্যায় স্বাধীন মনোবৃত্তি, না ছিল শাসনদক্ষতা। তিনি আহ্মদনগরের সুলতান নিজাম-উল্-মুলক্-কে বন্দী করিয়া রাখিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মাতিয়া রহিলেন। তিনি গোপনে মোগল সম্রাট্ শাহ্জাহানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া

দাক্ষিণাত্য জয়

শাহ্‌জাহানেরই ইঙ্গিতে নিজাম উল্-মুলক্-কে হত্যা করাইয়া তাঁহার নাবালক পুত্র হুসেন শাহ্‌কে সিংহাসনে বসাইলেন। প্রথমে মোগল সম্রাটের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করিলেও অল্পকালের মধ্যে তিনি মোগল-বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত এক বিশাল পরিমাণ অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দৌলতাবাদ দুর্গটি মোগলদের হস্তে তুলিয়া দিলেন। ফলে আহ্‌মদাবাদের সুলতানির অবসান ঘটিল (১৬৩৩ খ্রীঃ)। হুসেন শাহ্ গোয়ালিওর দুর্গে অবশিষ্ট জীবন বন্দী হিসাবে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে নিজামশাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটিল।

আহ্‌মদনগর জয়

বিজাপুর জয়ের পশ্চাতে জাহাঙ্গীরের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণুতার নীতিই প্রবল ছিল। এই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহ্‌জী নিজামশাহী বংশের এক নাবালককে আহ্‌মদাবাদের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলে বিজাপুরের সুলতান ও গোলকুণ্ডার সুলতান সেই নাবালকের পক্ষ গ্রহণ করেন। শাহ্‌জাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান পরাজয় নিশ্চিত ভাবিয়া শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। বিজাপুর সুলতান এইভাবে আত্মসমর্পণ কাপুরুষতা মনে করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু বিশাল মোগল বাহিনী বিজাপুরের এক বিরাট অংশ শ্মশানে পরিণত করিয়া অসংখ্য নারী-পুরুষকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ্‌কে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। বিজাপুর সুলতানকে প্রতি বৎসর মোগল সম্রাটের নিকট বশ্যতার প্রমাণ-স্বরূপ উপঢৌকন প্রেরণ করিতে হইবে স্থির হইল। আহ্‌মদনগর রাজ্যটি বিজাপুর ও মোগল সম্রাটের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ, বেরার, তেলেঙ্গানা ও দৌলতাবাদ ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা প্রতিশ্রুত কর না দেওয়ায় ঔরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলে সুলতান কুতবশাহ্ পুনরায় মোগল বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়

শাহ্‌জাহান মধ্য-এশিয়াস্থিত কান্দাহার জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ দান করিয়া কান্দাহারের শাসনকর্তাকে সাময়িকভাবে বশ করিতে সমর্থ হইলেও পারস্যের রাজা উহা অল্পকালের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান শেষ পর্যন্ত কান্দাহার জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দাক্ষিণাত্য নীতি

শাহ্‌জাহান যেমন ছিলেন জাঁকজমকপ্রিয় সম্রাট, তেমনি ছিলেন সর্বাধিক বিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরির বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে আসামের সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলা এবং আফগান অঞ্চলের বিস্ত দুর্গ হইতে দাক্ষিণাত্যের আউসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার শাসনব্যবস্থা আকবরের

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে কোন বিদেশী আক্রমণ হয় নাই। ঔরংজেবের বিদ্রোহের পূর্বাবধি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও কোন বিদ্রোহ বা গোলযোগ হয় নাই। ইতালীয় পর্যটক মানুচি শাহ্‌জাহানকে ব্যভিচারী ও বিলাসপ্রিয় কিন্তু সুদক্ষ শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর স্মিথ এই মত অগ্রাহ্য করিয়া শাহ্‌জাহানকে স্বৈরাচারী এবং নিষ্ঠুর বিচারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ্, এলফিনস্টোন প্রভৃতি অবশ্য ডক্টর স্মিথের সহিত একমত নহেন। যাহা হউক, শাহ্‌জাহানের চরিত্র ও শাসন-দক্ষতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ আছে। কিন্তু সন্তান-বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেমের দিক্ হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর আখ্যা দেওয়া সমীচীন হইবে না।

শাসনদক্ষতা সম্পর্কে মতানৈক্য

তেভার্ণিয়ে, বার্ণিয়ে, মানুচি প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক শাহ্‌জাহানের দরবারের আড়ম্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার আমলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্য উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল, মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া তিনি তাঁহার শিল্প ও স্থাপত্য অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত শিশমহল, খাসমহল, মুসম্মান বুরুজ প্রভৃতিও তাঁহার স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন বহন করে।

শাহ্‌জাহানের স্থাপত্য অনুরাগ

শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে নির্মিত তাজমহল তাঁহার পত্নীপ্রেমের এক অমর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। তাঁহার আদেশে নির্মিত ময়ূর সিংহাসনটিও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত এই অপূর্ব সিংহাসনটি ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠনকালে নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা

শাহ্‌জাহানের জীবদ্দশায়ই তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইয়াছিল। তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি ছিলেন উদারচেতা, সুশিক্ষিত এবং শাসনকার্যে সুদক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন অলস, আরামপ্রিয় ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত। তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং অত্যন্ত কূটকৌশলী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন মদ্যপায়ী, বিবেচনা-বুদ্ধিহীন। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্রগণ দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দারা অবশ্য দিল্লীতে থাকিতেন। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ ও মুলতানের শাসনকর্তা। ঔরংজেব মুরাদকে সাম্রাজ্যের অংশ দিবেন এই আশা দিয়া নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। সুজা দিল্লীর পথে বারাণসীর নিকট সম্রাটের বাহিনীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ঔরংজেব ও মুরাদের যুগ্মবাহিনী ধর্মাট নামক স্থানে এক যুদ্ধে মোগল সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত করিল। ইহার পর দারা ঔরংজেব ও মুরাদকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ

সামুগড়ের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে ঔরংজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিলেন (১৬৫৮ খ্রীঃ) এবং বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিলেন। এইভাবে স্বার্থসিদ্ধির পর তিনি মুরাদকেও বন্দী করিলেন। বন্দী অবস্থায় কয়েক বৎসর পর ঔরংজেব তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। এদিকে সুজা ঔরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া খাজোয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯ খ্রীঃ) পরাজিত হইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন। পলাতক অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। দারাশিকো ঔরংজেবের বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করিতে গিয়া দেওরাইয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। এইভাবে দারা, সুজা ও মুরাদের মৃত্যু ঘটিলে ঔরংজেবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান ৮ বৎসর বন্দী অবস্থায় নানাপ্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে মরিয়া বাঁচিলেন।

ঔরংজেব : ধর্মাট, সামুগড়, খাজোয়া ও দেওরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং

ঔরংজেব 'আলমগীর' (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ)

একে একে সকল ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া ও বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিয়া ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'আলমগীর' অর্থাৎ পৃথিবী-বিজয়ী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

ঔরংজেবের চরিত্রে নানাপ্রকার দোষ ও গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন পরধর্ম-অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও সংকীর্ণমনা।

চরিত্র

সমরকুশল সেনাপতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কূটকৌশলী হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন উল্লেখযোগ্য তেমনি নৃশংসতা, স্বার্থলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ত্রুটির জন্য তিনি ছিলেন নিন্দার্হ।



ঔরংজেব 'আলমগীর'

ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অহোম জাতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মোগল সাম্রাজ্যের সীমার অভ্যন্তরে আসিয়া হানা দেয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্য বিস্তার

আরাকানে মগ জাতি, উত্তরবঙ্গে কোচ জাতি অনুরূপ উপদ্রব শুরু করে। ঔরংজেব মীরজুম্‌লাকে উপদ্রবকারীদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মীরজুম্‌লা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও স্থায়ীভাবে তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। ইহার পর ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার সুবাদার তখন তিনি মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাঁটি সন্দ্বীপ নামক দ্বীপটি অধিকার করেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ আফগান উপদলগুলির আক্রমণ ভারতবর্ষের সুলতানি ও মোগল শাসনের এক কঠিন নিরাপত্তা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঔরংজেবের শাসনকালে আফগান উপদলগুলি মহম্মদ শাহ্ নামে এক ব্যক্তিকে তাহাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে এবং ক্রমে সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া হাজারা জেলা দখল করে। স্থানীয় কৃষকদের উপর নানা অত্যাচার করিয়া তাহারা অর্থ আদায় করিতে থাকে। ঔরংজেব তিনজন সেনাপতিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান উপদলগুলির দৌরাত্ম্য বন্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সকল সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইয়া এবং বহু সংখ্যক আফগান প্রাণ হারাইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে আক্রমণ করা বন্ধ করিল। ঔরংজেব যশোবন্ত সিংহকে জামরুদের সামরিক ঘাঁটির অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭২ খ্রীঃ) আফ্রিদি জাতি মোগলদের উপর আক্রমণ শুরু করিলে রাজা যশোবন্ত সিংহ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইলেন, বহু মোগল সৈন্য শত্রু হস্তে ধরা পড়িল। তারপর পেশওয়ার, বান্নু ও কোহাট জেলায় খতক উপজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কিন্তু মোগল সৈন্য বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইল। খতক জাতি মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া কিছুকাল পরই তাহারা অপরাপর উপজাতির সহিত সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ঔরংজেব স্বয়ং উপজাতি দমনে অগ্রসর হইয়া (১৬৭৪ খ্রীঃ) আফগান উপদলীয় নেতাদিগকে ভাতা, জায়গির প্রভৃতি দিয়া বশ করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে সম্পূর্ণভাবে আফগান সমস্যার সমাধান না হইলেও মোটামুটি শান্তি ফিরিয়া আসিল। কাবুলে নব-নিযুক্ত শাসক আমীর খাঁ তাঁহার উদার ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে আফগান উপজাতিকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

আফগান উপদলগুলির আনুগত্য লাভ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শান্তি স্থাপন

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ঔরংজেবের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল—যথা, যুদ্ধের ব্যয়, ভাতা দান, জায়গির দিবার ফলে রাজস্ব হ্রাস—সবকিছু রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তদুপরি পুনঃ পুনঃ শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদিগকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণের ফলে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী নিজ শক্তি বৃদ্ধির এবং রাজপুতগণ শক্তিসঞ্চয় করিয়া মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির কুফল

দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করিবার ইচ্ছা ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন সেই সময় হইতে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর হিন্দু রাজ্য দুইটিও তিনি অধিকার করেন। এইভাবে ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের সীমা দাক্ষিণাত্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

দাক্ষিণাত্য নীতি

দাক্ষিণাত্যে ঔরংজেবের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শত্রু ছিলেন মারাঠা বীর শিবাজী। শিবাজীকে শিবাজীর জীবদ্দশায় পরাজিত করা ঔরংজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। [এ-বিষয়ে আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য (১৬২-১৬৭ পৃষ্ঠা)।]

রাজপুত নীতি : সম্রাট্ ঔরংজেব আকবরের রাজপুত নীতির দূরদর্শিতা উপলব্ধি করিবার মত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন না। দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতির বন্ধুত্বের মূল্য বুঝিবার এবং মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণে রাজপুত জাতির অবদান বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তিনি যশোবন্ত সিংহ জামরুদে সামরিক ঘাঁটির সেনাধিপতি থাকা কালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া মাত্র তাঁহার রাজ্য মাড়বার অধিকার করিবার জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ঔরংজেব যশোবন্তের এক আত্মীয়কে যোধপুরের (মাড়বারের) সিংহাসনে বসাইয়া, সেখানকার অধিবাসীদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিলেন এবং দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করাইলেন। যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের পক্ষে রাজপুত বীর দুর্গাদাস মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ঔরংজেব স্বয়ং মাড়বার দখল করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আজমীর হইতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত বাহিনী পরাজিত হইলে যুবরাজ আকবরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন।

রাজপুত নীতি

মাড়বার

ঔরংজেব মাড়বার রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক-এক অংশে এক-এক জন মোগল ফৌজদার নিয়োগ করিলেন। নাবালক রাণা অজিত সিংহের মাতা মেবারের রাণা রাজসিংহের সাহায্য চাহিলেন। রাজসিংহ ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কারণ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব তাঁহাকে মেবারের অধিবাসীদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজসিংহ মাড়বারের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঔরংজেব সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া উদয়পুর ও চিতোর, অর্থাৎ মাড়বার ও মেবারের কেন্দ্রস্থল দখল করিয়া লইলেন। দুই শতেরও অধিক দেবমন্দির মোগল বাহিনীর হস্তে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ইহাতেও রাজপুত জাতিকে দমন করা গেল না। যুবরাজ আকবর বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য দিতে লাগিল। কিন্তু এই মিত্রতা ঔরংজেবের কূটকৌশলে দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শেষ পর্যন্ত ঔরংজেব মেবার হইতে জিজিয়া করের পরিবর্তে তিনটি জেলা গ্রহণ করিয়া মেবারের রাণাকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। মাড়বারের অজিত সিংহের পক্ষে দুর্গাদাস তখনও যুদ্ধ করিয়া চলিলেন এবং ঔরংজেবের মৃত্যুর পর পরবর্তী মোগল সম্রাট্ অজিত সিংহের দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে ঔরংজেবের রাজপুত নীতি মোগল সাম্রাজ্যের এক স্তম্ভ এবং মিত্রশক্তিকে শত্রুতে পরিণত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

মেবার

রাজপুত নীতির কুফল

ঔরংজেবের ধর্মনীতি : প্রতিক্রিয়া : ঔরংজেব নিজে একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন যেমন ইস্‌লাম ধর্মনীতি দ্বারা

প্রভাবিত ছিল, তেমনি তিনি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণভাবে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিয়াছিলেন। তিনি কোরানের নীতি অনুসরণ করিয়া মোগল দরবারের পূর্বেকার বহু অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গীত, নওরোজ, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ-মুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপন করেন। তাঁহার অত্যধিক ধর্মপ্রবণতা প্রশাসনের উপর যখন প্রভাব বিস্তার করিল তখন ধর্ম-বিষয়ে তিনি এক সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন জাতি-ধর্মের নর-নারী অধ্যুষিত হিন্দুস্তানে সম্রাট্-পদে আসীন থাকিবার একমাত্র শর্ত-ই যে সম-ব্যবহার ও ধর্মসহিষ্ণুতা, এইকথা ঔরংজেব স্মরণ রাখেন নাই। ইহা তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কেবল হিন্দুদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল এমন নহে, শিখ, শিয়া, খোজা ও বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের মুসলমানগণও তাঁহার এই অসহিষ্ণু নীতির ফল ভোগ করিয়াছিল।

ধর্মান্ধতা

পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সম্রাটের মর্যাদা প্রভৃতির দিক্ হইতে বিচার করিলে ঔরংজেবের দক্ষতার পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু নীতি, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, শিখ, মারাঠা, রাজপুত জাতির প্রতি তাঁহার অদূরদর্শী নীতি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামী বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির বিরোধিতা আকবরের উদার-নীতির ফলে গঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। ঔরংজেব ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্ম দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে দিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের দমন করিতে গিয়া কালক্ষেপ যেমন মারাঠা ও রাজপুত জাতিকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়াছিল তেমনি দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় এবং মারাঠাদের সহিত যুঝিতে গিয়া কালক্ষেপের ফলে উত্তর-ভারত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ঔরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঔরংজেবের অনুদার সন্দিগ্ধ মন অপরের সততায় বিশ্বাস করিতে পারিত না। ফলে তাঁহাকে নিজেই সবকিছুর উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত। কিন্তু অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামরিক দায়িত্বসংক্রান্ত সবকিছু সুদক্ষভাবে পরিচালনা তাঁহার পক্ষে কেন, কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আকবরের উদার পরধর্ম-সহিষ্ণু নীতি এবং প্রজাবর্গের প্রতি সমব্যবহার যেমন তাঁহাকে ভারতবর্ষের জাতীয় সম্রাটে পরিণত করিয়াছিল তেমনি ঔরংজেবের ধর্মান্ধ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ

ঔরংজেবের সংকীর্ণতা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তির দুর্বলতার কারণ

নীতি তাঁহাকে সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সম্রাটে রূপান্তরিত করিয়াছিল। হিন্দু, রাজপুত—এক কথায় অ-মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও অখণ্ড আনুগত্যে যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ঔরংজেবের অনুদার নীতি অ-মুসলমানদের বিদ্রোহী করিয়া এমনকি, সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান ভিন্ন অপরাপর মুসলমানের বিরাগ উৎপাদন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

ঔরংজেবের কৃতিত্ব-বিচার : মোগল সাম্রাজ্য পতনে তাঁহার দায়িত্ব : মোগল সম্রাট্‌দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে ঔরংজেবের দাবি অস্বীকার করিবার যুক্তি নাই। তাঁহার চরিত্রের অত্যধিক জটিলতা ঐতিহাসিকদিগকে যেমন বিভ্রান্ত করিয়াছে, তেমনি তাঁহার দোষ-গুণ, কৃতিত্ব সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার বহুলাংশে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানের প্রতি তাঁহার নির্মম আচরণ, নিজ সহোদরদের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরতা সবকিছু ঔরংজেবের চরিত্র বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকদের অভিমত বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে ঔরংজেবকে সমরকুশলী সেনাপতি, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক এবং ক্ষমতাবান শাসক হিসাবে প্রশংসা করিতে হইবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সাহস না হারাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে তাঁহার সমকক্ষ খুব কম সম্রাট্‌ই ছিলেন। শাসনকার্যের খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। তাঁহার সাম্রাজ্য-লিপ্সা যেমন ছিল অন্তহীন, তেমনি প্রশাসনিক কার্যদক্ষতাও ছিল অতুলনীয়। ইতালীয় পর্যটক গেমেলি কেরি ঔরংজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ঔরংজেবকে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রাদি নিজে পাঠ করিয়া সেগুলির উপর যথাযথ আদেশ লিখিয়া দিতে দেখিয়াছিলেন।

জটিল চরিত্র

কৃতিত্বের নিরপেক্ষ বিচার কঠিন

চরিত্রের গুণাবলী

ঔরংজেব তাঁহার শাসনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-নির্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সদাসন্দিগ্ধ মন কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, ফলে প্রশাসনের সকলপ্রকার কাজ নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিবার আগ্রহ শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিতে পারে নাই।

ব্যক্তি-নির্ভর শাসন

ইহা সত্য যে, ইস্‌লাম ধর্ম সম্পর্কে ঔরংজেবের গভীর জ্ঞান ছিল, ফারসী সাহিত্য, আরবী আইন-কানুন তাঁহার জানা ছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফতোয়াৎ-ই-আলমগিরি' নামক আইন সংকলন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ধর্ম-জ্ঞান ও ধর্ম-নীতি তাঁহার অন্তরে উদারতার স্থলে ধর্মীয় সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতি অনুসরণ করিয়া ঔরংজেব আকবরের আমলে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোক-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে উদার, পরধর্ম-সহিষ্ণু, সম-ব্যবহার নীতির উপর ভিত্তি করিয়া যে-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহার ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অ-মুসলমানদের উপর

মোগল সাম্রাজ্য পতনে ঔরংজেবের দায়িত্ব

জিজিয়া কর স্থাপন করিয়া, হিন্দুদের মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া, এমনকি, শিয়া, খোজা ও বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ এবং অদূরদর্শী ধর্ম-নীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গের আনুগত্য বিনাশ করিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে দেখা দিয়াছিল। জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী বিদ্রোহ তাঁহার ধর্মান্ধ নীতিরই ফলশ্রুতি। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিও আংশিকভাবে তাঁহার শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্রকে ঔরংজেব মোগল হারেমে লালন-পালনের শর্তে তাঁহার দাবি স্বীকার করিতে রাজী হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রেও মাড়বারের মোগল-বিরোধিতা ঔরংজেবের ধর্ম-নীতিরই ফল ছিল, বলা যাইতে পারে। শিখ গুরু তেগ বাহাদুর ঔরংজেবের হিন্দু-বিরোধী নীতির প্রতিবাদ করিলে এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদিগকে সেই সকল নীতির বিরোধিতা করিতে উপদেশ দিলে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হয় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ নতুবা মৃত্যুবরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তেগ বাহাদুর ঔরংজেবের এই দুই-এর মধ্যে মৃত্যুই বরণ করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের এই অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপই তেগ বাহাদুরের পুত্র দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ জাতিকে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

ধর্মান্ধ নীতির ফলশ্রুতি

সুতরাং ঔরংজেবের ধর্মান্ধ নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নানা গুণ সমন্বিত হইয়াও ঔরংজেব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। স্পর্ধিত মোগল সাম্রাজ্যের ততোধিক স্পর্ধিত সম্রাট্‌ ঔরংজেব আলমগীর বাদশাহ্‌ গাজী ভগ্ন হৃদয় ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (১৭০৭ খ্রীঃ)।

ব্যর্থতা

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Fall of the Mughal Empire) : স্পর্ধিত মোগল সাম্রাজ্য যাহা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক কারণেই সেই বিশালায়তন মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিধৃত হইয়া রহিল। পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই, হইতে পারে না। যুগধর্মের পরিবর্তন, শাসক সম্প্রদায়ের শাসনক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের তারতম্য, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরায়ণতা, স্ব স্ব প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা সবকিছু মিলিয়া যে অবক্ষয়ের সূচনা করে তাহার ফলেই আসে পতনোন্মুখতা ও অবশেষে পতন। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

সাম্রাজ্যের পতন প্রাকৃতিক কারণেই অবশ্যম্ভাবী

ঔরংজেবের শাসনকালের শেষার্ধে যে-পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে পতনে পর্যবসিত হয়। প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন যদি শাসনকার্যের সাফল্য ও সার্থকতার মাপকাঠি হয় তাহা হইলে একথা

স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই যে একমাত্র আকবর ভিন্ন অপরাপর মোগল বাদশাহ্‌দের শাসনকালের সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর।* সম্রাট্ আকবরের অনুসৃত উদার, পরধর্ম-সহিষ্ণু, সর্বজনকল্যাণকামী শাসনের আদর্শ পরবর্তী মোগল সম্রাট্‌দের আমলে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইস্‌লামধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে শরিয়ৎ আইন প্রয়োগের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে "বিধর্মী" ও "ইস্‌লামধর্ম-বিশ্বাসী" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

আকবরের পরবর্তীকালে উদার জনকল্যাণকামী, পরধর্ম-সহিষ্ণু নীতি পরিত্যাগের কুফল

মোগল সম্রাট্‌দের শাসনক্ষমতা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সম্রাটের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সমরকুশলতা, শাসনদক্ষতা প্রভৃতি গুণ থাকিলেই তাঁহার শাসন সুষ্ঠুভাবে চলিত। কিন্তু এই সকল গুণের অভাব সম্রাটের মধ্যে দেখা দিলে সাম্রাজ্য ও শাসন উভয়ই বিপন্ন হইয়া পড়িত। ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাট্‌দের আমলে তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রথম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১২ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-৫৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত—অর্থাৎ সর্বশেষ মোগল সম্রাট্ পর্যন্ত সকলেই ছিলেন যেমন সম্রাটোচিত ব্যক্তিত্বহীন, তেমনি শাসনকার্যে দক্ষতাহীন। ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধ বা প্রায়-বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এরূপ বয়সে শাসনকার্য পরিচালনার উৎসাহ, উদ্যম বা শক্তি স্বভাবতই তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মোগল দরবারের ইরাণী (শিয়া মুসলমান) ও তুরাণী (সুন্নী মুসলমান) এই দুই পরস্পর প্রতিযোগী ও বিদ্বেষী ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইল। অপরদিকে এই দুই দলের এক বিরোধী দল নিজাম-উল্-মুল্‌কের নেতৃত্বে গঠিত হইল। ইহার নাম হইল 'হিন্দুস্তানী' দল। ইহা ভিন্ন, সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের শাসনকর্তারাও প্রায় স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এইভাবে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা দরবারের অভিজাতবর্গ ও বিভিন্নাংশের শাসনকর্তাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। বিহারের সুবাদার সৈয়দ হুসেন আলি ও এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আব্দুল্লা মোগল সম্রাট্‌গণকে হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের কুফল

ক্ষমতাবান উত্তরাধিকারীর অভাব

অভিজাতবর্গের প্রতিযোগী দলসমূহ

বিভিন্নাংশের শাসকদের স্ব স্ব প্রাধান্যের প্রচেষ্টা

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে ইহার শাসনদক্ষতা ও কেন্দ্রীয় শাসনের শাসনযন্ত্রের উপর প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা সেই যুগে সহজ ছিল না, বিভিন্নাংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলাও ছিল অত্যন্ত কঠিন। এইভাবে সাম্রাজ্যের বিশালতাই পরোক্ষভাবে উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিশালতা পতনের পরোক্ষ কারণ

* *Hindusthan Standard* Article by Sir Jadunath Sarkar (Puja Annual, 1951).

এইভাবে যখন সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সুবাদারগণ এবং বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিল। এই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের সম্রাট্ নাদির শাহ্ এবং আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী বা দুর্‌রানী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিলেন। নাদির শাহ্ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালী ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শুধু নামেই টিকিয়া রহিল, সাম্রাজ্য বা সম্রাট্‌সুলভ ক্ষমতা আর তখন ছিল না।

বাহিরের আক্রমণ

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, ঔরংজেবের সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, শিখ জাতির মোগল শক্তির বিরোধিতা, আকবরের পরবর্তী সম্রাট্‌দের জাতীয়তাবোধের অভাব, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা, ঔরংজেবের ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতি, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান সবকিছু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ঔরংজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের যে পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা রোধ করা তাঁহার দুর্বল বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মাত্রেরই প্রধান ত্রুটি ছিল। তাঁহাদের দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগে মোগল সেনাবাহিনী এক উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল বলিয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এমতাবস্থায় বহিরাগত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। এই সকল আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

ঔরংজেবের দায়িত্ব : মোগল সাম্রাজ্যের পতন

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্‌লামের প্রভাব

(Impact of Islam on Indian Society and Culture)

ইস্‌লামীয় সভ্যতার প্রভাব (Impact of Islam) : মুসলমানদের আগমনের পূর্বাবধি যে-সকল বৈদেশিক জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন মুসলমান সভ্যতার

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রূপ ছিল। মুসলমানগণ এ-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আক্রমণের কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল নিষ্ঠুরতা এবং ভারতীয় সমাজের উপর যে ধরনের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ভারতীয় সভ্যতা ও ইস্‌লামীয় সভ্যতার সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। সুলতান রাষ্ট্রের যেমন প্রধান ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধর্মেরও প্রধান। একমাত্র কোরানের বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্য কিছু সুলতানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। ইস্‌লাম ধর্মের সবচেয়ে বড় গুরু ছিলেন বাগদাদের খলিফা। সেজন্যই ইলতুৎমিস্‌ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষের কোন কোন সুলতান খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানদের নিকট অ-মুসলমানগণ হইলেন 'জিম্মি' আর ভারতীয়দের নিকট মুসলমানগণ হইলেন 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ'। ফলে এই দুই সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইল। ইস্‌লাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধও চালু হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু ধর্মের ও সমাজের রক্ষণশীলতা বহু গুণে বাড়ানো হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন শিরোমণি এবং বিজয়নগরের মাধবাচার্য ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত। মুসলমান সমাজে জাতিভেদ ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন আমীর-ওমরাহ্‌, রাজকর্মচারী প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণী। কৃষক ও শ্রমিকরা ছিল সমাজের দরিদ্র শ্রেণী। পর্দাপ্রথার প্রচলন, স্ত্রীজাতির অধিকার হ্রাসের ফলে তাঁদের ঘরের কাজেই আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা তখন চালু ছিল। উপরি-উক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পথে প্রথমদিকে কঠোর বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইস্‌লামীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সংঘাত

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি : রঘুনন্দন, মাধবাচার্য

সুলতানী আমলে (Under the Sultanate)

(i) দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে ইস্‌লামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দু তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমান মনীষী অল্‌বিরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উপনিষদ্‌ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইস্‌লাম ধর্মের একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য ক্রমে মুসলমান সমাজকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলেও হিন্দু সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া সুলতানদের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবার ফলে মুসলমান সমাজের আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দু সমাজে স্থানলাভ করিতে লাগিল। এইভাবে হিন্দু ও

পরস্পর প্রভাব বিস্তার

মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সৌহার্দ্য জন্মিতে লাগিল। এই পরস্পর প্রীতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশে সত্যপীরের পুজার উদ্ভব ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর উদ্ভব ঘটিল। ইঁহারা প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই ধারণা প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বা ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথমাত্র, একথাই এই সকল ধর্মজ্ঞানী বলিতেন। নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। যবন হরিদাস ছিলেন প্রথমে একজন মুসলমান। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই সমন্বয়ের চেষ্টা সুলতানি আমলের শেষভাগে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা সুলতানদের চেষ্টা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা

ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা

সুলতানি আমলে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন ছিল। দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্বই ছিল ইহার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ কোন কালেই দিল্লীর পুরাপুরি শাসন তথা অধীনতা স্বীকার করে নাই। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক বাংলাদেশে যাহাতে বিদ্রোহ না হয় উহার উপায় হিসাবে বাংলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনজন শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল লক্ষণাবতী (গৌড়), সোনারগাঁও (সুবর্ণগ্রাম) এবং সপ্তগ্রাম (ত্রিবেণী)। তবু তিন শাসনকর্তার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই রহিল। শেষ পর্যন্ত হাজী ইলিয়াস শামসুউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ (১৪৯০-৯৩ খ্রীঃ) নাম ধারণ করিয়া সমগ্র বাংলাদেশকে নিজ দখলে এনে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করিয়া বাংলার সীমা অনেকটা বিস্তৃত করেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান কীর্তি ছিল বাংলার স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য জয় করা। সেই সময় হইতেই বাংলাদেশে শিল্প ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি শুরু হয়।

বাংলাদেশ

হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। হুসেন শাহ্ ছিলেন পরধর্ম-সহিষ্ণু সুলতান। তাঁহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সমাজের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে 'বাংলার আকবর' বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ্ এমনকি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নামও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা আরবী ও ফারসী ভাষায় তখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা

বাংলাদেশ ভিন্ন কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিন হুসেন শাহের ন্যায় উদারচেতা সুলতান ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষী। তাঁহার পিতার রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জৈনুল আবিদিন

তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে ঘৃণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংস্কৃত এবং কাশ্মীরী গ্রন্থের আরবী ও ফারসী অনুবাদ করাইয়া নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেরূপ বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য জৈনুল আবিদিন 'কাশ্মীরের আকবর' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের জৈনুল আবিদিন

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারায় প্রকাশলাভ করিয়াছিল। "সত্যপীর"-এর উপাসনার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম চিন্তার লৌকিক প্রকাশ দেখা যায়। ইহা ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইস্‌লামের সুফীবাদে মানুষকে মানুষ হিসাবে এবং সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখিবার নীতি প্রচার করিয়াছিল। এই সমন্বয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মহাপুরুষগণ উপলব্ধি করিলেন তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নূতন ভাব। ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা, মানুষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সবকিছুকে ভালবাসিবার ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল। সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় ধর্মমতই ভগবানের সহিত মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতা প্রচার করিয়াছিল। সুফী ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া, মইন-উদ্দিন চিস্‌তি প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। নিজাম-উদ্দিন এবং মইন-উদ্দিন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ

বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতান বংশের ইয়ুসুফ্ আদিল শাহ্ এবং দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের (হিন্দু প্রজাগণ কর্তৃক 'জগদ্‌গুরু' নামে সম্মানিত) আমলে বিজাপুরে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেডোস্ টেলর (Meadows Taylor) নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের সুলতানদের উদারতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

আদিল শাহী বংশের উদারতা

ধর্ম-সংস্কারকগণ (Religious Reformers). দাক্ষিণাত্যে চতুর্দশ শতকে রামানন্দ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাম-সীতার উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তিনি ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন রামানুজের শিষ্য। গুরু রামানুজের নিকট হইতে তিনি ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন। মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বিখ্যাত মুসলমান ধর্মজ্ঞানী কবীর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ সমগ্র উত্তর-ভারতে তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও রহিম এক এবং অভিন্ন একথা তিনি বলিতেন।

রামানন্দ

বল্লভাচার্য দক্ষিণ-ভারতের এক তেলেগু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান বারাণসীতে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুকাল বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় তিনি রাজপণ্ডিত হিসাবে

* Vide *An Advanced History of India*, p. 358 (3rd Ed., 1967)

কাটান। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। ইহা ভক্তিবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র। বিজয়নগর সম্রাটের রাজসভা ত্যাগ করিয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া বারাণসী ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহার ধর্মের মূলকথা।

বল্লভাচার্য

মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ভক্তিবাদের প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে দরজী। ঘটা করিয়া পূজাপার্বণ বা মূর্তি পূজার তিনি সমর্থন করিতেন না। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার ধর্মপথের নির্দেশ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নামদেব

কবীরের জন্মপরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে আসলে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহা হউক, পরে তিনি ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন একজন তন্তুবায়। প্রাপ্ত বয়সে তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ্‌ বা রহিম এক এবং অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাত্র।

কবীর

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন সামান্য ব্যবসায়ীর পুত্র। প্রথম জীবন হইতেই ধর্মকর্মে তাঁহার গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হয়। হিন্দু ধর্মের উদার মানবতাবাদ ও মুসলমান ধর্মের জাতিভেদ-হীন সমতার আদর্শ নানককে প্রভাবিত করে। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাইবার পর তিনি ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ব্যবসায় করিতে গিয়া বহুবার তিনি নিজের অর্থ গরীব-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মসাধনা শুরু করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি একবার মক্কায়ও গিয়াছিলেন। নানক কোন জাতিভেদ মানিতেন না। সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে ধর্মের প্রচার করেন উহা 'শিখ' ধর্ম নামে পরিচিত। 'শিখ' কথাটির অর্থ হইল 'শিষ্য'। নানক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন।

নানক

নানকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতার নাম ছিল শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আদর করিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গ, নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হইত। চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কাটোয়া-নিবাসী কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম দিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন, দক্ষিণ-ভারত পর্যটন করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া, সকল মানুষকে সমানভাবে দেখা প্রভৃতি ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। তিনি জাতিভেদ

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের বাণী

মানিতেন না। মুসলমানদের মধ্য হইতেও তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন। ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীর নীলাচলে তিনি দেহরক্ষা করেন।

মীরাবাঈ

রাঠোর-দুহিতা কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবান প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভের সহধর্মিণী। ব্রজভাষায় গানের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। তাঁহার অসংখ্য কৃষ্ণপ্রেম গান কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ব্যাপক প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও সৃষ্টি করিয়াছিল।

সর্বধর্ম সমন্বয়

নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ সেই যুগে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙিয়া দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Art) : সুলতানি আমলে আরবী, ফারসী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থ, জীবন-স্মৃতি প্রভৃতিও রচিত হইয়াছিল।

আরবী ও ফারসী সাহিত্য

ফারসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খসরু। জিয়া-উদ্দিন বরণী ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক পরবর্তীকালে সুলতানি আমলে অনুসৃত হইয়াছিল। মিনহাজ-উস্-সিরাজও সে-যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদেশী পর্যটক ইবন্-বতুতার বর্ণনায় তুঘলক আমলের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

হিন্দী সাহিত্য

হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাঁদ বরদৈ, রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের ভক্তি ও প্রেম সম্পর্কে ব্রজভাষায় বহু গীত সেই যুগে রচিত হইয়াছিল। ফারসী ও হিন্দী ভাষা ভিন্ন হিন্দী ও ফারসীর সংমিশ্রণে উর্দু ভাষারও উদ্ভব সে-যুগেই ঘটিয়াছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

সুলতানি আমলে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার সর্বাধিক উন্নতি ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ্ ও তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ্ এবং তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ—পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এ-বিষয়ে খুবই সহায়ক হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র প্রভৃতি তখন তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মালিক মহম্মদ জয়সীর পদ্মাবত কাব্য (১৫৪০ খ্রীঃ) প্রভৃতিও ঐ যুগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্, নুসরৎ শাহ্, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি সুলতান ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী।

বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি

তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সে-যুগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

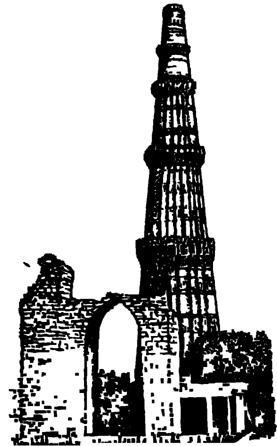
পাঞ্জাবী ভাষা, মারাঠী সাহিত্য প্রভৃতিরও সে-যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকার আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার আদেশে আরবী ও ফরাসী গ্রন্থাদির হিন্দী অনুবাদ এবং হিন্দী ও কাশ্মীরী গ্রন্থাদির আরবী ও ফারসী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

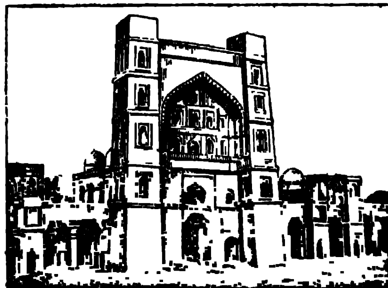
পাঞ্জাবী, মারাঠী, কাশ্মীরী ভাষা ও সাহিত্য

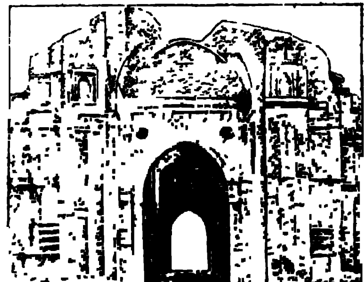
শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানি যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির সুফল সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পেও প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দু ও ইস্‌লামীয় স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সে-যুগে দেখা গিয়াছিল। 'কুতবমিনার', 'আলাই দরওয়াজা', 'জমাঅৎখানা মসজিদ', 'ফিরুজ শাহের সমাধি-সৌধ' প্রভৃতি দিল্লীর স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দিল্লী ভিন্ন জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত স্থাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ করিয়াছিল। জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতিতে হিন্দু-স্থাপত্য রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট রহিয়াছে। জৌনপুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দু মঠ, মন্দির প্রভৃতির সামান্য

শিল্প : হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ (Indo-Saracenic art)

দিল্লী


কুতবমিনার (দিল্লী)


অতাল মসজিদ (জৌনপুর)


দাখিল দরওয়াজা (গৌ

পরিবর্তনসাধন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল। স্বভাবতই এগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজিও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে পাথরের অভাবে ইটের ব্যবহার দেখা যায় এবং বহিরঙ্গে পোড়ামাটির (টেরাকোটা) ফলক সাজান আছে। অন্যান্য স্থানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল, তাঁতিপাড়া মসজিদ প্রভৃতি এখনও সে-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে।

জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়া

সমাজ ও অর্থনীতি (Society and Economy): সুলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিয়া-উদ্দিন বরণী, মিনহাজ-উস্-সিরাজ, 'হিন্দুস্থানের (ভারতের) তোতাপাখী' আমীর খসরু প্রভৃতি রচয়িতার রচনা হইতে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিদেশী ভ্রমণকারী—যথা, ইবন্-বতুতা, মাহুয়ান, নিকোলো কণ্টি, এথেনিসিয়াস নিকিতিন, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতির বিবরণে সে-যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের বর্ণনা

সুলতানি আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মালিক ও আমীর-ওমরাহ্‌দের। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে সাধারণ রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও বণিকদের বুঝাইত। ইহাদের নিম্ন স্তরে ছিল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। মালিক এবং আমীর-ওমরাহ্‌গণ সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। দেশের সর্বাধিক পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলত তাঁহাদের হস্তে ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই অভিজাত শ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ ছিল। ধনদৌলত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ কয়েকটি বণিক পরিবারেও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সকল দোষত্রুটি হইতে মুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকার নানাভাবে সংকুচিত হইয়াছিল। পর্দাপ্রথার প্রবর্তন, পরিবারের বাহিরে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করা প্রভৃতি তখনকার হিন্দু সমাজেও চালু হইয়াছিল। সেই যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

সুলতান, অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমজীবী

নারী জাতির অধিকার সঙ্কুচিত

কৃষি ও শ্রম শিল্প ছিল সে-যুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেও বহু লোক জীবিকার্জন করিত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলেই তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনদৌলত দেশে সঞ্চিত

হইয়াছিল। অবশ্য এই ধনদৌলতের অতি সামান্য অংশই যাহারা প্রকৃত উৎপাদনকারী তাহাদের হাতে থাকিত। অত্যধিক করভার, উচ্চহারে রাজস্ব, নানাপ্রকার অবৈধ কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। আমীর খস্‌রু বলিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষকদের রক্ত-বিগলিত অশ্রু যেন জমাট বাঁধিয়া সুলতানের মুকুটের মণিমুক্তায় পরিণত হইয়াছে—অর্থাৎ গরীবদের শোষণ করিয়াই সুলতান এবং অভিজাত শ্রেণীর অর্থ ও ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইয়াছিল।

কৃষি

শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চিনি, জুতা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। রেশম ও পশম বস্ত্রাদির উৎপাদনও যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশ ও গুজরাট সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশী পর্যটকগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার বস্ত্র, নীল আফিং প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বিদেশ হইতে ঘোড়া, ক্রীতদাস, খচ্চর এবং নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী আমদানি করা হইত। সেইসময়ে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। বিদেশী পর্যটক ইব্‌ন্‌-বতুতা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই এত সস্তায় জিনিসপত্র তিনি দেখিতে পান নাই।

শিল্প

হিন্দু প্রজাদের উপর সে-যুগে নানাপ্রকার অবিচার করা হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর, তীর্থ কর প্রভৃতি দিতে হইত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। আলা-উদ্দিনের আমলে হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল; সেই কথা আব্দুর্‌রজ্জাক, নিকোলো কণ্টি, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

হিন্দুদের অবস্থা

মোগল আমলে (Under the Mughals)

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবন (Social and Religious Life) : মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই যুগের ইতিহাস-গ্রন্থাদি ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। মোগল যুগে ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্‌, উইলিয়াম হকিন্স্‌, টমাস রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভার্ণিয়ে, বার্ণিয়ে, মানুচি, মনসেরেট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিদেশী পর্যটকের বিবরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

ইওরোপীয় পর্যটকগণ

সুলতানি আমলের ন্যায়ই মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন বাদশাহ্‌ অবশ্য এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। বাদশাহ্‌ ও অভিজাত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরনের

বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায়

এবং বহুসংখ্যক। সম্রাট্ আকবরের জন্য বৎসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা হইত। বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে অভিজাত শ্রেণী-সুলভ বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ। তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যধিক করভার চাপানো হইত। এজন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সাদাসিধা ধরনের জীবন যাপন করিয়া দারিদ্র্যের ভান করিত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মুদি প্রভৃতি সাধারণ দোকানদার সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। ইহাদের খাওয়াপরার কোন অভাব না থাকিলেও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সাধারণ শ্রেণী

মোগল আমলেও হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও নীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। সম্রাট্ আকবরের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রীতির নিদর্শন তৎকালীন সাহিত্যে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি সুলতানি আমল হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। উহা মোগল যুগেও অপরিবর্তিত ছিল। মুসলমান কবি আলাওল 'পদ্মাবতে'র বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্মানুষ্ঠানেও পরস্পর সৌহার্দ্য ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট্ আকবর তাঁহার হিন্দু পত্নীদিগকে হিন্দু দেব-দেবীর অর্চনা করিতে দিতেন। হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। অনুরূপ মুসলমানগণও হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন। হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিও কোন কোন মুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সেরূপ হিন্দুগণও মুসলমান পীর-পয়গম্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি
পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

মোগল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ঔরংজেবও সতীদাহ বন্ধের জন্য ফরমান জারি করিয়াছিলেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিত।

কুসংস্কার

ইওরোপীয় পর্যটকগণ : ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হকিন্স্ ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র-সহ ভারতবর্ষে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় দিল্লীর বাদশাহের বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ৫০ কোটি টাকা ছিল।

উইলিয়াম হকিন্স্

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ টমাস রো ব্রিটিশরাজ প্রথম জেমসের সনদ লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়া তিন বৎসর (১৬১৫-১৯ খ্রীঃ) এদেশে ছিলেন। টমাস রো-র বিবরণ

হইতে জানা যায়, জাহাঙ্গীর প্রতিদিন তিনবার দরবার করিতেন, সপ্তাহে একদিন বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন এবং বিবাদ-বিসংবাদের কথা শুনিয়া বাদশাহ্ অপরাধীকে শাস্তি দান করিতেন। তৎকালীন মুসলমান শাসকগণ ইংরেজ ও ইওরোপের অন্যান্য বণিকের নিকট হইতে অত্যধিক কর আদায় করিতেন। মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি, রাজস্ব ও উপঢৌকন হইতে সম্রাটের প্রচুর আয় হইত।

সার্ টমাস রো

ডাচ বণিক ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচারে এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উৎপীড়নে কৃষকরা অতি দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করিত। বাংলাদেশ তখন তুলা ও রেশম চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

পেলসার্ট

মোগল যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ফরাসী মণিমুক্তা ব্যবসায়ী তেভার্ণিয়ের বিবরণে পাওয়া যায়। তিনি সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সামাজিক দিক দিয়া মোগল যুগে তিনটি প্রধান শ্রেণী ছিল। বাদশাহ্ ও আমীর-ওমরাহ্‌গণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত; মধ্যবিত্ত অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কাজকর্ম করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করিত তাহারা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; এবং কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ দোকানদার (মুদি) প্রভৃতি ছিল তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। করভার দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রধানত বহন করিতে হইত এবং তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও কলুষমুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর খাওয়া-পরার অভাব না থাকিলেও তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। মোঘল নৌ-বাহিনীর অপ্রতুলতার জন্য বাংলাদেশে পোর্তুগীজ বণিক ও মগ জলদস্যুরা নানাভাবে অত্যাচার করিত।

তেভার্ণিয়ে

বার্ণিয়ে ছিলেন একজন ফরাসী চিকিৎসক। তিনি ১৬৫৬-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি ঔরংজেবের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বার্ণিয়ের বর্ণনা হইতে বাংলাদেশের বিবিধ জলপথ, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের কথা জানা যায়। বাংলার চাউল ও চিনি তখন বিভিন্নাঞ্চলের অভাব পূরণ করিত। বাংলাদেশের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া কেহ কোথায়ও যাইতে চাহিত না।

বার্ণিয়ে

ইতালীয় পর্যটক মানুচি সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসক হিসাবে এ-দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উৎপীড়ন এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন।

মানুচি

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition): ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। মোগল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। খাদ্যশস্য ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হইত। বারিপাতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হেতু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কৃষি ভিন্ন নানাপ্রকার শিল্প হইতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা অর্জিত হইত। শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সুতী-

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

বস্ত্র, রেশম, বস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পোশাকী কাপড়, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও প্রস্তুত হইত। এই সকল সামগ্রী ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইত। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের সুতী বস্ত্র, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রহিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ছিল খুবই অল্প। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে জিনিসপত্র কিরূপ সস্তা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায়। একটি গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। একটি ছাগল তখন এক টাকায় পাওয়া যাইত। জিনিসপত্রের দাম এরূপ সস্তা ছিল বলিয়া বিদেশে ভারতীয় জিনিসপত্রের খুবই চাহিদা ছিল। প্রধানত সুতী বস্ত্র, মসলিন, সোরা, নীল প্রভৃতিই বিদেশে চালান হইত।

মুদ্রা

সোনার মুদ্রা বা মোহর, রুপার টাকা, জিতল, জালালী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা তখন চালু ছিল।

মোগল যুগে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মকুফ করিয়া দিতেন। কিন্তু তখনকার সরকারের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। সেজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ

খাদ্যশস্য এক স্থান হইতে অন্যত্র চালান দিবার অসুবিধা হইত বলিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত।

মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপরার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ্, আমীর-ওমরাহদের ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর

অর্থ ও ধনদৌলতের বৈষম্য : র‍্যালফ্ ফিচ ও মনুসেরেট

গড়িয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা ইংরেজ পর্যটক র‍্যাল্‌ফ ফিচের বিবরণে পাওয়া যায়। বুরহানপুর, বারাণসী, আহ্‌মদাবাদ, রাজমহল, বর্ধমান, ঢাকা, হুগলী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বলিয়া মনুসেরেট নামে জনৈক ইওরোপীয় পর্যটক বর্ণনা করিয়াছেন।

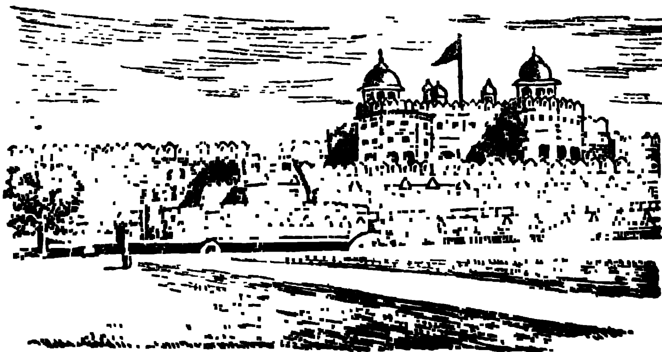
স্থাপত্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা (Architecture, Literature and Art) : দিল্লীর সুলতানি আমলের শিল্পরীতিতে ভারতীয় ও ইস্‌লামীয় শিল্পের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ শুরু হইয়াছিল। উহাই মোগল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল

স্থাপত্য শিল্প

বাদশাহদের সকলেই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একমাত্র ঔরংজেবই ছিলেন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। বাবর তাঁহার স্বল্পকাল রাজত্বের কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও বহু সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি ভিন্ন সবই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুমায়ুনের আমলেও কয়েকটি মসজিদ, সৌধ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রা ও হিসারের সৌধগুলির মধ্যে দুইটি এখনও টিকিয়া আছে। স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে মোগল যুগের অন্তর্বর্তী শের শাহের রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য। সাসারামে তাঁহার নিজের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা শের শাহ্ তাঁহার জীবদ্দশাতেই করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীর পুরাতন

কেল্লাও তাঁহারই স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন। শের শাহের স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শন-গুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মোগল বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রার দুর্গ ও



আগ্রার দুর্গ

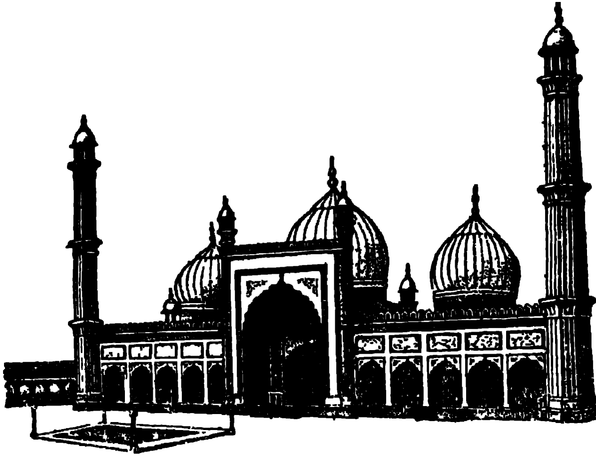
দিল্লীর লালকেল্লা এগুলির অন্যতম। ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতিও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আকবরের গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার আমলে নির্মিত বহু স্থাপত্য নিদর্শনের প্রায় সব কয়টিরই পরিকল্পনা আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর শিল্পানুরাগ ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর সিক্রির নির্মাণ-কৌশল ও সৌন্দর্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির 'বুলন্দ্-দরওয়াজা', সেলিম চিস্‌তির 'সমাধি-সৌধ', 'পাঁচমহল' প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও শিল্পানুরাগ নেহাত কম ছিল না। সেকেন্দ্রায় আকবরের 'সমাধি-সৌধ', আগ্রায় ইতিমাদ্-উদ-দৌলার 'সমাধি-সৌধ' জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। মোগল বাদশাহ্‌দের মধ্যে শাহ্‌জাহানের শিল্পানুরাগ ছিল সর্বাধিক গভীর। তাঁহার আমলের শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে 'দেওয়ান-ই-আম্', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জুম্মা মসজিদ' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার পত্নীপ্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ মমতাজের দেহাবশেষের উপর নির্মিত 'তাজমহল' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির অন্যতম হিসাবে আজিও টিকিয়া আছে। পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের মধ্যে তাজমহল অন্যতম। বহু দেশী ও বিদেশী স্থপতি তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারস্যের সিরাজ নামক শহরের শ্রেষ্ঠ স্থপতি মির্জা ঈশা, বাঙালী শিল্পী বলদেব দাশ উহার নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের আদেশে নির্মিত ময়ূর সিংহাসনটিও ছিল একটি অপূর্ব

মোগল বাদশাহ্‌দের শিল্পানুরাগ

শিল্পকীর্তি। নাদির শাহ্ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন তিনি এই বহুমূল্য শিল্পকীর্তিটি লইয়া গিয়াছিলেন। শাহ্জাহানের পরবর্তীকালে ঔরংজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে শিল্পানুশীলন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মোগল স্থাপত্য তথা শিল্পকলার অবনতি দেখা দিয়াছিল।

উদ্যান বিন্যাস

পারস্যের উদ্যানরীতির অনুকরণে মোগল আমলের কাশ্মীরের 'শালিমার বাগ', আগ্রার 'রাণী বাগ' প্রভৃতি বাগিচা উল্লেখযোগ্য।



জুম্মা মসজিদ

মোগল যুগে চিত্র শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রীক, ইরাণী ও চৈনিক চিত্র-শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূর্ব চিত্র-শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবরের দরবারে বহু চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের যে উৎকর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আবদুস সামাদ, ফারুক বেগ, বিশান দাশ, গোবর্ধন, আবুল হাসান, 'প্রাচ্যের র‍্যাফেল' মীর সৈয়দ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শাহ্জাহানের আমল হইতেই চিত্র শিল্পের প্রতি আর সেরূপ অনুরাগ ছিল না বলা যাইতে পারে এবং ঔরংজেবের আমলে উহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

চিত্র শিল্প

মোগল আমলে রাজপুতদের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্র শিল্প গড়িয়া উঠে। এগুলি 'রাজপুত চিত্র' হিসাবে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর ও সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানাপ্রকার রাজপুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজপুত চিত্রাঙ্কনরীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে কাংড়ায় পাহাড়ী চিত্রকলার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের জীবন, রামায়ণের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

পাহাড়ী শিল্পরীতি: কাংড়ার শিল্পোৎকর্ষ

সঙ্গীত শিল্প

মোগল যুগে সঙ্গীত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রখ্যাত সঙ্গীত-সাধক তানসেন ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাসদ। আকবরের দরবারে দেশী ও বিদেশী বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত থাকিতেন। আকবরের পিতা হুমায়ুনের সঙ্গীতানুরাগ ছিল খুবই গভীর। কিন্তু আকবরের মধ্যে উহা অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। বাদ্য যন্ত্রাদির মধ্যে শিঙ্গা, বাঁশী, ঢাক প্রভৃতি সে-যুগে ব্যবহৃত হইত। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। বৈজিবাওরা, 'আগ্রার অন্ধ পক্ষী' সুরদাস ও মালবের সুলতান বাজবাহাদুরের নাম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাভিজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধ। ঔরংজেব অবশ্য তাঁহার ধর্মান্ধতাবশত রাজসভা হইতে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি প্রভৃতি সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল যুগের সঙ্গীত শিল্প জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল-বলিয়া সেগুলি এযাবৎ আংশিকভাবে টিকিয়া আছে।



পাহাড়ী চিত্র (কাংড়া)

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল না। ইতিহাস-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, কাব্য—এই তিন প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিই মোগল যুগে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের জীবনস্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজ্‌ল, ফৈজী, বদাউনি, আব্দুল হামিদ লাহোরী, খাফি খাঁ প্রভৃতি সকলে ঐ যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গুলবদন বেগমের হুমায়ুননামা, আবুল ফজ্‌লের 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী', বদাউনির 'মন্তাখাব-উদ্‌-তোয়ারিখ', আবুল ফজ্‌লের ভ্রাতা ফৈজীর অনুবাদ-গ্রন্থ 'লীলাবতী', ফৈজী শরহিন্দ্‌-এর অপর একটি 'আকবরনামা' প্রভৃতি আকবরের আমলের অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টি। ফৈজী ছিলেন আকবরের সভার শ্রেষ্ঠ কবি। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায়

বদাউনির 'রামায়ণ', হাজী ইব্রাহিম শরহিন্দের 'অথর্ব বেদ', মুকাম্মল খান গুজরাটীর জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থ 'তাজক' প্রভৃতি পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, শাহ্‌জাহানের কাহিনী অবলম্বনে আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদ্‌শাহ্‌নামা', এনায়েৎ খানের শাহ্‌-জাহাননামা, শাহ্‌জাহানের পুত্র দারাশিকো কর্তৃক উপনিষদ্‌, ভগবদ্‌গীতা ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণের পারসীক ভাষায় অনুবাদ, মির্জা মহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা' মোগল যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। পারসীক ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবল (মহেশ দাশ), ভগবান দাশ মানসিংহ, তোডরমল, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি হিন্দী কবিতা রচনা করিয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। 'চণ্ডী-মঙ্গল'-রচয়িতা ত্রিবেণীর বাঙ্গালী কবি মাধবাচার্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সম্রাটের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা বীরবল হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আকবরের নিকট হইতে 'কবি-প্রিয়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ হওয়ায় মির্জা মহম্মদ কাশিম 'খাফি খাঁ' ছদ্মনামে 'মুন্তাখব্‌-উল্‌-লুবাব' প্রণয়ন করেন। আকবরের অন্যতম মন্ত্রী আব্দুর রহিম খান ই-খানান হিন্দী ভাষায় বহু দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজভাষায় সুরসাগর-রচয়িতা 'অন্ধ কবি' সুরদাস, 'রামচরিতমানস'-প্রণেতা তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩ খ্রীঃ), 'গজল'-রচয়িতা মহম্মদ হুসেন নাজীরি প্রভৃতি কবিও সে-যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল', বৃন্দাবন দাশের 'চৈতন্য ভাগবত', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', কাশীরাম দাশের মহাভারত, মকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' সে-যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই চণ্ডীকাব্য সে-যুগের বাংলার বাস্তববাদী জীবনচরিত ও লোকগাথার সমৃদ্ধ। ইহা ভিন্ন, শিখ গুরুদের উপদেশাবলী-সমন্বিত 'গ্রন্থ-সাহেব' পাঞ্জাবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। মারাঠী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সে-যুগে ঘটিয়াছিল। মোগল যুগে হিন্দুগণ ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া বাদশাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন।

সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য

মোগল আমলেও হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন ছিল। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। শাসনকার্য পরিচালনায় নূরজাহানের বিচক্ষণতা ছিল। বিদুষী শাহ্‌জাদী জাহানারা বেগম দারার ও রোশনারা ঔরংজেবের পক্ষে ছিলেন। মমতাজ মহলও উচ্চ শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। আকবরের আমলে গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী, বিজাপুরের রাণী চাঁদবিবি, শিবাজী-জননী জীজাবাঈ, রাজমাতা তারাবাঈ প্রমুখ সে-যুগের ইতিহাস-প্রসিদ্ধা বিদুষী রমণী ছিলেন। বল্লভ দেবী ও বৈজয়ন্তীর রচনা সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। বাবর-কন্যা গুল্‌বদন বেগম, হুমায়ুনের ভ্রাতুষ্পুত্রী সলিমা সুলতানা ও ঔরংজেব-দুহিতা জেব-উন্নিসা সাহিত্য রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন।

মোগল আমলে নারীর স্থান

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা ও শিখ শক্তি

(The Marathas and the Sikhs)

(ক) মারাঠাগণ (The Marathas)

মারাঠা অভ্যুত্থান (Rise of the Marathas): পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত। সহ্যাদ্রী, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসঙ্কুল ও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির কৃপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে জীবনধারণের জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে হয়। প্রকৃতির কঠোরতার ফলে তাহারা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু ও দুর্ধর্ষ। এইরূপ শক্তিশালী জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইলে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

পর্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র দেশ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মারাঠা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যোদ্ধা হিসাবে তাহারা যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ছিল সে-পরিচয় দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি জানিত। এজন্য সেই সকল সুলতানি রাজ্যে মারাঠাগণ সামরিক পদে নিযুক্ত হইত। মারাঠা জাতির সমরকুশলতা ভিন্ন ধর্ম-প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য। একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারক মারাঠা জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে মারাঠা জাতি এক গভীর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই ঐক্যবোধকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষমতাবান নেতার। শিবাজী সেই নেতার পদ গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এক দুর্ধর্ষ সামরিক ও ধর্মপ্রাণ জাতিতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মারাঠা জাতির অনৈক্য

একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতির দান

শিবাজী (Shivaji): শিবাজীর পিতা শাহ্জী ভোঁসলে প্রথম জীবনে আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন। সেই সূত্রে তিনি ক্রমে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। পুনা অঞ্চলে তাঁহাকে জায়গির দেওয়া হয়। পুনায় অবস্থানকালে শিবনের গিরিদুর্গে তাঁহার পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় (১৬২৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই শাহ্জী বিজাপুর সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈ-সহ সেখানে চলিয়া যান। শিশুপুত্র শিবাজী এবং তাঁহার মাতা জীজাবাঈ দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ধর্মভাবাপন্ন অথচ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বাধীনে পুনায় বাস করিতে থাকেন। শিবাজী বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে তাঁহার

জন্ম

বাল্যকাল

পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী ও দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। ধর্মের ভিত্তিতে এবং বীরত্ব দ্বারা এক বিশাল হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আদর্শ তাঁহার অন্তরে গড়িয়া উঠে। তিনি ছেলেবেলায় বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে দাদাজীর নিকট যুদ্ধকৌশল শিক্ষা এবং তাঁহার ও মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে হিন্দু বীরদের কাহিনী শ্রবণের ফলে অন্তরের বলিষ্ঠতা, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা, সমরকুশলতা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি গুণ শিবাজীর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজ আদর্শসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাল্যবয়স হইতেই তিনি মাওয়ালী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। পরে তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি সেনা-বাহিনী গড়িয়া তোলেন।



শিবাজী

(এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণে শিবাজী ত্রুটি করিলেন না। তিনি তাঁহার মাওয়ালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি অধিকার (১৬৪৬ খ্রীঃ) করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, তোরণার অনতিদূরে তিনি রায়গড় নামক অপর একটি দুর্গও আক্রমণ করিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীর এই যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় শিবাজী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যু (১৬৪৭ খ্রীঃ) হইলে শিবাজীকে বাধা দেওয়ার কেহ রহিল না। শিবাজী চকন দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামরিক ঘাটি দখল করিয়া পুনার সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। বিজাপুর সুলতান শিবাজীর এই সকল কার্যকলাপে প্রথমদিকে ততটা বিচলিত হন নাই। কিন্তু ক্রমেই যখন শিবাজী নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এবং এক-একটি করিয়া বিজাপুর রাজ্যের দুর্গ দখল করিতে লাগিলেন, তখন শিবাজীর কার্যকলাপ বন্ধ করিবার সহজ উপায়-স্বরূপ বিজাপুর সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। ফলে শিবাজী কিছুকাল বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি ত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। তিনি জাওলীর মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর শিবাজী মোগল বাহিনীর সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

একে একে বহু দুর্গ জয়

ঔরংজেব সেই সময়ে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তিনি বিজাপুর রাজ্যের সহিত যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত জুন্নার ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করিলে ঔরংজেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ঔরংজেবের হস্তে শিবাজীর পরাজয় ঘটিলে শিবাজী মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী পুনরায় তাঁহার যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে বহু স্থান অধিকার করিয়া ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোঙ্কণের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন।

মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ

শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি বিজাপুর সুলতানের নিরাপত্তার দিক দিয়াও কাম্য ছিল না। তিনি শিবাজীকে ধরিয়া আনিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করিলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। আফজল খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইলে শিবাজী তাঁহার প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তিনি আফজল খাঁর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। প্রতাপগড় দুর্গ জয় করা সহজ হইবে না দেখিয়া আফজল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি শিবাজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজ শিবিরে শিবাজীকে আমন্ত্রণ করিলেন। আফজল খাঁর দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তিনি আফজল খাঁর শিবিরে প্রস্তুত হইয়াই আসিলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলে আফজল খাঁ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁর বক্ষ চিরিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে শিবাজীর অনুচরগণ তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। শিবাজী দক্ষিণ-কোঙ্কণ এবং কোল্‌হাপুর জেলা অধিকার করিয়া নিজ রাজ্য আরও বিস্তার করিলেন। অবশ্য পর বৎসর (১৬৬০ খ্রীঃ) বিজাপুর বাহিনী পান্‌হালা দুর্গটি তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়া লইল।

আফজল খাঁ ও শিবাজী

এদিকে ঔরংজেব পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার উপর শিবাজীকে দমন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। শায়েস্তা খাঁ প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত করিয়া চকন ও পুনা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া শিবাজীকে সাময়িকভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া শিবাজী বিজাপুর সুলতানের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি শায়েস্তা

শায়েস্তা খাঁ ও শিবাজী

খাঁর সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তারপর এক রাত্রিতে শায়েস্তা খাঁ যখন নিজের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শিবাজী অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফতাকে হত্যা করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খাঁর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন কিন্তু শিবাজীর তরবারির আঘাতে তিনি হাতের একটি আঙুল হারাইলেন। ইহার পর (১৬৬৪ খ্রীঃ) শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। মাতুল শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতায় ঔরংজেব অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এবার অম্বররাজ জয়সিংহ এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কুটকৌশল ও মোগল বাহিনীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া পুরন্দরের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজী মোগলদিগকে কয়েকটি জেলা ও মোট ২৩টি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার কালে পুরন্দরের সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি মোগল সৈন্যকে সামরিক সাহায্য করিলেন। ইহাতে ঔরংজেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শিবাজীকে মোগল দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের বিশেষ অনুরোধে শিবাজী ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা জীজাবাঈ-এর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া শিশুপুত্র শম্ভুজীসহ আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঔরংজেব শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে শিবাজীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্রোধবশত ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। সুচতুর শিবাজী অসুস্থতার ভান করিয়া দেবমন্দিরে পূজার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্টি প্রভৃতি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন দ্বাররক্ষিগণ পরীক্ষা করিয়া যখন ঝুড়িতে সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইল না তখন তাহারা ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে একদিন শিবাজী ও তাঁহার পুত্র ঝুড়িতে করিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া গেলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

শায়েস্তা খাঁর পলায়ন

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীর যুদ্ধ—পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫)

মোগল দরবারে শিবাজীর উপস্থিতি

শিবাজীর পলায়ন

মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া এবং মোগল রক্ষীদের চক্ষে ধূলি দিয়া শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিলেন। ঔরংজেব শিবাজীকে পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, বেরার প্রদেশের কতক স্থান তাঁহাকে জায়গির হিসাবেও দান করিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই শিবাজী পুনরায়

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন : ঔরংজেব কর্তৃক 'রাজা' উপাধি দান

মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় সকল স্থান ও দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থলাভ করিলেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুরাট হইতে চৌথ দাবি করিলেন।

রাজ্যাভিষেক, 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি গ্রহণ

ইহার দুই বৎসর পর ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রায়গড়ে মহাসমারোহে নিজ অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর এবং উহার নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া এক বিরাট মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিবাজীর চরিত্র

শিবাজী কেবল সমরকুশল সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠকই ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রবল, মহান্ আদর্শ, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাঁহার সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে। হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, আদর্শের প্রতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে মহিমমণ্ডিত করিয়াছে। শিবাজী হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি কোনদিন কোনপ্রকার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন নাই। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত উদার আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কোন স্থান অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার কালে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান তাঁহার হস্তে আসিলে তাহা তিনি কোন মুসলমানকে ডাকিয়া দিয়া দিতেন। অপরাপর ধর্মাবলম্বীর ধর্মস্থান তাঁহার সেনাবাহিনী যাহাতে কলুষিত না করে সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজী নারী জাতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বৃদ্ধ, শিশু, নারী কেহই যাহাতে তাঁহার সেনাবাহিনীর আক্রমণকালে কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল।

শিবাজীর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

শিবাজীর কর্মজীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি নিজ রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু তিনি যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য চালাইতেন না। তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শদানের জন্য আটজন মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা 'অষ্টপ্রধান' নামে অভিহিত হইতেন। এই আটজন মন্ত্রী আটটি পৃথক পৃথক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

প্রদেশ, পরগনা, গ্রাম প্রভৃতির শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার পরগনা এবং তরফে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন বিভাগ ছিল গ্রাম। রাজ্যের বিভিন্নাংশের রাজকর্মচারিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীনে ছিলেন।

শিবাজী প্রজাবর্গের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিতেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির প্রজাদের উপর মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইবে না, এই শর্তে শিবাজী তাহাদের নিকট হইতে চৌথ'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'সরদেশমুখী'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-দশমাংশ অতিরিক্ত কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন।

রাজস্ব : চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজীর সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ আবার 'বার্গীর' ও 'শিলাদার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সরকার হইতে বার্গীর অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেতন পাইতেন। শিলাদার অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিজেরা সংগ্রহ করিতেন এবং সরকার হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন। পদাতিক বাহিনীর সর্বোচ্চে ছিলেন সেনাপতি, তারপর জুমলদার, তারপর হাবিলদার এবং সর্বনিম্নে 'নায়ক'। শিবাজীর সেনাবাহিনী পর্বতসংকুল দেশে অতিশয় দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। শিবাজীর সেনাবাহিনীর শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল অসাধারণ। কোন স্ত্রীলোক তাঁহার সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কোন স্থান আক্রমণ বা লুণ্ঠনের সময় কোন স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ বা শিশুর উপর অথবা কোন ধর্মস্থানের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

সেনাবাহিনী ; অশ্বারোহী—বার্গীর ও শিলাদার এবং পদাতিক

শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা

শিবাজীর কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এই সকল পার্বত্য দুর্গ শত্রুর পক্ষে ছিল দুর্ভেদ্য। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যের দুর্গসংখ্যা ছিল মোট ২৪০টি।

দুর্গ

শিবাজী ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামরিক সংগঠক। তিনি নৌ-বাহিনীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি মোট ২০০টি বিভিন্ন আকারের রণতরীর এক বিরাট নৌ-বহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

নৌ-বহর

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খাঁ (প্রকৃত নাম মির্জা মহম্মদ কাশিম) শিবাজীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খাফি খাঁর মন্তব্য

শিবাজীর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক সংঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দুর্ধর্ষ জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া শিবাজী ভারত-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠাগণ

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৮০ খ্রীঃ)। তিনি পিতার ন্যায় প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু মোগলদের

সহিত যুঝিবার মত তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। ঔরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয়দানে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রথম শম্ভুজী মোগলদের সহিত যুঝিবার কালে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের হস্তে বন্দী হন এবং বহু লাঞ্ছনার পর তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইহার পর মোগল বাহিনী একে একে বহু মারাঠা দুর্গ, এমনকি মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ও দখল করিয়া লয়। রায়গড় দখল করিবার কালে প্রথম শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) ও পরিবার-পরিজন মোগলদের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু প্রথম শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া গিয়া কর্ণাটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মারাঠাগণ মোগল বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিতে লাগিল। শান্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা সেনাপতির আক্রমণে মোগল বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মারাঠাগণ কোন কোন স্থানে মোগলদের নিকট হইতেও 'চৌথ' আদায় করিতে ছাড়িল না। এইভাবে কিছুকাল কাটিল, তারপর মোগল সেনাবাহিনী রাজারামের কর্মকেন্দ্র জিঞ্জি অবরোধ করিলে মারাঠাগণ প্রায় আট বৎসর সেই অবরোধ প্রতিহত করিয়া টিকিয়া রহিল। অবশেষে জিঞ্জি মোগল সেনার হস্তগত হইলে (১৬৯৮ খ্রীঃ) রাজারাম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাতারাও মোগল সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল (১৭০০ খ্রীঃ)। এইভাবে ঔরংজেব মারাঠা প্রতিরোধ কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অধিকৃত দুর্গগুলি পুনরায় মারাঠাগণ জয় করিয়া লইতে লাগিল। ঔরংজেব কোনরূপেই মারাঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ: প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯)

মোগল হস্তে প্রথম শম্ভুজীর পরিবার-পরিজন ও শিশুপুত্র শাহু বন্দী

রাজারাম (১৬৯০-১৭০০)

রাজারাম দীর্ঘকাল মোগলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার দুই বিধবা পত্নী তারাবাঈ ও রাজসবাঈ নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। প্রথমা পত্নী তারাবাঈ মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন (১৭০০ খ্রীঃ) করিয়া মোগলদের সহিত চিরাচরিত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। মারাঠাগণ মালব, গুজরাট, বরোদা এমনকি আহম্মদনগরে ঔরংজেবের যুদ্ধশিবিরও আক্রমণ করিল। ঔরংজেব জীবনের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য দমনে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দূরের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালীই রাখিয়া গেলেন।

তারাবাঈ—তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২)

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোয়াজ্জেম (প্রথম বাহাদুর শাহ্) সেনাপতি জুলফিকার খাঁর কুটিল পরামর্শে* মারাঠাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে

*V. A. Smith: *The Oxford History of India*, p. 430, (3rd Ed.).

ঔরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহুকে মুক্তিদান করেন। সেই সময়ে তারাবাঈ নিজপুত্র তৃতীয় শিবাজীর পক্ষে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহু মুক্তিলাভ করিয়া মারাঠা সিংহাসন দাবি করিলেন। আইনত তাঁহার দাবিই অধিকতর বলবৎ ছিল। তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) মারাঠাদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাতারা দুর্গে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারাবাঈ পানহালা দুর্গে তাঁহার রাজধানী অপসারিত করিলেন। চারি বৎসর ধরিয়া মারাঠা রাজ্য শাহু ও তারাবাঈ-এর মধ্যে বিভক্তভাবেই শাসিত হইল। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাঈ-এর মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতমা পত্নী রাজসবাঈ নিজপুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীর নামে কোলহাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইভাবে মারাঠাদের গৃহযুদ্ধ তখনও লাগিয়া রহিল। কিন্তু শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কণের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ হইলেন শাহুর 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ত্রী। পরে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণার সন্ধি (Treaty of Warna) দ্বারা দ্বিতীয় শম্ভুজী ও শাহুর রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল। কোলহাপুরের মারাঠা শাসনকর্তা শম্ভুজী শাহুর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রেও শাহুর অধিনায়কত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাজবংশের মধ্যে গৃহবিবাদের সমাপ্তি ঘটিল।

শাহুর মুক্তিলাভ (১৭০৭)

শাহু (১৭০৮-৪৯)

রাজসবাঈ—দ্বিতীয় শম্ভুজী (১৭১২-৬০)

বার্ণার সন্ধি (১৭৩১)

পেশওয়াতন্ত্র: শাহু রাজ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা বালাজী বিশ্বনাথকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বা 'পেশওয়া' নিযুক্ত করিলেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁহার কর্মকুশলতা, দূরদর্শিতা ও সংগঠনী শক্তি মারাঠা রাজ্যে এক নবজীবনের সূচনা করিল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর জীবদ্দশায় পেশওয়া পদকে বংশানুক্রমিক করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বময় শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন।

পেশওয়াতন্ত্রের উৎপত্তি

বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যকে এমনভাবে পুনর্গঠন করিলেন যে মারাঠা সর্দারগণ স্ব স্ব প্রধান হওয়া দূরের কথা, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতাদানে বাধ্য হইলেন। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার উপর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকারও লাভ করিয়াছিল। সরদেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থই ছিল রাজার প্রাপ্য। চৌথের এক-চতুর্থাংশ পাইতেন রাজা স্বয়ং। অবশিষ্ট অর্থ মারাঠা দলপতিগণ পাইতেন। বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যকে সুসংগঠিত করিয়া এবং মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০)

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ গ্রহণ করেন। প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মকুশল তেমনি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। তিনি পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে একটি বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। প্রথম বাজী রাও ইহার নাম দিয়াছিলেন 'হিন্দু-পাদ্-পাদ্‌শাহী'। এজন্য তিনি মারাঠা ভিন্ন অপরাপর হিন্দু দলপতি, অভিজাতবর্গ ও রাজাগণকে সংঘবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। যেখানেই হিন্দু রাজা বা জমিদারকে সামরিক সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই প্রথম বাজী রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিতেন। উত্তর ভারতেও মারাঠা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম বাজী রাও জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রথম বাজী রাও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল্-মুল্‌ক বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের (১৭১৯ ৪৮) সৈন্যসহ তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনতিদূরে নিজাম-উল্-মুল্‌ককে পরাজিত করিয়া (১৭৩৮ খ্রীঃ) সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বলনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। অপরদিকে প্রথম বাজী রাও-এর ভ্রাতা চিমনজী আপ্পা পোর্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সলসেট্ ও ব্যাসিন দখল করেন। প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানী রায়গড় হইতে পুনায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রথম বাজী রাও
(১৭২০-৪০)

প্রথম বাজী রাও-এর বিজয়লাভ

প্রথম বাজী রাও কেবল মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন নাই। তিনি একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। শাহু ও পেশওয়া চৌথ আদায়ের নিশ্চয়তা ও সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য মারাঠা গেরিলা সামন্তদিগের মধ্যে 'সারণজমি' (*Saranjami*) প্রথা* চালু করিয়াছিলেন। নাদির শাহের সহিত আহম্মদ শাহ্ আবদালী বা দুর্‌রানী ভারতবর্ষ আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) করিলে তিনি মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত মিলিত হইয়া বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খ্রীঃ)।

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা

প্রথম বাজী রাও মারাঠাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন। রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন জায়গির-প্রথা পুনঃ-প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলে গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে এবং ধারের পোবার—এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে মারাঠা রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা সকলেই অবশ্য পুনার পেশওয়ার আদেশাধীন ছিল। পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া এক 'মারাঠা

প্রথম বাজী রাও-এর কৃতিত্ব

* Vide *The New Cambridge Modern History*, vol. VII, p. 549.

যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করিলেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন হইল। মারাঠাগণ যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশী আক্রমণকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণকারী ছিলেন নাদির শাহ্।

মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র



প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয়) বালাজী বাজী রাও পেশওয়া-পদ লাভ করিলেন। তিনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। নানাসাহেব তাঁহার পিতার 'হিন্দু-পাদ্-পাদ্‌শাহী'র আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু, মুসলমান সকলের উপরই উৎপীড়ন চালাইতে লাগিলে হিন্দু রাজাগণও তাঁহার বিরোধিতা শুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১).

মারাঠা বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ নামক ব্যক্তিকে অন্যতম সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়া মারাঠা বাহিনীর পূর্বের ঐক্য ও আদর্শ নাশ করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজী রাও কর্তৃক 'হিন্দু-পাদ্-পাদ্শাহী'র আদর্শ পরিত্যক্ত

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাও সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। তাঁহার আমলেই অবশ্য মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সিন্ধু নদ এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বালাজী বাজী রাও-এর আমলে নাগপুরের ভোঁসলে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া উড়িষ্যায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। বালাজী বাজী রাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) আহ্মদ শাহ্ আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৭৫৮ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম উদ্গীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬০ খ্রীঃ) মারাঠাগণকে প্রচুর ধনদৌলত, দৌলতাবাদের দুর্গ, ঔরঙ্গাবাদ, বিজাপুর ও বিদরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এমনকি, দিল্লীর রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহারা যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পাঞ্জাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত করিবার ফলে আহ্মদ শাহ্ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া (১৭৬১ খ্রীঃ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে ভারতবর্ষে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ মোগলদের হাত হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইভাবে মারাঠা শক্তি-সংঘকে দুর্বল রাখিয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বাজী রাও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও-এর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন (১৭৬১ খ্রীঃ)। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে ও সামরিক দক্ষতায় মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। মাধব রাও-এর সহায়তায় মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হায়দর আলিকে পরাভূত করিয়া মহীশূরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মাধব রাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠা শক্তির বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল।

প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২)

প্রথম মাধব রাও এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন (১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ)। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা কর্তৃক নিহত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের মধ্যে রাঘোবা পেশওয়া-পদ হারাইয়া ইংরেজদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নারায়ণ রাও-এর পুত্র (দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মাধব

রাও নাবালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্রাহ্মণকে রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্যের ভার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় মাধব রাও-এর শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে রাঘোবাকে ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইঙ্গ-মারাঠাদের মধ্যে সলবইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৭৮২ খ্রীঃ)। অপরদিকে মহীশূরের হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতে থাকে। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করে এবং নিজাম-উল্-মুল্ককে খরদার যুদ্ধে (১৭৯৫ খ্রীঃ) পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদের কিছু অংশ দখল করে।

(দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬)

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (দ্বিতীয়) মাধব রাও-এর মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের মৃত্যু হইলে মারাঠা ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিজাম সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার হৃত রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠাদের দখল হইতে পুনরুদ্ধার করিলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। যশোবন্ত রাও হোলকার পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওকে পরাজিত ও পেশওয়া-পদচ্যুত করিলে তিনি ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। এই সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলী ব্যাসিনের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় বাজী রাওকে ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্ত্রের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হইয়া পড়েন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজী রাও এর মৃত্যু ঘটিলে পেশওয়াতন্ত্রের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮)

(ঘ) শিখদের অভ্যুত্থান (Rise of the Sikhs): পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষে যে ধর্ম-সংস্কারের প্রবণতা দেখা দিয়াছিল সেই সময়ে গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম শিখ ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি যে ধর্ম সম্প্রদায়—অর্থাৎ শিখ সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই শিখ সম্প্রদায় পরবর্তী ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক

গুরু নানক অঙ্গদ নামে তাঁহারই এক শিষ্যকে পরবর্তী শিখগুরু হিসাবে মনোনীত করিয়া ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। গুরু অঙ্গদের পরবর্তী শিখগুরু ছিলেন অমরদাস। ইঁহারা তাঁহাদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্যে শিখদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী—অর্থাৎ চতুর্থ শিখগুরু ছিলেন রামদাস। গুরু রামদাসের ধর্ম-প্রবণতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২)
তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪)

চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১)

পঞ্চম গুরু অর্জুনমল (১৫৮১-১৬০৬)

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার দান হিসাবে সম্রাট্ আকবর গুরু রামদাসকে অমৃতসরে একটি সরোবর-সহ একখণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপরই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ শিখমন্দির বা গুরুদ্বার নির্মিত হয়। গুরু রামদাসের সময় হইতেই শিখগুরুর পদ বংশ-পরম্পরায় মনোনীত হইতে থাকে। পরবর্তী গুরু—অর্থাৎ শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনমল ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় শিখ ধর্ম পাঞ্জাবের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে এবং শিখদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গুরু অর্জুনমল হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তদের বাণী হইতে এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী শিখগুরুদের বাণী হইতে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি একত্র করিয়া 'আদিগ্রন্থ' নামে শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন। গুরু অর্জুনের সংগঠনী ক্ষমতা এবং ধর্মপরায়ণতার সুফল হিসাবে একদিকে যেমন শিখগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি শিখ ধর্মাধিষ্ঠানে স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ফলে ধর্মাধিষ্ঠানের সম্পত্তি ও ধনদৌলত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুরু অর্জুনের আমল হইতেই শিখ সম্প্রদায় নিছক ধর্ম-সম্প্রদায় না থাকিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রবেশ করিতে শুরু করে।

জাহাঙ্গীর কর্তৃক গুরু অর্জুনের হত্যা

শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ

সম্রাট্ আকবর গুরু অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাদা খসরুকে প্রশয় দিবার কারণে অর্জুন জাহাঙ্গীরের কোপানলে পতিত হন। জাহাঙ্গীর রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তদুপরি তাঁহার উপর এক বিরাট পরিমাণ অর্থদণ্ডও চাপানো হয়। এযাবৎ শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নাই। কিন্তু জাহাঙ্গীর কর্তৃক পঞ্চম গুরুর নৃশংস হত্যার পর শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫)

সপ্তম গুরু হররায় (১৬৪৫-৬১)

অষ্টম গুরু হরকিশন (১৬৬১-৬৪)

গুরু অর্জুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ ছিলেন দৃঢ়চেতা পুরুষ। তাঁহার সংগঠনী শক্তি, সামরিক দক্ষতা ও দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যেই শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করিল। পিতার উপর আরোপিত অর্থদণ্ড গুরু হরগোবিন্দ দিতে অস্বীকার করিলে কিছুকাল তাঁহাকে গোয়ালিওর দুর্গে বন্দিদশায় কাটাইতে হয়। ইহার পর হরগোবিন্দ সম্রাট্ শাহ্জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অমৃতসরের নিকট সংগ্রাম নামক স্থানে মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। ইহার কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীরের কিরাতপুর নামক স্থানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বে তিনি পৌত্র হররায়কে গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান। হররায় ও তাঁহার পুত্র হরকিশন—এই দুই গুরুর আমলে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই। গুরু হরকিশনের মৃত্যুর পর কে গুরু হইবেন তাহা লইয়া এক বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগ

বাহাদুরকে শিখ সম্প্রদায় গুরু হিসাবে স্বীকার করিলে কিরাতপুরের অনতিদূরে আনন্দপুর নামক স্থানে তিনি তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

গুরু তেগ বাহাদুর: তেগ বাহাদুর ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি কয়েক মাস পাটনায় ছিলেন। রাজা রাম সিংহ যখন আসাম আক্রমণ করেন (১৬৬৮ খ্রীঃ) সেই সময় তেগ বাহাদুর তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তেগ বাহাদুর মোগল সম্রাট ঔরংজেবের অ-মুসলমান বিদ্বেষ, জিজিয়া কর স্থাপন এবং কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন, এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে এই সকল আদেশের বিরোধিতা করিতে উৎসাহিত করিলেন। ঔরংজেবের ন্যায় ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই বিরোধিতা বরদাস্ত করিবার মনোবৃত্তি স্বভাবতই ছিল না। তিনি তেগ বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন। দরবারে উপস্থিত সকলের সম্মুখে তেগ বাহাদুরকে হয় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করা হইল। তেগ বাহাদুর নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেও চাহিলেন না, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াও স্বধর্ম রক্ষা করিবেন জানাইলেন। পাঁচ দিন পর তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হইল। মৃত্যুর পূর্বে তেগ বাহাদুর বলিয়াছিলেন 'শির দিয়া, সার না দিয়া'—অর্থাৎ মস্তক দিচ্ছি, কিন্তু ধর্ম দেই নাই। তেগ বাহাদুরের নির্ভীকতা ও ধর্মের জন্য জীবনাহুতি শিখ সম্প্রদায় তথা যাবতীয় অ-মুসলমানদের মনে তাঁহার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, শিখদের মধ্যে মোগল সম্রাট্ ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতার সৃষ্টি হয়। ফলে মোগলদের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

নবম গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)

গুরু গোবিন্দ সিংহ: তেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ ছিলেন শিখদের দশম এবং সর্বশেষ গুরু। তিনি অতি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া শিখ সম্প্রদায়কে এক অতিশয় সংগঠিত ও সুসংহত শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি শিখদের মধ্যে 'পাহুল' (Pahul) প্রথার—অর্থাৎ 'অভিসিঞ্চন' (baptism) প্রথার প্রচলন করেন। যে-সকল শিখ এইভাবে অভিসিঞ্চিত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল 'খাল্‌সা'—অর্থাৎ পবিত্র। এই সকল 'পবিত্র' শিখদের পদবী সেই সময় হইতে দেওয়া হইল সিং (সিংহ)। ইহা ভিন্ন, এই সকল অভিসিঞ্চিত শিখকে পঞ্চ 'ক'—অর্থাৎ কেশ (লম্বা চুল), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (ছোট জাঙ্গিয়া), কঙ্গা (চিরুনি), কড়া (ইস্পাতের বালা)—এই পাঁচটি সর্বদা ধারণ করিতে হইত। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবার পশ্চাতে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। গুরু গোবিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা শিখদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চলের রাজাগণ ও মোগল বাহিনীর সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

ছিলেন। ঔরংজেব এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শিখ নেতাকে তথা শিখদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ দেখা দিলে গুরু গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শাহকে সমর্থন করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে তিনি গিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোদাবরী নদীর তীরে জনৈক আফগান আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারান (১৭০৮ খ্রীঃ)।

গুরু গোবিন্দ সিংহের কোন পুত্রসন্তান ছিল না ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরই শিখ গুরুদের ক্রমিক ধারার অবসান ঘটে। শিখদের ধর্মনৈতিক সর্বোচ্চ অধিকার গুরুর স্থলে 'গ্রন্থসাহেব'—অর্থাৎ শিখদের ধর্মগ্রন্থে ন্যস্ত হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুচর বান্দা শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি দেখিতে অনেকটা গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায়ই ছিলেন। বান্দা চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের এক বাহিনী সংগঠন করিয়া শিরহিন্দ নামক স্থানের ফৌজদার ওয়াজির খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া সেই শহর দখল করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ওয়াজির খাঁ-ই গুরু গোবিন্দের সন্তানগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বান্দা নিজ অধিকারে আনেন এবং নাহন ও শধরা নামক স্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লোহগড় নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি স্বাধীন রাজার মর্যাদা সহকারে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। সম্রাট্ প্রথম বাহাদুর শাহ্ লোহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা পলাইয়া গিয়া লাহোরের নিকট পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তিনি শধরা, লোহগড় দখল করেন এবং শিরহিন্দ লুণ্ঠন করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর দুর্গে তাঁহাকে অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর মোগল সেনার হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে দিল্লীতে সম্রাট্ ফারুকশিয়ারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে সম্রাটের আদেশে বান্দার পুত্রকে বান্দার সম্মুখে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং বান্দাকে হাতীর পায়ের নিচে ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই সময় শিখদের শক্তি অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের আদর্শে সংগঠিত শিখ শক্তি নিঃশেষ হইবার ছিল না। কাপুর সিংহ নামক অপর এক নেতার অধীনে শিখজাতি পুনরায় সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নাদির শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, সেই সুযোগে শিখগণ সামরিক ও আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করিল।



গুরু গোবিন্দ সিংহ

বান্দা

বান্দার নৃশংস হত্যা : শিখ শক্তি হ্রাস

শিখ শক্তি পুনর্গঠিত কাপুর সিংহ

দালেওয়াল নামক স্থানে তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এই দুর্গ হইতে তাহারা লাহোরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ করিতে থাকে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অব্যবস্থা শিখদের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে এবং আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আবদালী যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে থাকেন (১৭৬৭ খ্রীঃ) সেই সময়ে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে আক্রমণ করে। ক্রমে পাঞ্জাবে আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আবদালী অধিকৃত যাবতীয় স্থান অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিখগণ পূর্বে শাহরাণপুর হইতে পশ্চিমে এটক এবং দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও যমুনা পর্যন্ত নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

পাঞ্জাব ও নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল শিখ অধিকারভুক্ত

এইভাবে শিখগণ এক স্বাধীন রাজ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বারটি ভাগে ভাগ করিয়া এক ধর্মাশ্রয়ী সামন্ত রাজ্যসংঘের প্রতিষ্ঠা করে। এই এক একটি ভাগ 'মিস্‌ল' (Misl) নামে অভিহিত হইত। প্রথমে মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিবার প্রয়োজনে এই বারটি মিস্‌লের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হেতু মোগল শক্তির পতনের ফলে শিখ মিস্‌লগুলি বহিরাগত শত্রুর ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল মিস্‌ল একে অপরের অংশ অধিকার করিতে শুরু করিলে ক্রমে শিখগণের অধিকাংশ এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে সংগঠিত হইল। এই রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করিয়াছিলেন রঞ্জিৎ সিংহ।

ধর্মাশ্রয়ী সামন্ত রাজ্যসঙ্ঘ

রঞ্জিৎ সিংহ, ১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ (Ranjit Singh): রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সুকারচুকিয়া নামক মিস্‌ল—অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মহা সিংহ। দশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটিলে (১৭৯০ খ্রীঃ) তিনি সুকারচুকিয়া মিস্‌লের নেতা হন। এত অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা একমাত্র অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এ-বিষয়ে ভারত-ইতিহাসে সম্রাট্‌ আকবরের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ্‌ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার সেনাবাহিনীকে বার বার আক্রমণ করিয়া এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন যে জামান শাহ্‌ রঞ্জিৎ সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সহিত এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর রঞ্জিৎ সিংহ

প্রথম জীবন


রঞ্জিৎ সিংহ

জামান শাহ্‌কে নানাভাবে সাহায্য দান করিলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জামান শাহ্‌ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি রঞ্জিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময় হইতেই রঞ্জিৎ সিংহ সামরিক নেতা এবং দূরদর্শী রাজনীতিক হিসাবে অসাধারণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি পাঞ্জাবে আফগান আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া শিখ জাতীয় রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অব্যবস্থাই রঞ্জিৎ সিংহের সাফল্যের সুযোগ দান করিয়াছিল।

নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির পর মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ জম্মুর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। জম্মুর রাজা রঞ্জিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলেন। ইহার পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর দখল করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। ঐ বৎসরই হোলকার ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ (Lard Lake) কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দূরদর্শী রঞ্জিৎ সিংহ হোলকারকে সাহায্য করা দূরে থাকুক ইংরেজদের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের চুক্তি দ্বারা হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আশা পোষণ করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের যাবতীয় শিখ মিস্‌ল দখল করিয়া উহার পূর্ব-তীরস্থ মিস্‌ল দখল করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলে সেই অঞ্চলের কয়েকটি মিস্‌লের নেতা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, একথা বিবেচনা করিয়া ইংরেজগণ তাঁহার সহিত মিত্রতা বজায় রাখিবার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিল। লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেট্‌কাফকে রঞ্জিৎ সিংহের সহিত আপোস-মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিলেন। ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি আক্রমণ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এই সন্ধির ফলে রঞ্জিৎ সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে স্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হয়। রঞ্জিৎ সিংহের জীবদ্দশায় এই মিত্রতা অটুট ছিল।

অমৃতসর দখল

অমৃতসরের সন্ধি

অতঃপর কাশ্মীর, মুলতান, কোহাট, বান্নু, দেরা ইস্‌মাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন।

রাজ্যবিস্তার

রঞ্জিৎ সিংহ কেবল রণনিপুণ সেনাপতিই ছিলেন না, শাসনকার্যে তিনি অত্যধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগঠনী শক্তিও ছিল অপরিসীম। তিনি আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজ বাহিনীর সামরিক শিক্ষার সুবিধার জন্য নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছিলেন এইরূপ দুইজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্মচারীকে তিনি নিযুক্ত করেন। রঞ্জিৎ সিংহ স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিতে বিশ্বাস

সংগঠনমূলক কার্যাদি

ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রচলিত রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

ইংরেজদের সহিত রঞ্জিৎ সিংহ সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরে এবং সিন্দুদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে গেলে ইংরেজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি মিত্রতা তাহারা সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের বিনিময়েও ইংরেজগণ রঞ্জিৎ সিংহকে কোনভাবে বিরক্ত করিতে চাহে নাই। পারস্য ও রাশিয়ার যুগ্ম অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য আফগানিস্তানের সহিত ইংরেজদের মিত্রতা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। দোস্ত মহম্মদও এইরূপ মিত্রতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই মিত্রতার শর্ত হিসাবে রঞ্জিৎ সিংহ-অধিকৃত পেশোয়ার দাবি করিলে, ইংরেজ সরকার সেই শর্ত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই।

ইংরেজদের সহিত মিত্রতা

রঞ্জিৎ সিংহ বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিক এবং গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। শিখ জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক বৃহৎ শক্তিশালী জাতি হিসাবে গঠন করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরের শিখগণকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করিতে না পারিলেও পশ্চিম-তীরস্থ যাবতীয় শিখ মিস্‌লকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতি অল্পবয়সে সুকারচুকিয়া মিস্‌লের শাসনভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ প্রতিভাবলে এবং সামরিক কৌশল ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা তিনি নিজেকে এক বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যের নেতৃত্বে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চার্লস্ মেট্‌কাফ প্রমুখ ইংরেজ এবং বহু বিদেশী পর্যটক রঞ্জিৎ সিংহের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ লেখাপড়া জানিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শাসনকার্যে দয়া, ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্ম বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ সিংহের কৃতিত্ব

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন না। যাহা হউক, সিংহাসনলাভের এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে শিখ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এদিকে তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই তাঁহার পুত্র নৌনিহাল সিংহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনিও আততায়ীর আক্রমণে প্রাণ হারাইলে (১৮৪৩ খ্রীঃ) শিখ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী 'খাল্‌সা' শাসনক্ষমতা হস্তগত করিল। রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া

খড়ক সিংহ

পরবর্তী রাজগণ

খাল্‌সার প্রাধান্য—দলীপ সিংহ

এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে নামমাত্র অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া লাল সিংহ ও তেজ সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতা দেশের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখ শক্তি উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তীকালে শিখ শক্তির পতন যেমন ছিল আকস্মিক তেমনি ছিল দ্রুত। জেনারেল গর্ডনের ভাষায়—রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ শক্তি যেন এক বিস্ফোরণের পর যেরূপ অগ্নিশিখা লেলিহান রূপ ধারণ করে এবং অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হইয়া পড়ে সেরূপ স্তিমিত এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু—শিখ শক্তির দ্রুত পতন

রঞ্জিৎ সিংহের পরবর্তীকালে শিখ শক্তি : রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সূচনা করিয়াছিল। দীর্ঘকাল এরূপ পরিস্থিতি চালু থাকিবার ফলে স্বভাবতই শিখ শক্তির চরম দুর্বলতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে শিখ জাতিকে আবন্ধ হইতে হইল।

শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর একের পর এক করিয়া বহু উত্তরাধিকারী সাময়িকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পদচ্যুত হইলেন। অবশেষে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাণীমাতা ঝিন্দনকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রহিল তেজ সিংহ ও লাল সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতার উপর।

নাবালক দলীপ সিংহের সিংহাসন লাভ—রাণীমাতা ঝিন্দনের অভিভাবকত্ব

আভ্যন্তরীণ শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই 'খাল্‌সা'—অর্থাৎ শিখ সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। রাণীমাতা ঝিন্দনের পক্ষে সেনাশক্তিকে স্ববশে রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে সামরিক বাহিনীর অধিকর্তাগণই দেশের শাসনব্যবস্থায় এক স্বৈরশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

খাল্‌সার শাসনক্ষমতা অধিকার

রাণীমাতা ঝিন্দন সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে পরোক্ষভাবে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া ব্রিটিশ শক্তির হস্তে পরাজিত হইলে বা অন্তত ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিবার ফলে দুর্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের কথা ভাবিলেন। এইভাবে সুদক্ষ শিখ সৈনিকগণ কোন নির্দিষ্ট বা উচ্চ আশা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া কেবল রাণীমাতা ঝিন্দনের কুটচালের ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রিটিশ শক্তির প্রসার-নীতিও শিখদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদিও রাণীমাতা ঝিন্দনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা। মুদ্‌কী, ফিরোজশাহ্‌, আলীওয়াল্‌ এবং সর্বশেষে সোব্রাওনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রিটিশ ও শিখ শক্তির দ্বন্দ্বে

রাণী ঝিন্দনের কূটচাল

ব্রিটিশ আগ্রাসী নীতি

ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শিখ শক্তির পরাজয়

শিখ শক্তির পতন ঘটিল। ব্রিটিশ শক্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী শক্তির পতনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল।

পাঞ্জাবে ব্রিটিশ প্রাধান্য

ব্রিটিশরা দলীপ সিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে তাঁহার অভিভাবিকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ও একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিল। লাহোরকে ক্ষুদ্রায়তন করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যটি গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। গোলাব সিংহ ছিলেন লাহোর দরবারের অধীনে জনৈক সর্দার।

শিখদের স্বাধীনতা-স্পৃহা

শিখদের অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নির্বাপিত হয় নাই। ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় প্রধানত সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গের জন্যই ঘটিয়াছিল, একথা তাহাদের অন্তরে পীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাণীমাতা ঝিন্দনকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোর হইতে অপসরণে বাধ্য করায় শিখদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘটিতে চলিল।

মুলরাজের সহিত বিরোধ

ঠিক সেই সময়ে মুলতানের গভর্ণর দেওয়ান মুলরাজকে রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে বলা হইলে তিনি অপমানজনক বিবেচনা করিয়া পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলে সর্দার খাঁ সিংহকে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে উভয় ব্রিটিশ কর্মচারীকেই হত্যা করা হইল। মুলরাজকে এজন্য দায়ী করা হইলে মুলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল।

মুলতানের বিদ্রোহ—জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত

ক্রমে এই বিদ্রোহ এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইলে ব্রিটিশ সরকার (লর্ড ডালহৌসী) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

চিলিয়ানওয়ালা, মুলতান ও গুজরাটের যুদ্ধ

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের বিনিময়েও জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানের যুদ্ধে অবশ্য ব্রিটিশ পক্ষ জয়ী হইল। অনুরূপ গুজরাটের যুদ্ধে পুনরায় ব্রিটিশ সৈন্য জয়লাভ করিল। চরম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিতে সমর্থ হইল না।

পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। এইভাবে স্বাধীন শিখ শক্তির পরাজয় ও পতন ঘটিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে ইওরোপীয়দের আগমন

(Advent of the Europeans in India)

পোর্তুগীজগণ (The Portuguese) : ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন পোর্তুগীজ দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছিলে অল্পকালের মধ্যেই পোর্তুগীজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা কোচিন ও ক্যানানোর—এই দুই স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইহার পর আল্‌ফোন্‌সো আল্‌বুকার্ক পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠিগুলির গভর্ণর হইয়া আসিলে পোর্তুগীজগণ ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সল্‌সেট্‌, ব্যাসিন, বোম্বাই, চৌহ্‌ল, সান্‌ টোম্‌ ও বাংলাদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরবর্তী কালে তাহাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে হুগলী হইতে তাহাদিগকে সম্রাট্‌ শাহ্‌জাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। পরে সেখানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন হুগলীতে পোর্তুগীজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা এবং বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্নীতিমূলক কার্যের ফলে ভারতবর্ষে পোর্তুগীজ প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগ ঘটে নাই। তাহারা সামান্য কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

ভাস্কো-ডা-গামা

দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন

পোর্তুগীজদের দুর্নীতিমূলক কার্যাদি


ভাস্কো-ডা-গামা

ওলন্দাজগণ (The Dutch) : পোর্তুগীজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া হল্যাণ্ডের—অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমেই পোর্তুগীজদের সহিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করিল। গুজরাট, করমণ্ডল উপকূল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি তাহারা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলেই নিজেদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক কেন্দ্র গড়িয়া তোলে। ভারতবর্ষে অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারে নাই।

অসাফল্য

ফরাসী বণিকগণ (The French Traders): ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাথমিক চেষ্টা কিছুকাল পরেই স্থগিত থাকে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর অর্থ মন্ত্রী কল্‌বেয়ার (Colbert) ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য শুরু করিবার ব্যবস্থা করেন। সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ক্রমে মসুলিপত্তম্, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি গড়িয়া উঠে।

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ইংরেজ বণিকগণ (The English Traders): ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে কুঠি স্থাপনে পশ্চাৎপদ ছিল না। পোর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী (প্রথম) এলিজাবেথের সনন্দ লাভ করিয়া ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র লইয়া মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-সুযোগ প্রার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ টমাস্ রো প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র-সহ আসিলে পর ভারতস্থিত ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় কতক কতক বাণিজ্য-সুযোগ লাভে সমর্থ হইল। সুরাট, আগ্রা, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ), হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে একে একে বহু বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ বিবাহসূত্রে পোর্তুগাল হইতে বোম্বাই শহরটি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইহা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ প্রসারিত হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

এইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ইংরেজের অনেক বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বল-প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিলে ঔরংজেবের সহিত ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে ইংরেজগণ ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহারা পুনরায় বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-শুল্ক ও জিজিয়া কর দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল কর্মচারিগণ বণিকদের নিকট হইতে আরও নানাপ্রকার কর ও শুল্ক আদায় করিত। ইংরেজগণ ইহার বিরোধিতা করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জব্ চার্ণক নামে জনৈক ইংরেজ বণিক মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সুতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকায়) আসিয়া তাঁহার জাহাজ ভিড়াইলেন। কিন্তু ইহার

ইংরেজগণ কর্তৃক বাণিজ্য-সুযোগ লাভ ও কুঠি স্থাপন

ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ

অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজগণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ঔরংজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে। সেই সময়ে জব্ চার্ণক বাধ্য হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত ঔরংজেবের বিবাদ মিটিয়া গেলে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই তিনি কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। সেই সময়ে মোগল সম্রাটের আদেশে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজ বণিকদিগকে বৎসরে তিন হাজার টাকার পরিবর্তে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন (১৬৯১ খ্রীঃ)। পরে ইংরেজগণ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

জব্ চার্ণক

কলিকাতা মহানগরীর পত্তন (১৬৯০ খ্রীঃ)

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজগণ তাহাদের কলিকাতা কুঠির নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পাইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি সেই সময়ে (১৭০০ খ্রীঃ) নির্মিত হয়। ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুকরণে এই দুর্গের নাম রাখা হইয়াছিল 'ফোর্ট উইলিয়াম'। দুর্গটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। পর বৎসর, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক 'ফরমান' দ্বারা সম্রাট্ ফারুকশিয়ার কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার এবং বাংলা সুবায় জমি ক্রয় করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। এজন্য কোম্পানি বৎসরে ১০ হাজার পাউণ্ড সম্রাট্কে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ামের পত্তন

ফারুকশিয়ারের ফরমান (১৭১৭ খ্রীঃ)

পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বণিক ভিন্ন দিনেমার, অস্ট্রিয়ান (অস্ট্রিয়ার), সুইডিস্ (অর্থাৎ, সুইডেন দেশের) বণিকগণও এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এদেশে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া যায়।

অপরাপর ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Rivalry): অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইওরোপীয়গণ করমণ্ডল উপকূলের নামকরণ করিয়াছিল কর্ণাট। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধের সূত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী হিসাবে এই যুদ্ধে যোগদান করে। ইওরোপের এই যুদ্ধের জের টানিয়া ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যে সেই সময়ে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ) ছিল ইংরেজ বণিকদের প্রধান এবং সামরিকভাবে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কেন্দ্র। আর ফরাসীদের ছিল পণ্ডিচেরী। ইওরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রশ্ন ছাড়া সেই সময়কার দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাগণের দুর্বলতাও ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের অংশগ্রহণ

দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাগণ তাঁহাদের পারস্পরিক বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক সাহায্য গ্রহণে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ বিবদমান দক্ষিণ-ভারতীয় রাজাগণকে সাহায্য-সহায়তা দান করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে তথাকার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইঙ্গ-ফরাসী বণিকদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের অধীন। নিজাম আনোয়ার-উদ্দিনকে নূতন নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন (১৭৪৪ খ্রীঃ), কিন্তু দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব-পদ দাবি করিলেন। এই সূত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসীগণ বিবদমান দুই পক্ষের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ফলে কর্ণাটের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হইল। এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে এই-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ভারতবর্ষেও দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ)

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ্‌জা নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিজাম-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটের নবাব-পদ লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দিন রহিলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রহিলেন চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গ। দুপ্লে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ফরাসী শক্তি ও সাম্রাজ্য-সীমা বাড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গের পক্ষে যোগদান করিলেন। আর ইংরেজগণ যোগ দিল আনোয়ার-উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে। কর্ণাটের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীগণ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি মেজর লারেন্সের তৎপরতায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, আর চাঁদা সাহেব পরাজিত হইয়া ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুপ্লের সাহস, সমরকুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে পুনরায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ জয়যুক্ত হইল। চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী

হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব : কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪ খ্রীঃ)

ফরাসী প্রাধান্য



যোসেফ দুপ্লে

আর্কটে নবাব-পদে স্থাপিত হইলেন। স্বভাবতই এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে দুপ্লের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ফলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫০ খ্রীঃ)। অল্পকালের মধ্যে বিদ্রোহীদের হস্তে মুজফ্‌ফর জঙ্গ প্রাণ হারাইলে নিজাম-উল্-মুলকের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গ নিজাম হইলেন (১৭৫১ খ্রীঃ)। ফরাসী সেনাপতি বুসী সসৈন্যে হায়দরাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যদের ব্যয়নির্বাহের জন্য করমণ্ডল উপকূলের পাঁচটি সমৃদ্ধ জেলার ("উত্তর সরকার" বা প্রদেশ) রাজস্ব সংগ্রহের ভার দিয়া নিজাম একটি অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৭৫৩ খ্রীঃ)।

আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি তখনও ত্রিচিনপল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি চাঁদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া লইবেন। কিন্তু ফরাসী সাহায্য-পুষ্ট চাঁদা সাহেব তখন এই শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইলেন না। ফলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল না।

মহম্মদ আলি কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব

ত্রিচিনপল্লী ছিল সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফরাসী সৈন্য এই স্থানটি অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ গভর্ণর সণ্ডার্স মহম্মদ আলিকে সামরিক সাহায্যদানে ত্রুটি করিলেন না। সণ্ডার্স মারাঠাগণকে এবং তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাকে নিজ পক্ষে টানিলেন। সেই সময়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সমরকৌশল অনুসরণ করিয়া ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় করিতে সমর্থ হইল। ক্লাইভের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে চলিতে লাগিল।

রবার্ট ক্লাইভ—ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ

অর্ণি ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ক্লাইভের সমরকুশলতায় এবং মারাঠা, মহীশূর ও তাঞ্জোরের সাহায্যে বলীয়ান ইংরেজ বাহিনীকে দুপ্লে কোনভাবেই পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। রবার্ট ক্লাইভ দুপ্লে ও চাঁদা সাহেবের যুগ্ম বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ত্রিচিনপল্লী অধিকার করিলেন এবং মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্থলে ইংরেজ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুপ্লে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। পর বৎসর (১৭৫৫ খ্রীঃ) ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান

বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব : বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত (Anglo-French Conflict in Bengal : From Trade to Political Domination): মোগল সম্রাট্ ঔরংজেব

মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে বাংলাদেশের নবাবি একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্রাট্ আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশ মোগল প্রাধান্য ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিত। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ কেবল নামেমাত্রই মোগল সম্রাটের অধীন ছিল। কার্যত বাংলাদেশ স্বাধীনই ছিল। এমনকি, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ ফারুকশিয়ার ইংরেজগণকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার 'ফরমান' দান করিলে মুর্শিদকুলি খাঁ উহা অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৭১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁ বিহার ও উড়িষ্যা সরকার (প্রদেশ)-কে বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'বাংলা সুবা' নামকরণ করিলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইল বাংলা সুবার রাজধানী। পরবর্তী নবাবগণ—সুজা-উদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ প্রভৃতির আমলেও এই স্বাধীনতা অটুট ছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ

সুজা-উদ্দিন, সরফরাজ খাঁ

আলিবর্দী ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী নবাব। তিনি একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বণিকগণকে নিছক বণিক হিসাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার ভিন্ন অপর কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করা নিরাপদ নহে। কারণ, ইংরেজ বণিকদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। ইংরেজ বণিকদের নৌ-বলের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও সেই ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না, একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইংরেজদের প্রতি মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগদানে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না।

আলিবর্দী খাঁর শাসনদক্ষতা

তাঁহার দূরদর্শিতা

সিরাজ-উদ্-দৌলা, ১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ (Siraj-ud-dowla): আলিবর্দী খাঁ ছিলেন অপুত্রক। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান করিয়া যান। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসেটি বেগম। ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী। অপর কন্যা ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী। এই সকল নিকট-আত্মীয়ের পরিবারস্থ সকলেই বাংলার মসনদ লাভের আশা পোষণ করিতেন। এমতাবস্থায় মৃত্যুকালে আলিবর্দী খাঁ মির্জা মহম্মদকে, সাধারণ্যে পরিচিত সিরাজ-উদ্-দৌলাকে, বাংলার নবাব মনোনীত করিয়া গেলে তাঁহাদের আশা ভঙ্গ হইল। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে বাংলার ইংরেজ

সিরাজের মসনদ লাভ

তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

বণিকদের সহিত সিরাজ্-উদ্-দৌলার বিবাদ বাধিলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল।

সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মস্নদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করে। তাহারা চিরাচরিত প্রথা অমান্য করিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার মস্নদ লাভের কালে কোনপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করে নাই। তদুপরি নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রভৃত ধনরত্ন লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়া আসিলে ইংরেজগণ তাহাকে আশ্রয় দান করে। নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহারা কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়। এমন সময় ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে (১৭৫৬ খ্রীঃ) সেই সূত্রে বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারা নিজ নিজ বাণিজ্যকুঠির নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন, দুর্গ নির্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সিরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলে ফরাসী বণিকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তাহা অমান্য করিয়া নবাবের দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল।

সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষভাব

ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য

ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুগ্মভাবে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে একথা সিরাজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া আসিলেন। ইহাতে ইংরেজ বণিকদের টনক নড়িল। তাহারা সিরাজ-উদ্-দৌলার নিকট কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিল না। বাধ্য হইয়া সিরাজ তাহাদের কলিকাতাস্থ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে ফল্তা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন।

ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনয়ন—ইংরেজদের অনুশোচনা

সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা অধিকার (১৭৫৬ খ্রীঃ)


সিরাজ-উদ্-দৌলা

সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম—অর্থাৎ কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছে এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্সনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য ও একটি নৌ-বহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইল। ক্লাইভ ও ওয়াট্সন সহজেই কলিকাতা পুনর্দখল করিলেন। সিরাজ পুনরায় কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটে কাশীপুর

ক্লাইভ ও ওয়াট্সন কর্তৃক কলিকাতা পুনর্দখল

নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রবার্ট ক্লাইভ তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইলে উভয়-পক্ষে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সিরাজ ইংরেজ কোম্পানিকে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইলেন।

আলিনগরের সন্ধি

আলিনগরের সন্ধি দ্বারা সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে কিন্তু মিত্রতা স্থাপিত হইল না। ক্লাইভ সেই সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। আলিবর্দী খাঁর ভগিনীপতি মিরজাফর সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিরজাফর ছিলেন সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রধান সেনাপতি। তিনি মুর্শিদাবাদের অর্থলোভী শেঠ সম্প্রদায়, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে নিজ দলে টানিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রবার্ট ক্লাইভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার বাধাদান সত্ত্বে ইওরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার ভবিষ্যতে যুঝিবার সুযোগ ইহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগর অধিকার

তারপর সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। মিরজাফর ও রায়দুর্লভ ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। মিরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রবার্ট ক্লাইভের সেনাবাহিনীর সহিত যুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমরকুশলতায় ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি নিকটবর্তী আম্রকাননে নিজ সৈন্যদলকে অপসারিত করিলেন। সেই সময়ে মিরমদনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নবাব পক্ষের যাবতীয় দায়িত্ব পড়িল মোহনলালের উপর। মোহনলাল বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। মিরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ্-দৌলা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে দেশরক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মিরজাফর মুখে নবাবের প্রতি আনুগত্যের ভান করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সিরাজ তখন মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মিরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী মোহনলালকে যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে সেই আদেশ পালনে রাজী হইলেন না, কারণ যুদ্ধ তখন নবাবী সৈন্যদের অনুকূলেই চলিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাবের আদেশ তাঁহাকে মানিতেই হইল। এইভাবে যুদ্ধে যখন পরাজয় নিশ্চিত তখন

পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)

মিরমদন ও মোহনলালের বীরত্ব

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ জয়লাভ করিলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা ভাগলপুরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মঁসিয়ে ল'-এর সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে বিহারের দিকে গোপনে পলায়ন করিলেন। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। মিরজাফরের আদেশে তাঁহার পুত্র মিরণ সিরাজকে হত্যা করাইলেন।

সিরাজের পলায়ন

পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রবার্ট ক্লাইভের সহায়তার বিনিময়ে তিনি এত বেশী পরিমাণ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ অর্থ তখন নবাবী খাজাঞ্চিখানায় ছিল না। তদুপরি ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইংরেজদের নিকট তাঁহার দেনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিরজাফর এই সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহায্যের পুরস্কার মিটাইবার জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ-পরগণার জমিদারি দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ঋণ শোধ হইল না। এমনকি, নবাবী আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও মিরজাফর ইংরেজদের ঋণ সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁহার কর্মসচিবগণ প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের শাসনকে আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব সেই সময় হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

মিরজাফরের মসনদ লাভ

বাংলার ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল, সাধারণ্যে এই কথাই প্রচলিত। কিন্তু একথা বলা ভুল হইবে, কারণ পরবর্তীকালে মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গুর্গিন খাঁ, মার্কার ও সামরুর সাহায্যে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্যবাহিনীকে শিখাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কাজ মিরকাশিমের স্বাধীনতার পরিচায়ক। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের নবাবের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা লোকের পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন ইংরেজদের তাঁবেদার। কিন্তু মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজিত হইলে এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা বাংলা সুবার মসনদের পশ্চাতে পরোক্ষ শক্তি (Power behind the throne)-তে

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ

পরিণত হইয়াছিল। তাহারা King-makers হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইবার পথ প্রস্তুত হইল।

ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সূত্রে যখন বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেই সময়ে কর্ণাট অঞ্চলেও পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পণ্ডিচেরী, মাহে, জিঞ্জি প্রভৃতি ফরাসী-অধিকৃত স্থানের পতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ফরাসীগণ তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি ফিরিয়া পায় বটে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই এগুলি ব্যবহার করা চলিবে এই প্রতিশ্রুতি ফরাসী সরকারকে দিতে হয়। এইভাবে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ প্রাধান্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

(Expansion of British Power in India)

রবার্ট ক্লাইভ (১৭৫৮-৬০ খ্রীঃ): সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিয়া রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে নবাব-পদে বসাইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মত হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও অধিককাল ইংরেজদের তাঁবেদারি করা সম্ভব হইল না। তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। এইবার মিরজাফরকে মসনদ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব-পদে স্থাপন করা হইল। এজন্য ইংরেজগণ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি পাইল। নবাব পরিবর্তন করা ইংরেজদের এক অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

ক্লাইভ ও মিরজাফর

মিরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা দূরদর্শী রাজনীতিক। ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং নিজ সেনাবাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণ তাহাদের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে চালান দিতে পারিত। এজন্য 'দস্তক' নামে একপ্রকার ছাড়পত্র দেখাইলেই চলিত। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণ এই সকল ছাড়পত্র দেখাইয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য মালপত্র একস্থান হইতে অন্যত্র বিনা শুল্কে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত এবং অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, দেশীয় বণিকগণ ঘাটে ঘাটে শুল্ক দিয়া ইংরেজ

মিরকাশিম ও ইংরেজগণ

কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। মিরকাশিম ইংরেজ গভর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও যখন কোন প্রতিকার পাইলেন না তখন নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশীয় বণিকদের মাল চলাচলের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন ইহাতে রুষ্ট হইয়া পাটনার ইংরেজ কুঠির এলিস সাহেব পাটনা দখল করিলে মিরকাশিম বাধ্য হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি পাটনা শহরটি পুনর্দখল করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি ভাঙিয়া দিলেন। এই সূত্রে ইংরেজদের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালা—এই তিনটি যুদ্ধে পর পর পরাজিত হইয়া মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের (১৭৫৯-১৮০৪ খ্রীঃ) সাহায্য লইয়া বক্সারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এবারও তাঁহার পরাজয় ঘটিল। সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ্ আলম ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)

ইংরেজগণ মিরকাশিমের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে মসনদে বসাইবার ভুল বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকেই পুনরায় মসনদে বসাইল (১৭৬৪ খ্রীঃ)। এক বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নজম-উদ্-দৌলাকে নবাব-পদে স্থাপন করিয়া ইংরেজগণ প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কেবল নামেমাত্রই নবাব রহিলেন, প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত হইল। এইভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইলে তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, কোম্পানির শাসনে দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল, কোম্পানির স্বার্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠাইল। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ড ক্লাইভ হইয়াছিলেন।

বাংলার নবাব নামেমাত্র নবাব



রবার্ট ক্লাইভ

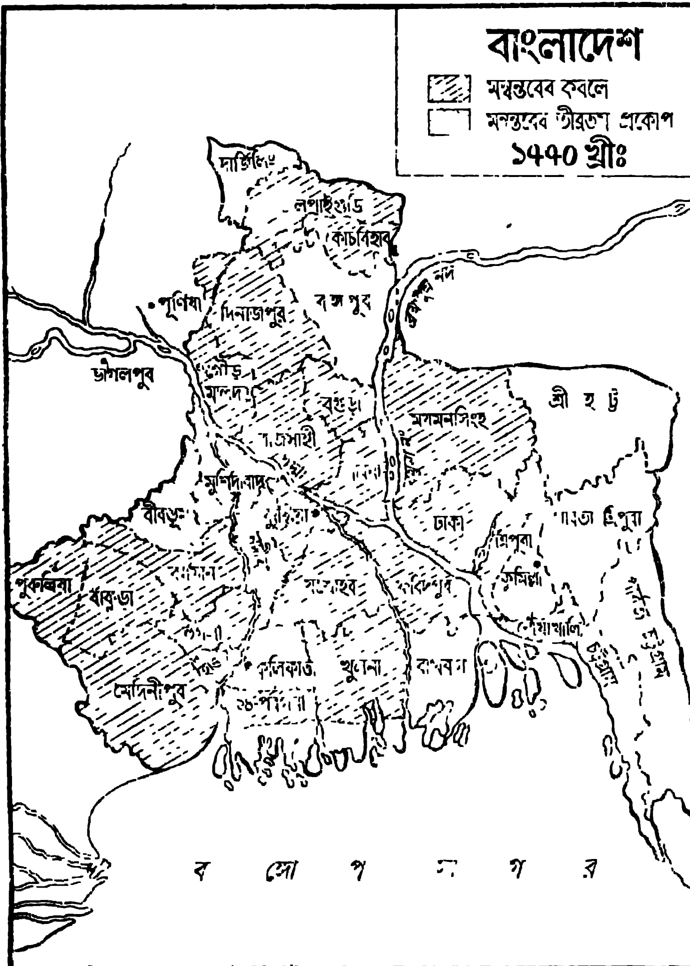
বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম তখনও দিল্লীতে প্রবেশ করিবার সাহস পাইতেছিলেন না। তাঁহার পিতার হত্যার পর তিনি একপ্রকার রাজ্যহীন অবস্থায়ই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ক্লাইভ তাঁহাকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দিয়া দিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)।

কোম্পানির দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ খ্রীঃ) ইংরেজদের অধিকার আইনত স্বীকৃত

ইহার অর্থ ছিল এই যে, রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানির উপর বর্তাইয়াছিল। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানি আইনত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা পাইল। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে দেওয়ানী লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বৎসরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবার বিনিময়ে রাজস্বের উপর তাঁহার সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন।

ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন' ব্যবস্থা

ফলে বাংলার নবাব ইংরেজ কোম্পানির ভাতাভোগী হইয়া পড়িলেন। ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নবাবের উপরই পূর্ববৎ রাখিয়া দিলেন, অথচ রাজস্বের উপর অধিকার নিজের হাতে রাখিলেন। এই ব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' (Double Government) নামে পরিচিত। ইহার ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর ইংরেজদের হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা রহিল।



এইভাবে ক্ষমতাহীন নবাবের পক্ষে প্রশাসন চালান সম্ভব হইল না, আর ইংরেজগণ শাসন অপেক্ষা শোষণ অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের উপর জোর দিতে লাগিল। এরূপ পরিস্থিতিতে অজন্মার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকার সেনাবাহিনীর জন্য শস্য কিনিয়া রাখিলেন। ইংরেজগণ নিজেদের পক্ষে দুইজন সহকারী নবাব নিয়োগ করিয়াছিলেন : একজন বাংলাদেশে—নাম রেজা খাঁ, অপরজন বিহারে নাম সীতাব রায়। রেজা খাঁ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্যের দাম বেশী হওয়ায় লাভের আশায় প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত করিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সরকার এ-ব্যাপারে কোন কিছুই করিলেন না। দুর্ভিক্ষের বৎসরও রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করা হইতে লাগিল। দ্বৈত শাসনের কুফল এইভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় খাদ্যাভাবে অসংখ্য লোকের মৃত্যুতে প্রকট হইয়া উঠিল (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ)।

দ্বৈত শাসনের কুফল

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণহানি

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) ও কর্ণওয়ালিসের (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার: ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলার গভর্ণর হইয়া আসিয়া প্রথমেই উপলব্ধি করিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই শক্তিকে সুদৃঢ় করিবার এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে স্থায়িত্বদানের জন্য ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজগণ মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের নিজামকে সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এজন্য অবশ্য তাহারা উত্তর-সরকার নিজামের নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হইল তখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল. উপরন্তু হায়দর আলি মাদ্রাজ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিল হায়দর আলির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল (১৭৬৯ খ্রীঃ)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল এবং কোন পক্ষকে অপর কোন শক্তি আক্রমণ করিলে উভয়ে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে; স্থির হইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু দুই বৎসর পর ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ তাহাদের ১৭৬৯

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ


ওয়ারেন হেস্টিংস্

খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া হায়দর আলির সাহায্যে অগ্রসর হইল না। ফলে হায়দর আলি ইংরেজদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানা ফড়নবিশ নিহত পেশওয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাধবরাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পেশওয়া-পদ লাভের জন্য তিনিই নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে যোগদান করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের প্রথমদিকে তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির হস্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পরাজিত হইল। তাহারা ওয়াড়গাঁওয়ের সন্ধি দ্বারা যাবতীয় বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিতে এবং রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তি ইংরেজদের মর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই চুক্তির শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মারাঠা নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে পেশওয়া ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নানা ফড়নবিশের সমর্থনে দাঁড়াইলেন। এমন সময় হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারাঠা, মহীশূর ও নিজাম এই তিনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁহার অসাধারণ কর্মকুশলতা, অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতা দ্বারা এই সংকট হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজগণ তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ না হইলে মাহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবাইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইংরেজগণ দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রঘুনাথ রাওকে বাৎসরিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইংরেজগণ অবশ্য সলসেট্ নিজ অধিকারেই রাখিতে পাইল।

সলবাইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ)

এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটিল। সলবাইয়ের সন্ধি মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের শক্তি ও সুযোগ বাড়াইয়া দিল। মারাঠাগণ হায়দর আলি কর্তৃক ইংরেজদের নিকট হইতে বিজিত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এইভাবে কূটকৌশলে ইংরেজগণ ভারতীয় শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিল।

এদিকে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বন্দর মাহে ইংরেজগণ দখল করিলে হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। তিনি কর্ণাট আক্রমণ করিলেন এবং উহা দখল করিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস্ কূটকৌশলে নিজাম ও সিন্ধিয়াকে হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু হায়দর আলি ইহাতেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টোনভোর যুদ্ধে স্যার্ আয়ার কুটের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। নেগাপত্তম,

ত্রিংকোমালি প্রভৃতি স্থানও ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু হায়দরের পুত্র টিপু ব্রিটিশ বাহিনীকে তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত করিলেন। হায়দর আলি ফরাসী সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং এক ফরাসী নৌ-বহর দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে হায়দরের আশা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ফরাসী সাহায্যলাভের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৭৮২ খ্রীঃ)। হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তিন বৎসর পর্যন্ত কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ না হইলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি মহীশূর রাজ্য ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘটাইলেও ইহাতে দুই পক্ষের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইল না। ইংরেজগণ টিপুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু ছিল। মহীশূর রাজ্য সেই সময়ে দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। দক্ষিণ-ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহীশূর রাজ্যের পতন ইংরেজদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে, টিপু সুলতান ইংরেজদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪ খ্রীঃ)



হায়দর আলি

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর সহিত ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। টিপু অসাধারণ সাহস ও অনমনীয় দেশাত্মবোধ লইয়া ইংরেজদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। ইহা ছিল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্থলে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা, নিজাম, কুর্গ ও ত্রিবাংকুরের রাজাগণের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া টিপুকে সম্পূর্ণ এককভাবে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিলেন। টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দেশীয় রাজাগণের দেশাত্মবোধের অভাব হেতু তাঁহারা বিদেশীদের পক্ষগ্রহণেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধিতে টিপু নিজ রাজ্যের অধিকাংশ এবং তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর রাজ্যের প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং সেই স্থলে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৯৮-১৮০৩ খ্রীঃ) : ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিল লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমলে। ওয়েলেস্‌লী যখন গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন সেই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া প্রায় সকল মহাদেশেই এক জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতান সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধি মানিয়া চলিতে স্বভাবতই রাজী ছিলেন না। তিনি সাহায্যলাভের জন্য বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী সংঘ স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবুলের জামান শাহের নিকট টিপু ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ওয়েলেস্‌লীকে এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ফরাসীগণ যাহাতে ভারতবর্ষে শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য ভারতবর্ষের রাজাগণের মধ্যে যাঁহারা ফরাসীদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করিতেন তাঁহাদিগকে দমন করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

টিপু সুলতান ও ইংরেজদের পারস্পরিক বিদ্বেষ

ওয়েলেস্‌লীর পূর্ববর্তী গভর্ণর-জেনারেলদের কার্যকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল বিজিত রাজ্যের উপর নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করা এবং কোন প্রকার ঝুঁকি না লইয়া সাম্রাজ্য প্রসার সম্ভব হইলে তাহা করা। ভারতবর্ষের রাজশক্তিগুলি যাহাতে বিরোধী না হইয়া উঠে সেদিকেও নজর রাখা ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। কিন্তু ওয়েলেস্‌লী আসিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতীয় রাজাগণের মধ্যে যত জনকে সম্ভব ব্রিটিশ অধীনে আনিতে হইবে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ওয়েলেস্‌লীর ভারতবর্ষ আগমনের পূর্বেই মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যের শক্তি প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ব্রিটিশ শক্তির প্রসারের খুবই অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিগণও তাহাদের নিজ স্বার্থে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ চাহিয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের অর্থই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগবৃদ্ধি।



লর্ড ওয়েলেস্‌লী

ওয়েলেস্‌লীর রাজ্য-বিস্তার নীতি

উপরি-উক্ত নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেস্‌লী 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র মাধ্যমে ও যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ এবং পূর্বে যে-সকল রাজা বা নবাবের রাজ্য ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে মনোযোগী হইলেন। সেই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ভারতীয় নৃপতিগণের প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী এই সুযোগ হারাইতে চাহিলেন না। তিনি তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি (Subsidiary Alliance) প্রচলন করিলেন। যে-সকল দেশীয় নৃপতি অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সহিত স্বাক্ষর করিতেন বহিরাক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষার ভার কোম্পানি গ্রহণ করিত। সেজন্য কোম্পানিকে তাঁহাদের রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইত অথবা সেজন্য ব্যয় বহন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন, এই সকল নৃপতি ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এই সকল চুক্তিবদ্ধ নৃপতি নিজেদের সেনাবাহিনী রাখিতে পারিতেন, কিন্তু উহার পরিচালনার ভার একজন ইংরেজ সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিতে হইত। 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র চুক্তির নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই মিত্রতা চুক্তি যে-সকল দেশীয় নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইত। ইহা ভিন্ন, দেশরক্ষার ভার ইংরেজ কোম্পানির উপর ন্যস্ত হইলে উহার খরচ বাবদ চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণকে এত বেশী পরিমাণ অর্থ দিতে হইত যে, তাঁহাদের পক্ষে আর নিজেদের সৈন্যবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইত না। এই সকল কর্মচ্যুত সৈনিকের অনেকে পিণ্ডারী নামক দস্যু দলে যোগদান করিত। অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি দেশীয় নৃপতিদের অর্থে তাহাদের বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়-সংকুলান করিত।

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির ফলে ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ

হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথমে ইংরেজ কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিতে তিনি কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন সৈনিকের খরচ বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সেনাবাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য নবাবকে রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল—অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। নানা ফড়নবিশ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন ওয়েলেস্‌লী মারাঠাদিগকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণের বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলত রাও সিন্ধিয়া সকলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য

নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিবদ্ধ

ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া যুগ্মভাবে পুনা আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজী রাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন এবং ব্যাসিনের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। ইংরেজ সাহায্য লইয়া দ্বিতীয় বাজী রাও পুনা পুনরধিকার করিয়া পেশওয়া-পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরেজদের পদলেহন সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহ্য হইল না। তাঁহারা ব্যাসিনের চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া পেশওয়াতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই চেষ্টায় যোগদান করিলেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত সিন্ধিয়া ও

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ভোঁসলের যুগ্ম বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে পরিচিত। অসইয়ের যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হইলেন। সিন্ধিয়া

ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিলেন না। ভোঁসলে একাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়াড়গাঁওয়ের যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেও তিনি তখনও অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হন না। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং সুরেষ-অঞ্জনগাঁওয়ের চুক্তি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং মারাঠা শক্তি চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়িল।

মারাঠাদের অধীনতা-মূলক মিত্রতা গ্রহণ

কর্ণাটের নবাব নামেমাত্রই নবাব ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তেই ছিল। ওয়েলেসলী তাঁহাকে নবাব-পদ হইতে সরাইয়া দিয়া তাঁহার রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে পেনশন বা ভাতা দানের ব্যবস্থা করিলেন। অনুরূপ, তাঞ্জোর এবং সুরাটের রাজাগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের রাজ্য দখল করিয়া লইলেন।

কর্ণাট, তাঞ্জোর ও সুরাট অধিকার

টিপু সুলতান ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। টিপু ফরাসী সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এই অভিযোগে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলী টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। টিপু ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সাহসী বীরপুরুষ। ইংরেজদের পেনশনভোগী রাজা বা নবাবের ন্যায় বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তম—অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করিতে গিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। টিপুর রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজগণ দখল করিল, ইংরেজদের তাঁবেদার মিত্র নিজাম কতকাংশ পাইলেন। মারাঠাগণ মহীশূরের কোন অংশ গ্রহণে রাজী হইল না। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশে হায়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশকে উৎখাত করিয়া মহীশূর রাজ্য দখল করিয়াছিলেন সেই বংশের একজন উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। এইভাবে ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ: টিপুর পতন দাক্ষিণাত্যে ইংরেজগণ নিরঙ্কুশ

ভরতপুরের রাজা ও হোলকারের যুগ্ম বাহিনী দিল্লী অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ বাহিনীর সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিল। ভরতপুরের রাজা ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া লইলেন। মিত্রহীন হোলকারের বিরুদ্ধে যখন ওয়েলেসলী প্রস্তুত হইতে-ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ওয়েলেসলীর চেষ্টায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

ভরতপুর অধিকার

লর্ড হেস্টিংস্ (লর্ড ময়রা) (১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) ও ডালহৌসীর (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির

প্রসার : লর্ড হেস্টিংস্ ও লর্ড ওয়েলেস্লীর শাসনকালের অন্তর্বর্তী সময়ে যে-সকল গভর্ণর-জেনারেল ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানত শান্তিনীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার তখন ঘটে নাই। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস্ (লর্ড ময়রা) শাসনভার গ্রহণ করিলে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গোরক্ষপুর জেলাটি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে আসিলে কোম্পানির রাজ্যের উত্তর সীমা নেপালের দক্ষিণ সীমার সংলগ্ন হইয়া পড়ে। নেপালের গুর্খা বংশের রাজাগণ সেই সময়ে দক্ষিণ দিকে রাজ্যবিস্তার শুরু করিলে ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হয় (১৮১৪-১৬ খ্রীঃ)। ইহা গুর্খা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে সগৌলির সন্ধি (১৮১৬ খ্রীঃ) দ্বারা নেপালরাজ ইংরেজদিগকে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

গুর্খা যুদ্ধ : নৈনিতাল, আলমোড়া, মুসৌরী, সিমলা অধিকার

এদিকে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজ রেসিডেন্টের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া ইংরেজ প্রাধান্য-মুক্ত হইতে চাহিলেন। এজন্য তাঁহার মন্ত্রী ত্রিম্বকজী হোলকার-সিন্ধিয়া-ভোঁসলে-পেশওয়া মৈত্রী স্থাপনের গোপন আলোচনা শুরু করিলেন। অবশেষে এই মৈত্রী স্থাপিত হইলে পুনার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এলফিনস্টোনের আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। তিনি কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে পেশওয়া, ভোঁসলে এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ, ভোঁসলের রাজ্যের একাংশ এবং হোলকারের রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং ইংরেজ প্রাধান্যাধীনে আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত : ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত

সেই সময়ে মারাঠাদের আক্রমণে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পিন্ডারী দস্যুদের আক্রমণে সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস্ রাজপুত রাজ্যগুলির উপর মারাঠা প্রাধান্য খর্ব করিয়া রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনিলেন। এইভাবে মারাঠা ও রাজপুতদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়া গেলেন।

রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনয়ন

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সময় ছিল লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ) শিখ রাজমাতা ঝিন্দন দলীপ সিংহের অভিভাবিকা ছিলেন। শিখ সেনাবাহিনী খাল্সার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের শক্তিহ্রাসের উপায় হিসাবে তিনি তাহাদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন। ইহা অমৃতসরের চুক্তিবিরোধী ছিল। ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হইল। শিখগণ মুদকি, ফিরোজশাহ, আলিওয়াল ও সোব্রাওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশ্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পাঞ্জাবের শাসনকার্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ): পাঞ্জাবে ইংরেজ প্রভাব

ব্রিটিশ রেসিডেন্টের তাঁবেদার হিসাবে শাসন চালানো শিখদের পক্ষে দীর্ঘ দিন সহ্য হইল না। তাঁহার ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া শিখ বাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। লর্ড ডালহৌসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিলেন। ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ): পাঞ্জাব দখল

ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাধিয়াছিল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী জয়ী হইলে ব্রহ্মের রাজা পগিদোয়া যান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন (১৮২৬ খ্রীঃ)। ফলে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে তিনি বাধ্য হন। ব্রহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ডালহৌসীর শাসনকালে ব্রহ্মদেশের ব্রিটিশ রেসিডেন্টের ঔদ্ধত্যে এক তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে, ফলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে সেই সূত্রে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। পেগু ব্রিটিশদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসে। ডালহৌসীর আমলে সিকিম রাজ্যের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ: পেগু অধিকার


লর্ড ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারাও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ দ্বারা যে-পরিমাণ রাজ্য তিনি অধিকার করিয়াছিলেন সমপরিমাণ রাজ্য এই নীতির প্রয়োগের ফলে তাঁহার হস্তগত

হইয়াছিল। ব্রিটিশের অধীনে বা ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে গঠিত কোন রাজ্যের রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসিবে, কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া সেই রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া চলিবে না, এই ছিল স্বত্ববিলোপ-নীতির মর্মার্থ। লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে ভাগ্যচক্রে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যেরই রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন। ইহাতে লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাতারা রাজ্য, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য এই নীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভগৎ, কারাউলি ও উদয়পুর রাজ্যগুলি প্রথমে অধিকার করিয়া পরে অবৈধতার কারণে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের ভাতা ডালহৌসী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজাগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া এই দুইটি রাজ্যও ডালহৌসী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ ভিন্ন অরাজকতার অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে না পারিলে তাঁহার নিকট হইতে বেরার প্রদেশটি তিনি আদায় করিয়া লইলেন। এইভাবে এক বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষে গড়িয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

ভারতবর্ষে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান

চতুর্দশ অধ্যায়

(১) ওয়ারেন হেস্টিংস্, কর্ণওয়ালিস, বেন্টিঙ্ক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কারকার্যাদি

(Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon)

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ): ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কতক কতক সংস্কার চালু করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন, ভারতবর্ষে ইংরেজ কোম্পানির সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী যথা গভর্ণর এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হইবার পর গভর্ণর-জেনারেলের ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কি ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা—সবকিছু তাঁহাদের সংস্কার নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ওয়ারেন হেস্টিংস্ যখন বাংলাদেশের গভর্ণর হইয়া আসিলেন (১৭৭২ খ্রীঃ)* তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের এক সংকটকাল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের কুফল কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় প্রকটিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ওয়ারেন হেস্টিংস্ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি দ্বৈত শাসন বাতিল করিয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার কালেক্টর নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) নামেএকটি কমিটি গঠন করিয়া তিনি উহার উপর জমি বন্দোবস্ত দিবার ভার দিলেন। রাজস্বসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ এবং সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি রেভিনিউ বোর্ড (Board of Revenue) বা রাজস্ব বোর্ড গঠন করিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ব্যবস্থা তাঁহার নিজের এবং ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকরী হয় নাই। যে-সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে প্রস্তুত হইত তাহাদিগকেই জমি বন্দোবস্ত দিবার ফলে বহু অনভিজ্ঞ লোকও অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমিদারি লইত এবং প্রজাবর্গের উপর চরম অত্যাচার করিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিত। এই ব্যবস্থার ত্রুটি অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ পাইল। হেস্টিংস্ ইহার পর রাজস্ব ব্যবস্থার নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন। এইভাবে রাজস্ব ব্যবস্থার উপর পরীক্ষা চলিতে লাগিল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব-সংস্কার ও রাজস্ব ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা

মোগল শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব বিভাগ—অর্থাৎ দেওয়ানীর উপর জমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার ছিল। আর ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল নবাবের উপর। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলে কিছুকাল দেওয়ানী বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেওয়ানীর ভার সরাসরি গ্রহণ করিলে দেওয়ানী বিচারের ভারও কোম্পানিকে লইতে হইল। তিনি বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ লইয়া ফৌজদারী বিচারের ভারও কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনিপ্রতি জেলায় একটি করিয়া মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করিয়া সেগুলির উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করিলেন। অবশ্য ফৌজদারী মামলায় প্রাণদণ্ডের আদেশ নবাবের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলাদেশের বিচারক্ষমতা ইংরেজকোম্পানির হাতেলইয়া আসিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

* ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মাদির উপর কতক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ করে। ইহার অন্যতম শর্ত ছিল বাংলার গভর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেল পদে উন্নীত করা এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দান করা। ওয়ারেন হেস্টিংস্ সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন।

হিন্দুদের বিচারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানদের বিচারে কোরান ও হদিসের বিধি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। জরিমানার পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক না হয় এবং সুদের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস করা হয়, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ): লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসনে দুর্নীতি দূর করিবার এবং শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত করিবার দায়িত্ব লইয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের অবৈধ উপার্জনের পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অবশ্য ভারতীয়দের উপর কোন প্রকার শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোম্পানির কর্মচারিগণের সততা ও আনুগত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া তিনি কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে সুদক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষের সিভিল সার্ভিসের (I.C S) গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিতে গিয়া তিনি দেশীয় জমিদারদের পুলিশী ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক-একটি এলাকায় এক-এক জন দারোগা নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে কোম্পানির কর্মচারিগণ দেশীয় দালালদের নিকট হইতে কোম্পানির জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ হইত। কর্ণওয়ালিস সরাসরি দালালদের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানির আয় প্রচুর বাড়াইয়াছিলেন।

কর্মচারীদের দুর্নীতি দূরীকরণের ব্যবস্থা

পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার

কোম্পানির বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার

কর্ণওয়ালিস ওয়ারেন হেস্টিংস্-প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিলেন। সদর নিজামত আদালত ছিল মুর্শিদাবাদে অবস্থিত, তিনি উহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন উহার সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত। কর্ণওয়ালিস সেই ভার গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন, উহার অধীনে চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করিলেন এবং বিচারকগণ দেশের বিভিন্নাংশে উপস্থিত হইয়া যাহাতে বিচারকার্যাদি সম্পাদন করিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্বেকার দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং সাক্ষ্য গ্রহণের রীতি পরিবর্তন প্রভৃতি করিয়া তিনি বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগ হইতে তিনি দেওয়ানী বিচারালয়কে পৃথক করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রাদেশিক বিচারালয়, জেলা বিচারালয়, সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় স্থাপন করিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারক্ষমতা বাতিল করিয়া দিয়া কেবল শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তাঁহার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পূর্বে কোম্পানি পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে আবার এক বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাতে যাহারা জমিদারি গ্রহণ করিত তাহারা

জমির উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকিত। কারণ তাহাদের হাতে জমিদারি সব সময় থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পক্ষান্তরে, কোম্পানির বৎসরে মোটামুটি কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইবে সেই সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা না পাওয়ায় বাজেট প্রস্তুত করিতে অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এজন্য তিনি প্রথমে দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ এবং অপগুণ উভয়ই ছিল। রায়তদের উচ্ছেদ, অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কিছুকালের মধ্যে এই ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে প্রকাশ পাইল। ইহা ভিন্ন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দাম বৃদ্ধি পাইলেও সরকার রাজস্ব বাড়াইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। অবশ্য জমিদারগণের অনেকে জমির উন্নয়ন, প্রজাবর্গকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কালে সাহায্যদান, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়স্থাপন, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে গুণ অপেক্ষা দোষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটান হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রীঃ)

গুণ-অপগুণ

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ): প্রধানত সংস্কার কার্যাদির জন্যই লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রথমেই তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার কতক পরিবর্তন করিয়া কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে চীনে আফিং চালান হইত। তিনি আফিং ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়া কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিলেন। বিচার যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আপীল আদালত তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগ না করিবার নীতি বাতিল করিলেন এবং যে-সকল ভারতীয় বিচারক হিসাবে কাজ করিতেন তাঁহাদের বিচারক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নিয়ম তিনিই চালু করিয়াছিলেন।

রাজস্ব-সংস্কার

বিচারব্যবস্থার সংস্কার


লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক

সমাজ-সংস্কারের জন্যই বেণ্টিঙ্কের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এ-বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থন পাইয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা আকবর করিয়াছিলেন। বেণ্টিঙ্ক-এর পূর্বে বিভিন্ন গভর্নর-

সতীদাহ নিবারণ

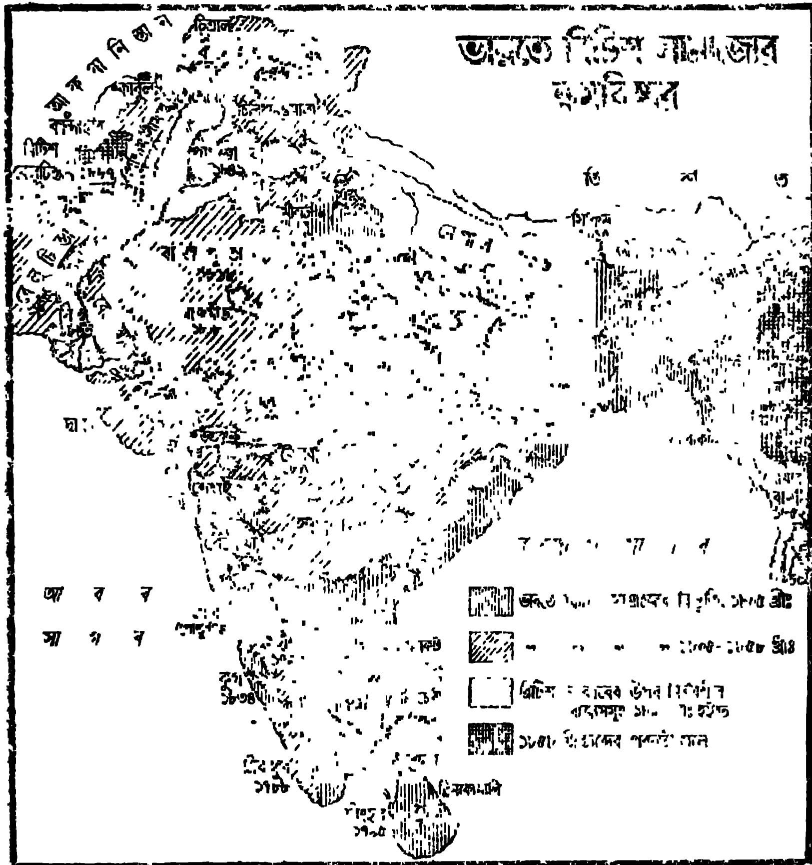
জেনারেলের আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করা হয়। ওয়েলেসলী সতীদাহ নিবারণে সদর নিজামত আদালতের বিচারকদের অভিমত চাহিয়াছিলেন; বিচারকগণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে সতীদাহ করিবার নীতি চালু রাখিবার পক্ষে অভিমত দেন। ফলে লর্ড মিণ্টো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ভিন্ন সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ইহার পর লর্ড হেস্টিংসের নিকট ডিরেক্টর সভা হইতে সতীদাহ নিবারণের পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ আসে। কিন্তু ইংরেজগণ ভারতীয়দের ধর্মীয় সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকেন। বেণ্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তিনি সেই নির্মম ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। তিনি ঠগী নামক দস্যুদের দমন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে বৎসরে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। এই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। রাজা রামমোহন এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয় করিবার জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট পূর্বে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন সেকথা বেণ্টিঙ্ক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে সেক্রেটারি প্রিন্সেপ সাহেব ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষপাতী আর গভর্ণর-জেনারেলের সভার আইনসদস্য লর্ড ম্যাকলে ছিলেন পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। বেণ্টিঙ্ক ম্যাকলের মত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫ খ্রীঃ) ও বোম্বাইয়ের এলফিন্স্টোন ইন্স্টিটিউশান স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়া তিনি ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শিক্ষা-সংস্কার

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) : লর্ড ডালহৌসী ভারত-ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রযোক্তা হিসাবেই সমধিক কুখ্যাত। কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও তাঁহার কম ছিল না। তিনি আভ্যন্তরীণ পরিবহণব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। রুড়কির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, কলিকাতা বেথুন কলেজের ব্যয়ভার বহন, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের আধুনিকীকরণ, গঙ্গার খাল খনন, 'মোরিয়া' নামক সমাজবিরোধীদের দমন, ভারতবর্ষের রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্ন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, ডাক চলাচল ও বিলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা, পাঞ্জাবে সামরিক চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বনসংরক্ষণ, চা-বাগানের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্যও তাঁহার কার্যকাল স্মরণীয়। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন কলেজের অনুপাতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যার অপ্রতুলতা প্রভৃতির অব্যবস্থা দূরীকরণের প্রয়াস, শিক্ষা পরিদর্শন সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ স্থাপন প্রভৃতির জন্য ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবার যোগ্য।

আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ

এই সূত্রে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ চার্লস্ উডের প্রতিবেদন (Wood's Dispatch) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই যুগে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত, অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইত। পক্ষান্তরে,



বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইত। চার্লস্ উডের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের নির্দেশ ছিল। শিক্ষার ভিত্তি রচনায় ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, বলা বাহুল্য। লর্ড ডালহৌসী উডের এই নির্দেশ পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, সরকারী সাহায্য দ্বারা হাই স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও উডের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার কাঠামোকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার প্রয়োজনীয়তাও এই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)।

উডের প্রতিবেদন (Wood's Dispatch)

লর্ড রিপন* (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ): লর্ড রিপনের শাসনকালে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল। এজন্য লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভার ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত করেন। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতির ভার তিনি লোক্যাল বোর্ড নামক প্রতিনিধিসভার হস্তে ন্যস্ত করেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া এবং শহরাঞ্চলে উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ভার ভারতীয়দের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্য, মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্থাকে তিনি অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য কর্তব্যকার্যে অবহেলা করিলে এই সকল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থাও তিনি রাখিয়াছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ভার ভারতীয়দের উপর ন্যস্তকরণ

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন; লর্ড রিপন দেশীয় পত্রিকাগুলির সেই অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় স্বীকৃত

শিক্ষার উন্নতির জন্য রিপন 'হাণ্টার কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অতি সামান্য মাত্রায় বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই সুপারিশ হাণ্টার কমিশন করিলে লর্ড রিপন উহা গ্রহণ করেন এবং সরকারী শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন।

হাণ্টার কমিশন

সেই সময়ে ভারতীয় বিচারপতিগণ ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। বিচারকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচার ক্ষমতার তারতম্য থাকা রিপন অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করিলেন। তিনি তাঁহার পরিষদের আইনসদস্য স্যার্ ইল্‌বার্টের উপর এই বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ভার দিলেন। ইওরোপীয় বিচারপতিগণ ইহা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়া ইল্‌বার্ট বিলের বিরোধিতা শুরু করিলেন। ভারতবর্ষের ইংরেজগণ "ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন" নামে এক সংস্থা স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই

বিচারব্যবস্থার সংস্কার: ইল্‌বার্ট বিল

* নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে লেখা আছে *History of India up to the Middle of the 19th Century* এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ পর্যন্ত উহা লিখিবার নির্দেশ আছে। অথচ ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের সংস্কার ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা হউক, সিলেবাসে যখন দেওয়া হইয়াছে সেজন্য রিপনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা দেওয়া হইল।

এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয়গণ এই বিলের সমর্থন করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেন। ভারতীয়দের নেতৃত্ব দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্দোলনের তীব্রতার ফলে লর্ড রিপন আইনের খসড়ার কতক পরিবর্তন করিলেন। এই পরিবর্তনের ফলে স্থির হইল যে, ভারতীয় বিচারকদের বিচারালয়ে ইওরোপীয়দের বিচার হইলে ইওরোপীয়গণ ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া জুরী গঠনের দাবি করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের বৈষম্য পূর্ণমাত্রায় দূরীভূত হইল না বটে, কিন্তু এই বিল লইয়া আন্দোলন করিতে গিয়া ভারতীয়গণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য কিভাবে আন্দোলন করিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে এই অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল।

লর্ড রিপন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়া প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী কালে আইন পাশ করা হইয়াছিল।

কারখানা আইন

তিনি একটি 'কারখানা আইন' পাশ করিয়া শিশু শ্রমিকদের মোট নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করানো নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে ঘেরিয়া রাখার এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তিনি অবাধ-বাণিজ্য নীতির প্রচলন করিয়া এবং লবণ, মদ ও অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপনের উদার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বাণিজ্যিক সংস্কার

(২) ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার

(Social, Cultural and Religious Reforms under Indian Initiative)

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সমগ্র ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক অন্তর্মুখিতা ও আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল। সংস্কৃতির ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া। আবদ্ধ জলে যেমন স্রোত আসে না বা জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, সেরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও কোন অগ্রগতি থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্ধকার যুগ

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেজন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে যে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ, আর তাহার ধারক ও বাহক ছিল

বাঙালী জাতি। আরব দেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ইতালিতে বিস্তার লাভ করিবার ফলে যেমন ইওরোপীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালি ও ইতালীয় জাতি যেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল ভারতবর্ষের রেনেসাঁস বা নবজাগরণে অনুরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের মুক্তি সাধন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন—সব দিক দিয়া এক ব্যাপক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময়কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম—সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ): ইওরোপীয় রেনেসাঁস যুগের ইতালির সহিত রেনেসাঁস যুগের—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। পেত্রার্ক, বোক্কাচো প্রভৃতি হিউম্যানিস্ট বা মানবধর্মী যেমন ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতবর্ষের নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন মানবধর্মী বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায়। মানবধর্মী বা হিউম্যানিস্ট-সুলভ অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারক-সুলভ মনোবল ও ঋষি-সুলভ প্রজ্ঞা লইয়া ভারত-পথিক (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্মানিত) রামমোহন এক যুগ-প্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাংলাদেশ—ইওরোপের ইতালি : রামমোহন হিউম্যানিস্ট



ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায়

শের শাহ্, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশাহের প্রভাবে হিন্দু ও ইসলামীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আংশিক সমন্বয় সাধিত হইলেও সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন এদেশে বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য—এই তিন প্রকার শিক্ষা, সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হইল। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই রাজা রামমোহন রায় এই তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়সাধক রামমোহন

রাজা রামমোহন রায় গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী, সীরীয় প্রভৃতি কোন ভাষার, বা হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম উপলব্ধি করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল জাতির সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে তাঁহার মনে এই সত্যটি প্রকট হইয়া উঠিল যে সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধানিষেধ কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্য নাই। এজন্য তিনি হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁহার এই আগ্রহের ফলেই ব্রাহ্ম সমাজের গোড়া-পত্তন হইল (১৮২৮ খ্রীঃ)। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে—শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সর্বত্র তিনি চাহিলেন এক নবযুগের, এক নূতন জীবনাদর্শের প্রবর্তন করিতে।

রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতবর্ষেও যাহাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেজন্য তিনি তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের যে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল তাহারই দাবি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক, ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রীঃ) ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কয়েকটি ইংরেজী শিক্ষার স্কুল এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরে (১৮৫৫ খ্রীঃ) ইহাই প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে। ডেভিড্ হেয়ার বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করিয়া ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্কটিশ ধর্মযাজক আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কলিকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ ইন্স্টিটিউশান' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজই হইল আলেকজাণ্ডার ডাফ্-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রূপ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা

লর্ড আমহার্স্টের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের আবেদন ও প্রতিবাদ

ডেভিড্ হেয়ার: হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা

আলেকজাণ্ডার ডাফ্

রাজা রামমোহন রায় কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণ, নারী জাতির

ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁহার সাহায্য ও সহায়তা না থাকিলে লর্ড বেণ্টিংক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দু বিধবাদের পুনঃ-বিবাহ, তাঁহাদিগকে সম্পত্তির অংশদান প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যের জন্য চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত মনের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বহুমুখী মনীষা

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত

এককথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকৃত উদ্যোক্তা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় যে-চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছিল। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে রামমোহনকে বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রবর্তক তথা ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে।

ডি'রোজিও (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) ও ইয়ং বেঙ্গল: রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) ও 'ইয়ং বোম্বে' (Young Bombay) ভারতীয় সমাজ-জীবনের পুরাতন সবকিছুরই পরিবর্তনসাধন করিয়া, সবকিছু ভাঙিয়া-চুরিয়া এক নূতন রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীনকে ভাঙিবার চেষ্টায় বিশেষভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' তদানীন্তন হিন্দু সমাজকে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক আঘাত হানিয়াছিল, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাঙালী জাতির জড়তা দূরীভূত হইয়া নবজাগরণের বিস্তৃতির পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও প্রভৃতির অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও ছিলেন একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শিক্ষান্তে তিনি হিন্দু কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ন বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সমতার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে সমসাময়িক কালের সমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে স্থাপন করিয়াছিল। ডি'রোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি এবং তাঁহার অনুগামীরা রামমোহন রায়

'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং বোম্বে'

ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও



ডি'রোজিও

ডি'রোজিওর চিন্তাধারা

বিপ্লবের ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা, যুক্তিবাদে তাঁহার বিশ্বাস, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানুষ মাত্রেরই সমতা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমিকে পরিণত করিয়াছিল। ছাত্রদের উপর তিনি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র (Derozian boys) তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁহার উপর তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ডি'রোজিওর অতি-উদার মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। ডি'রোজিওকে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কবি বলা ভুল হইবে না। তিনি মাতৃভূমির স্তুতি করিয়া ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি-উদার মতবাদের জন্য তাঁহাকে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার সামান্য দিনের মধ্যেই মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ডি'রোজিও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ডি'রোজিয়ানদের আন্দোলন

ডি'রোজিও ও তাঁহার অনুগামিগণ দেশের প্রচলিত প্রাচীন রীতি-নীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য সবকিছুর কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী-জাতির সামাজিক অধিকার, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতির জন্য তাঁহারা সোচ্চার ছিলেন। সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভাসমিতির মাধ্যমে ডি'রোজিয়ানগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সমাজের ধ্যান-ধারণার পক্ষে তাঁহাদের মতবাদ অত্যধিক অগ্রসর ছিল বলিয়া তাঁহাদের প্রচার কোন প্রকৃত আন্দোলনের রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের প্রচারকার্যাদি কতকটা কেতাবী ধরনের ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কোম্পানির চার্টার এ্যাক্টের পরিবর্তন, জুরীর সাহায্যে বিচার, জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করা, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী কর্মচারী পদে নিয়োগ প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নতিমূলক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিবার মত অগ্রসরতা তখনকার সমাজের ছিল না এজন্য তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বাংলাদেশের আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির পথিকৃৎ ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

ব্রাহ্ম সমাজ: রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের অসার, আনুষ্ঠানিক দিকটা বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে কুসংস্কারমুক্ত এবং একেশ্বরবাদী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত 'আত্মীয় সভা' পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা বলা যাইতে পারে। সার্বজনীনত্বই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূল কথা। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক ছিল একথা মনে করা ভুল হইবে। বস্তুত মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ' (Brahmin of the

রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্মধর্মের প্রচার

Brahmins)। তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্ট ধর্মমতের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্ম রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, রামমোহনের আরব্ধ কার্য পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ) সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬ খ্রীঃ) নেতৃত্বে বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুরু হইল। যুক্তিবাদের মাধ্যমে সবকিছু বিচার করিয়া দেখিবার এক প্রবণতা দেখা দিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিল। অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। কেশব সেনই ব্রাহ্ম ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রগতিশীল সংস্কার নীতির সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাল রাখিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বহিষ্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

কেশবচন্দ্র যীশু খ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ্‌প্রেম ব্রাহ্ম ধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সংকীর্তনের অনুকরণে ব্রাহ্ম সমাজেও সংকীর্তন চালু করিলেন। এইভাবে তিনি যীশুবাদ ও চৈতন্যবাদের সংমিশ্রণ সাধন করিলেন। চৈতন্যবাদের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজেও ভক্তিবাদের বিস্তার ঘটিল। ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগতিশীল দলের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে অত্যধিক উদার মতবাদ কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপূত হইল না। পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রী-জাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—এই ছিল কেশব সেনের ধারণা। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা কন্যাকে কোচবিহারের হিন্দু মহারাজের সহিত বিবাহ দিলে প্রগতিপন্থিগণ তাঁহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' ও 'নববিধান'



কেশবচন্দ্র সেন

এক নূতন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজ নববিধান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দাবি উত্থাপন করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত সমাজ-সংস্কারের দাবির সবকয়টিই ক্রমে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে একথা বলা যাইতে পারে। জাতি বিসর্জন না দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি করা যায় এই রীতি হিন্দু সমাজেও আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে নব যুগের সৃষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রাহ্ম সমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে একথা সনস্বীকার্য।

[margin: ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজ-সংস্কার]

ঈশ্বরচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রীঃ): বাংলাদেশে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনীষায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। স্মৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য 'ল কমিটি' (Law Committee) তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়াছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতির ছাত্রের প্রবেশাধিকার এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা (Logic) সম্পর্কে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হন।

[margin: পরিচয়]



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ। কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্য ঘটিবার ফলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার ইওরোপীয়দের আচরণে ভারতীয়দের প্রতি যে অমর্যাদা ও অবহেলা প্রদর্শিত হইত তাহার

তীব্র প্রতিবাদ করিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে-সময়ে সাহেব কর্তৃপক্ষের খোশামোদ করা এবং তাহাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের নিকট নতি স্বীকার করা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বভাব, সেই সময়ে সম্পূর্ণ দেশীয় পোশাক—ধুতি, চাদর এবং চটি পরিহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করিয়া বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত মর্যাদা

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা, তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে এই মহামনীষী যতদূর করিয়াছিলেন তাহা অপর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রী-জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহারা সমাজের গলগ্রহরূপে থাকিবেন না, সমাজে তাঁহাদের স্থান স্বীকৃত হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (Hindu Female School) স্থাপনে বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালংকার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সাহায্য-সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। সংস্কৃতে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে চাকরি করিবার কালে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি শিশুদের এবং বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জন্য 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ভাষায় 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি রচনার দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন করেন। ইহা ভিন্ন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সহজতর করিয়া তোলেন।

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর . স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দান

হিন্দু সমাজে বিধবাদের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা পুনঃবিবাহ আইনত স্বীকৃত হয়। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা রদের জন্যও বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন। এ-বিষয়ে আইন পাশ হইবার ব্যবস্থা যখন প্রায় স্থির সেই সময়ে মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ) শুরু হইলে তাহা আর সম্ভব হয় নাই।

বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সাফল্য

বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক, অত্যুচ্চ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শিক্ষাবিদ। তাঁহার দয়াশীলতা, সর্বোপরি তাঁহার মানবহিতৈষণা তাঁহাকে জাগ্রত বাংলার শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিল।

সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান (১৮১৭-৯৮ খ্রীঃ) : মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না। ফলে হিন্দুরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সরকারী চাকরি গ্রহণ করিতে থাকিল তখন মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া গেল। আব্দুল লতিফ প্রমুখ মুসলমান নেতা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিলেন। এই অর্থ হইতে সরকার মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কতকটা উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু এ-বিষয়ে সর্বাধিক



স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান

উল্লেখযোগ্য কাজ করিলেন সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান। পরে ইনি 'স্যার্' উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আলিগড়ে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে উহার সূত্র ধরিয়া আলিগড়ে সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চালু হইল। ইহা আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।

আলিগড় আন্দোলন

স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খানকে 'মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন' বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আঘাত না দিয়া মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন, যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লা বা ঈশ্বরের বাণী—অর্থাৎ কোরানকে শুধু ভগবানের বাণী হিসাবে না দেখিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আন্দোলন সমসাময়িক কালের রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় ততটা গ্রহণ না করিলেও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমানগণ তাঁহার যুক্তিবাদী মতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক হিসাবে সৈয়দ আহ্‌ম্মদ

স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া 'ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমান ও ইংরেজদিগকে লইয়া 'মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্ট্যাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশান অব আপার ইণ্ডিয়া' নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করা। এই সংস্থা কতক পরিমাণে হিন্দু-বিরোধীও ছিল

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসো-সিয়েশান

বটে। স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদের ভয় ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল।

ইল্‌বার্ট বিলের সমর্থন

ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ: ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। বস্তুত নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুর মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সমিতি, দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাইটি নামক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্থা দুইটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ—রাণাডে



মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত শিশু, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ব-প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আস্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা ভগবানকে

ভালবাসার পন্থাস্বরূপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার সামাজিক উন্নতি সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার যোগ্যতাও ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে।

রাণাডের আদর্শ

দয়ানন্দ (১৮২৪-৮৩ খ্রীঃ): আর্য সমাজ: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর্য সমাজের স্থাপয়িতা (১৮৭৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম ও এক জাতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি চালু করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি ছিল আর্য সমাজের আদর্শ। দয়ানন্দ তাঁহার 'সত্যার্থ-প্রকাশঃ' নামক গ্রন্থে আর্য সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্য সমাজ ধর্মবিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্য সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। অ-হিন্দুকে 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্য সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আর্য সমাজ—দয়ানন্দ



স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ): শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষামুক্ত এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পর্শী

বটে। স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদের ভয় ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল।

ইল্‌বার্ট বিলের সমর্থন

ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ: ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। বস্তুত নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুর মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ।

প্রার্থনা সমাজ—রাণাডে

ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সমিতি, দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাইটি নামক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্থা দুইটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।



মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত শিশু, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ব-প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আস্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা ভগবানকে

ভালবাসার পন্থাস্বরূপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার সামাজিক উন্নতি সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার যোগ্যতাও ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে।

রাণাডের আদর্শ

দয়ানন্দ (১৮২৪-৮৩ খ্রীঃ): আর্য সমাজ: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর্য সমাজের স্থাপয়িতা (১৮৭৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম ও এক জাতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি চালু করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি ছিল আর্য সমাজের আদর্শ। দয়ানন্দ তাঁহার 'সত্যার্থ-প্রকাশঃ' নামক গ্রন্থে আর্য সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্যসমাজ ধর্মবিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্য সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। অ-হিন্দুকে 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্য সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আর্য সমাজ—দয়ানন্দ


স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ): শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষামুক্ত এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পর্শী

বাণী ও ভাবের দ্বারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির যেমন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল ধর্মের প্রতি সমপরিমাণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু ধর্মকে সংকীর্ণতার গণ্ডিমুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ অনুসরণ করিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম একই ভগবানে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। রামকৃষ্ণ সকল জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিবার উদার শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাকে তিনি ধৃষ্টতা মনে করিতেন, জীবের সেবা করাই হইল প্রকৃত ধর্ম একথা তিনি বলিতেন।

সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী

সকল ধর্ম একই ঈশ্বরে পৌঁছিবার বিভিন্ন পন্থা মাত্র

জীবে প্রেম—জীবে দয়া নহে

যে-সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বহির্মুখী হইয়া হিন্দু জাতি ও ধর্মের সবকিছুর প্রতি একটা অবহেলার ভাব পোষণ করিতে শুরু করিয়াছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ হিন্দু সমাজের সম্মুখে হিন্দু ধর্মেব অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত মূর্তি পূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

আত্মদর্শনেব মনে বৃত্তি

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ): শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে হিন্দু তথা ভারতীয় ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পরধর্ম অনুকরণ না করিয়া নিজস্ব ধর্মের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রতি প্রেম ছিল ধর্মের মূলকথা। এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥" —বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতবাসী যখনই নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখিল তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের দূরদর্শিতা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীকে আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের পথের সন্ধান বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার রচিত 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এক নূতন আদর্শ, এক নূতন চেতনার বিকাশ ঘটিতে লাগিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ
(Reaction against British Rule : Revolt of 1857)

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা (Background of the Rovolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহীদের নানাবিধ অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইলেও উহা উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি অতিশয় দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের আনুষঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন স্বভাবতই দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় জীবনযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সমাজের প্রতি স্তরেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের অর্থনৈতিক শোষণ, জমিদার, অভিজাতবর্গ, কৃষক, শিল্প-শ্রমিক, হস্তশিল্পী—সকল শ্রেণীর লোককেই আর্থিক দিক দিয়া দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশদের রাজস্ব-নীতি, আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা ভূমি-আশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছিল। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, দুর্নীতিগ্রস্ততা, পুলিশ, আদালতের কর্মচারীদের অর্থগৃধ্নুতা ভারতীয় জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্ন পর্যায়ের ব্রিটিশ কর্মচারীদের অর্থাগমের প্রধান পথই ছিল জমিদার, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতির উপর চাপ দিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা। এই সকল কারণে সাধারণ লোক দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়াছিল এবং একপ্রকার হতাশ হইয়াই তাহাদের অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। সমাজের ঊর্ধ্বতন শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার এবং ইংরেজ কর্মচারীদের সমপরিমাণ বেতন পাইবার বা সমমর্যাদা লাভের কোন সুযোগ পাইত না। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত এবং সর্বোচ্চ সমাজের সহিতও ইংরেজ কর্মচারীরা কোন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ রাখিত না। ভারতীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদ্ধত্য ছিল তাহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি। ভীতি এবং সন্ত্রস্ততা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মনোভাব স্বভাবতই ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে জন্মায় নাই।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক পরাজয়ে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি অপরাজেয় এই ধারণা যে ভ্রান্ত একথা ভারতীয়দের মনে জন্মিয়াছিল। এমনকি, যাহারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ছিল তাহারাও ব্রিটিশ পরাজয়ের সংবাদে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন জনসাধারণের মনে কোন শ্রদ্ধা বা আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় নাই।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা বা আনুগত্যের অভাব

ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার-অবিচার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলিতে বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে কোল বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বারাসতের নিকট তিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৩১ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে মোপ্‌লা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যে মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

বিক্ষুব্ধ ভারতীয়গণের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ (Causes of the Revolt): নানাপ্রকার কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। লর্ড ড়ালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের বাৎসরিক ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কার্যকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা অধিকার ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে অযোধ্যায় দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যায় বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল। কোম্পানির দেশীয় সৈনিকদের মধ্যেও সেজন্য তীব্র বিরোধিতার ভাব দেখা দিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কোম্পানির সিপাহীদের এক বিরাট সংখ্যা ছিল অযোধ্যার লোক। এই সকল সিপাহী কোম্পানির প্রতি আনুগত্যপূর্ণই ছিল এবং ভারতের অপরাপর অংশ জয়ে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নিজের দেশ বিদেশীদের অধীনে যাইবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের স্থানীয় জাতীয়তাবোধ ইহাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকারের প্রধান যুক্তি ছিল নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা, অথচ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর প্রজাবর্গের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। বরং তাহাদিগকে উচ্চহারে কর ও রাজস্ব দিতে হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্য দখল করিবার ফলে তথাকার নবাব পরিবারের আশ্রিত বহু ব্যক্তির ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। নবাবের শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত বহুসংখ্যক কর্মচারী, অভিজাতবর্গ প্রভৃতি কর্মচ্যুত হওয়ায় তাঁহাদের আশ্রিত বহু লোক এবং তাঁহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বহু জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই স্থলে নূতন জমিদার ও তালুকদার নিয়োগ করা হইয়াছিল। সম্পত্তিচ্যুত জমিদারগণ স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইলেন। ব্রিটিশের প্রতি অযোধ্যা রাজ্যে এক ভীষণ ও ব্যাপক বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। লর্ড

রাজনৈতিক কারণ

অযোধ্যা অধিকার

ডালহৌসী কর্তৃক অপরাপর বহু দেশীয় রাজ্য অধিকার, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাহাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গ দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রিটিশ মিত্রতার মূল্য ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনে চলিয়া যাওয়া। এই সকল কারণে নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ব্রিটিশের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

সামাজিক কারণ

রাজনৈতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে শুরু করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের প্রতি শাসকশ্রেণীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্রোহের পূর্বে, অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া এই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য হ্রাস না পাইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও নির্ভীকতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা বিদ্রোহের সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে।

ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্।

ব্রিটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মোট একশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ সোনারূপা এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী টিকিতে পারিল না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থাও ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিয়াছিল। তদুপরি নানাপ্রকার কর স্থাপন এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকদের আর্থিক অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। তাহাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় তাহাদের বেতন ও ভাতার স্বল্পতা এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্য-মূলক ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিপাহীদিগকে ইংরেজ

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

সৈন্যদের অভিযোগ

সামরিক কর্মচারীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিত, তাহাদিগকে পশু অপেক্ষা উন্নততর জীব বলিয়া মনে করিত না। ব্রিটিশ সৈন্য এবং ভারতীয় সিপাহী যুদ্ধের ব্যাপারে সমপরিমাণ দক্ষ ছিল। অথচ তাহাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈনিক অপেক্ষা বহু কম। সিন্ধু বা পাঞ্জাবে কাজ করিতে গেলে পূর্বে সিপাহীদিগকে ভাতা (allowance) দেওয়া হইত, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিপাহীদের অভিযোগ দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়ায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্রিটিশ সরকার অভিযোগের মূল কারণগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হন নাই। বিদ্রোহীদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন।

এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের স্বার্থে এবং ভারতীয় সংস্কারকদের সমর্থনে প্রবর্তিত উন্নয়নমূলক সংস্কারগুলিও ভারতীয়রা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতিতে রক্ষণশীল ভারতীয়দের মনে এই কথাই জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি প্রণোদিত। সেই সময়কার ব্রিটিশ কর্মচারীবর্গের ব্যভিচারও জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতির প্রবর্তন

সেই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা শুরু করিলে একথাই সকলের মনে জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সকলকেই ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিবে। স্কুল, হাসপাতাল, জেলখানায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ভারতীয়দিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে নানাপ্রকার কটূক্তি করিত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইবে বলিয়া আইন পাশ করায় ব্রিটিশ সরকার যে-কোন উপায়ে ভারতীয়দিগকে ধর্মান্তরিত করিতে ব্যস্ত এই ধারণা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

ধর্মনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে সেই সময়ে এনফিল্ড রাইফল (Enfield Rifle) নামে একপ্রকার বন্দুকের প্রচলন করা হইল। এই বন্দুকের টোটা দাঁত দ্বারা কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। এগুলি প্রস্তুত করিতে চর্বি ব্যবহার করা হইত। হঠাৎ রটিয়া গেল যে গরু ও শূকর উভয় প্রকার চর্বি এগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বভাবতই ধর্মভীরু হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৭

প্রত্যক্ষ কারণ: এনফিল্ড রাইফলের প্রবর্তন

খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপুর সামরিক ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। অপরাপর সিপাহীও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বারাকপুরের পল্টনটি ভাঙিয়া দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সহায়ক ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। ইহা মীরাটের সামরিক ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়িল। ১০ই মে (১৮৫৭ খ্রীঃ) কর্ণেল ফিনিসকে মীরাটের সামরিক ছাউনিতে গুলি করা হইলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে শুরু হইয়া গেল। ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহী সৈন্যগণ হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিগণকে বিদ্রোহী সিপাহীরা হত্যা করিতে লাগিল।

বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডেব বিদ্রোহ (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭)

মীরাটের বিদ্রোহ (১০ই মে, ১৮৫৭)

বিদ্রোহের শুরু

বিদ্রোহের বিস্তার (Progress of the Revolt): সিপাহীদের বিদ্রোহ বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপুর হইতে মীরাট এবং সেই স্থান হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। মীরাট হইতে বিদ্রোহীরা দিল্লী পৌঁছিয়া মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারে আসিয়াছে সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরোজপুর ও মুজফ্‌ফরপুরের সিপাহিগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত জনসাধারণও যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, কানপুর, ঝাঁসি, বিহার ও বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ঝাঁসিতে ঝাঁসিব রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতীয়া তোপী, কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটোয়া, মইনপুরী, রুরুকি, এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শাহ্‌জাহানপুর, মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ জেলখানা ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ করিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই বেসামরিক জনসাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অযোধ্যার তালুকদার যাহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল তাহারা এবং কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিল। সমগ্র অযোধ্যায় বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল। দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, মধ্য-ভারত প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। ঝাঁসির রাণী ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। তাঁহার অনুচর তাঁতীয়া তোপী পলাইয়া যান। পরে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত স্যার্ জন ল্যারেন্স্, হেভেলক, আউট্রাম প্রভৃতি ব্রিটিশ সেনাপতির সামরিক

বিদ্রোহের বিস্তৃতি

ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতীয়া তোপী, নানাসাহেব, কুনওয়াব সিংহ প্রভৃতি

তৎপরতায় এবং ব্রিটিশ, নেপালী ও শিখ সৈন্যদের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করে। দিল্লী পুনরধিকার করিবার পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

বিদ্রোহীদের পরাজয়

বিদ্রোহ দমন (Suppression of the Revolt): ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আক্রোশ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী এবং শিশুদের হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্যার্ জন ল্যারেন্স্, স্যার্ হেন্‌রী ল্যারেন্স্, হেভেলক, আউট্রাম, স্যার্ কোলিন ক্যাম্প্‌বেল প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারী ও সেনাপতির চেষ্টায় এবং শিখ ও নেপালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ঝাঁসির রাণী, তাঁতীয়া তোপী প্রভৃতি বীরত্ব ও রণকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার তাঁহাদের এই চেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিদ্রোহীদের বীরত্ব



ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের প্রকৃতি (Nature of the Revolt): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ নিছক সিপাহীদেরই বিদ্রোহ না সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, অনেকে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কিংবা 'সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলন'—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। জে. বি. নর্টন, ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রমুখ ব্যক্তির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার্ সৈয়দ আহ্মদ, চার্লস্ রেকস্, জন কে, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। তাঁহাদের মতে বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা।

বস্তুত ভারতীয় জনসাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডক্টর সেন ও ডক্টর মজুমদার এবং আরও অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। এইসব নূতন তথ্য এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল—সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও শেষ পর্যন্ত উহা অযোধ্যা, মধ্য-প্রদেশের কোন কোন অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন কোন স্থানে উহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত হইবে বলা কঠিন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য, এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের দুইজনের সিদ্ধান্তই গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক দেশের হিন্দু-মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান প্রভৃতি এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। জে. বি. নর্টন ও ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের মন্তব্য অনুধাবন করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশদের বিতাড়িত করিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন এই ছিল সমসাময়িক ধারণা। নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে আন্দোলন শুরু করা তখন কল্পনার বাহিরে ছিল। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমেই শুরু হইবে ইহাই ছিল যুক্তিযুক্ত। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ বিতাড়ন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বহু স্থানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, কোন জাতীয় আন্দোলনেই দেশের সকল লোক যোগদান করিয়াছে এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তখনকার ভারতীয় পরিস্থিতিতে যুক্তিসম্মত পন্থা। সিপাহীদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহের সম্মান না দিবার যুক্তি নাই। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছানো সম্ভব হয় নাই। নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি—সিপাহী বিদ্রোহ বা জাতীয় যুদ্ধ (?)

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অসুবিধা

বিফলতার কারণ (Causes of Failure): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অসাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ, সংহতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন

স্বভাবতই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সর্বত্র উহা একই পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য ছিল। নানাসাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ হইতে চাহিয়াছিলেন পুনরুজ্জীবিত মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট্। আদর্শের এই বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব না থাকিলেও সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত ক্ষমতাবান নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ভারতবর্ষে কোন নৃপতি উহাতে যোগদান করেন নাই। সর্বশেষে, সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ও তাহাদের সামরিক ভুলভ্রান্তি এবং অপরপক্ষে ব্রিটিশ সামরিক ক্ষমতা ও কূটকৌশল বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

বিদ্রোহের অসাফল্যের কারণ: (১) যোগাযোগের অভাব (২) বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক রূপ গ্রহণ (৩) আদর্শের পার্থক্য (৪) নেতৃত্বের অভাব (৫) বিদ্রোহীদের সামরিক দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি—ব্রিটিশ শক্তির কূটকৌশল প্রভৃতি

ফলাফল (Outcome) : কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ না করিলেও ইহার কতকগুলি সুফল দেখা দিয়াছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় সিপাহী, ইংরেজ নরনারী ও সামরিক কর্মচারী এই বিদ্রোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রাণনাশের বিনিময়ে কতকগুলি সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে ইংলণ্ডের ব্রিটিশসরকার একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলে ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণা (১৮৫৮ খ্রীঃ) দ্বারা ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনার ভার তাঁহার পক্ষে একটি কাউন্সিল ও একজন সেক্রেটারির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ভারতবর্ষে একজন রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত করিবার নীতি গৃহীত হইল। গভর্ণর-জেনারেলই ভাইসরয়-পদে নিযুক্ত হইবেন স্থির হইল। ইহা ভিন্ন, এই ঘোষণায় ডালহৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ-নীতি পরিত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া দিয়া দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যচ্যুতির যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল তাহা দূর করা হইল। ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন, ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন না হইতে পারে সেজন্য 'সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি'র প্রয়োগ শুরু হইল। এই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে শুরু করিল। দেশীয় সিপাহীদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভর করিতে

কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার অবসান—মহারাণীর ঘোষণা ভাইসরয় নিয়োগ

স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত

বিভেদ-নীতি

অধিক সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য আমদানি

না হয় সেজন্য ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী করা হইল। লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। তাঁহার উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহিগণ অযথা শাস্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি না থাকিবার জন্য স্বভাবতই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল।

প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এর উদারতা

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আনুষঙ্গিক সংস্কার ও সংগঠনকার্যে ব্যয়িত হইল। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্থান দেওয়া হইল না। বিদ্রোহের কালে যে ঋণ হইয়াছিল উহা পরিশোধের জন্য এবং সরকারের 'আয়বৃদ্ধির জন্য আয়কর ও আমদানী শুল্ক স্থাপন করা হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইল। ইহা ভিন্ন রাজস্ব আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারী আইন প্রভৃতির সংস্কার-সাধন করা হইল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় একটি করিয়া হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পূর্বেই (১৮৫৭ খ্রীঃ) স্থাপিত হইয়াছিল।

সংস্কার সামরিক ও অর্থনৈতিক

বিচার ও আইন সংক্রান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ (Indian Councils Act) পাশ করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়কে আইন পরিষদ (কাউন্সিল) কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল করিবার এবং জরুরী পরিস্থিতিতে অর্ডিন্যান্স পাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্

নবযুগের সূচনার পথে ভারতবর্ষ (India on the Threshold of a New Era): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহের শিক্ষা ভারতবাসীর অন্তর হইতে মুছিয়া গেল না। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক বর্বরতা ভারতবাসীকে মনেপ্রাণে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সাহসিকতা, বীরের ন্যায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান প্রভৃতির কাহিনী যখন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তখন বিদ্রোহীদিগকে ব্যাপকভাবে সাহায্যদানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ভারতবাসীর অন্তরে গভীর অনুতাপের সৃষ্টি হইল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের অন্তঃস্থলে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শিক্ষা

পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ইওরোপীয়দের জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। ক্রমে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সরকারী সর্বোচ্চ কর্মচারী পদে (আই. সি. এস্.) ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' (Indian Association) স্থাপন করিলেন। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত ভারতবর্ষের সূচনা হইল।

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

[দশম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ]

স্বদেশকথা



জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান
ও
নাগরিকতা

সূচীপত্র

২য় খণ্ড

জাতীয় আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

SYLLABUS

India and Her People (History)

PART B (for Class X)

HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT

I. (a) Impact of western contact. Remaking of India : Introduction of western education—intellectual reawakening, growth of Indian Nationalism. Impact of the ideas preached by Bankim Chandra and Vivekananda, economic exploitation of the people, educated unemployment, sense of unity fostered by easy means of communication. role of the Press, rediscovery of India. Urge towards responsible government.

(b) Political association from the 'Landholders' Society to the Home Rule League.

(c) Indigo Agitation, protest againt Arms Act and the Vernacular Press Act, Ilbert Bill controversy leadership of Surendranath Banerjee. All-India National Conference, 1883.

II. Foundation of the Indian National Congress, 1885. Its leaders and activities up to 1905. Changing role, Congress not destined to be Her Majesty's opposition : Growing discontent against the policy of 'prayer and petition'.

III. Partition of Bengal (1905)—a Challenge to Indian Nationalism. Swadeshi and Boycott Movement. Muslim Participation. National Education Movement.

IV. (a) Growth of militant nationalism. Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Bepin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai.

(b) Revolutionary struggle in Bengal, Maharastra and the Punjab.

V. New leader : M. K. Gandhi. Aftermath of World War I. Disillusionment against the British and discontent against their measures of repression. Jalianwalla Bagh Massacre. Gandhiji's concept of Satyagraha—Non-violent Non-Co-operation and Khilaft movements—a short history. (Congress divided : the Home Rule Movement : the Swarajya Party ; revival of revolutionary extremism).

VI. New phase in the Freedom Movement : The Lahore Congress ; demand for complete independence under Jawaharlal Nehru's leadership, historical importance of the 26th January, British Policy of "kicks and kisses". Round Table Conferences Civil Disobedience Movements. Role of Jinnah and Muslim League Abdul Gaffar Khan and Abul Kalam Azad. Congress Participation in Government—disillusionment.

VII. Impact of the Second World War. 'Quit India' and August Upsurge. Netaji and the INA. Exploits of the Azad Hind Fauj ; The Naval Revolt, Failure of British efforts at conciliation : Cripps Mission, Cabinet Mission. Interim Government. Transfer of Power —Indian Independence Act, 1947—creation of two Dominions— India and Pakistan. India as Republic (1950).

স্বদেশকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

জাতীয় আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

(ক) পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নূতন ভারত সৃষ্টি
(Impact of Western Contact : Remaking of India)

পটভূমিকা

"তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা ॥"
—রবীন্দ্রনাথ।

মোগলমহিমা যেদিন শ্মশানশয্যা রচনা করিয়া বিস্মৃতির অন্তরালে গমনোদ্যত সেদিন শবলুব্ধ গৃধ্রদের ন্যায়ই বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। ফলে সমগ্র ভারতে দেখা দিল এক ব্যাপক অরাজকতা ও বিশৃংখলা। রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া এই বিচ্ছিন্নতা সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি সর্ব ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করিল। ভারত ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ভারতের জাতীয় জীবনের ধারা তখন রুদ্ধ ও অগ্রগতিহীন। সেই সময়কার ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ও অনৈক্যের সুযোগ লইয়া শিথিল মোগল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া ইংরেজ বণিকগণ ভারতবাসীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করিল। ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল।

মোগল যুগের শেষে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত

দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। পর-সম্পদলোভী ইংরেজ বণিকদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিল। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ভিত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। কিন্তু যে বিষ প্রাণনাশ করে সেই বিষই আবার বিষক্ষয় করে। ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রেও হইল তাহা-ই।

ইংরেজ শাসনের কুফল

ইংরেজ অধিকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির মধ্যে প্রথম বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। শের শাহ্, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশার আমলে ভারতের মূল হিন্দু এবং ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কতক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই দুইয়ের পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন এই দেশে বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিল। এই তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নূতন ভারত গঠনের সূচনা করিলেন রাজা রামমোহন রায়। ক্রমে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে এক নবচেতনা বা নবজাগরণের ফলে এক নূতন ভারত সৃষ্টি হইতে চলিল। এই নবচেতনা বা নবজাগরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহার উন্মেষ। পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহা ছিল শ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারত ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ

রামমোহন : নূতন ভারত গঠনের সূচনা



রাজা রামমোহন রায়

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে একদিকে যেমন ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল অপরদিকে সেই সময়ে তেমনি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সর্বত্র এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহার প্রেরণা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই আসিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে নবযুগের সূচনা

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষার বিস্তার তাহাদের দায়িত্ব বলিয়া মনে করিত না। স্বভাবতই ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি তখনও চালু ছিল। মুসলমানদের মাদ্রাসা-মক্তব আরবী-ফারসী ভাষা এবং হিন্দুদের টোল ও পাঠশালা সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্ত ইওরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম যাজকগণ ও কোম্পানির কোন

শিক্ষার ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদাসীনতা

কোন কর্মচারী প্রথম ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। যাজকগণ অর্থাৎ খ্রীষ্টান মিশনারিগণ সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্কুল ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই অবশ্য ছিল তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যাহা হউক, তাঁহারাই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা বাংলাদেশেই প্রথম শুরু হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি, দেশপ্রেম—সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন।

রামমোহন কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাবোধ

আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, সিরীয় প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ইংরেজ হিউম্যানিস্ট (Humanist) বা মানব-ধর্মী ফ্রান্সিস বেকন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্, নিউটন, হিউম, গিবন, ভল্টেয়ার, পেইন প্রভৃতি মনীষীর চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনে কোম্পানিকে বৎসরে মোট এক লক্ষ টাকা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই অর্থ যাহাতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হয় সেজন্য রাজা রামমোহন বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে (১৮২৩-২৮) অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয়। কোম্পানি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই সেই অর্থ ব্যয় করিতে থাকে। কিন্তু



ডেভিড হেয়ার

হিন্দু কলেজ স্থাপন (১৮১৭)

ইহার পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই পরে (১৮৫৫) প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে। ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঘড়িব্যবসায়ী স্কটিশ ইংরেজ। বাংলাদেশে

ডেভিড হেয়ার ও 'স্কুল বুক সোসাইটি'

তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে তখন কলিকাতায় নূতন শিক্ষার

ডি'রোজিও

পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে প্রগতিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে হিন্দু কলেজ অত্যধিক গুরুত্ব অর্জন করে। 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) নামে একটি সমিতি রাজা রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

প্রগতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। ইহার প্রধান নেতা ছিলেন হিন্দু কলেজের জনৈক পোর্তুগীজ অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও। বাঙালী যুবসমাজের মনে বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারা জাগাইয়া তুলিতে তাঁহার দান ছিল অপরিসীম। বাঙালী যুবসমাজের মনে স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন।


ডি'রোজিও

ইংরেজী শিক্ষার অপরাপর বিদ্যালয়

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ নামে জনৈক স্কটিশ মিশনারী রাজা রামমোহনের সহায়তায় 'জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউশন' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ ইহার বর্তমান রূপ।


উইলিয়াম কেরী

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) এবং তাঁহার কাউন্সিলের আইন-সদস্য (Law Member) লর্ড ম্যাকলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে প্রতি বৎসর যে এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানে ব্যয় করিবার জন্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ইংরেজদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ-বিষয়ে সরকারের সেক্রেটারি প্রিন্সেপ সাহেব ও গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য লর্ড ম্যাকলের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ ছিলেন

প্রিন্সেপ সাহেব ও লর্ড ম্যাকলের মতানৈক্য

বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন (১৮৩৫)

প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতী। কিন্তু লর্ড ম্যাকলে চাহিয়াছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে। বেণ্টিঙ্ক লর্ড ম্যাকলের মত-ই গ্রহণ করিয়া ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আদেশ দেন (১৮৩৫)। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং বোম্বাইয়ের এল্‌ফিনস্টোন কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষার উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন।



লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড ম্যাকলের আলোচনা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কর্মচারী প্রস্তুত করা। প্রশাসন ভিন্ন ইংরেজদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগের জন্যও ইংরেজী ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক প্রভৃতিরও প্রয়োজন ছিল। এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোককে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা দরকার ছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে ইওরোপীয় সংস্কৃতি বিস্তারের আগ্রহও এ-বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। তাহারা মনে করিত যে, অপরাপর সংস্কৃতির তুলনায় ইওরোপীয় সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠতর। রাজা রামমোহন চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয়দের পরিচিতি ঘটাইতে এবং উহার মাধ্যমে এক নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে। আর ইংরেজগণ চাহিয়াছিল নিজেদের কাজ চালাইবার সুবিধার জন্য এবং তাহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত ভারতীয়দের কিছু সংখ্যক লোককে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে। আদর্শের এই পার্থক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ভারতবাসী ও ইংরেজ শাসকদের মনোভাবের পার্থক্য স্বভাবতই ঘটাইল। ফলে ইংরেজগণ ভারতীয়দের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা স্থাপনে তেমন আগ্রহী হইল না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পশ্চাতে ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল। ঐ বৎসর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল' (Board of Control)-এর প্রেসিডেণ্ট একটি নির্দেশনামায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করিতে বলিলেন। এই নির্দেশনামা 'উডের ডেসপাচ' (Wood's Dispatch)

উড সাহেবের নির্দেশনামা (Wood's Dispatch, 1854)

নামে খ্যাত। ইহাতে স্কুল পর্যায়ে মাতৃভাষার সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হইল। কলেজ পর্যায় হইতে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার করা এবং ভারতীয়দিগকে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ করিয়া তোলা ছিল চার্লস্ উড সাহেবের নির্দেশনামার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উড সাহেবের নির্দেশনামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহার মূল উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হইল। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা পূর্ণোদ্যমে চলিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে স্কুল-কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিল। সরকার ভিন্ন ভারতীয়গণও স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ভারতীয়দের পুনর্জাগরণ: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার, মিশনারিগণ ও ভারতীয়দের চেষ্টা সত্ত্বেও এই শিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সীমিত সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে নূতন মানসিকতার সৃষ্টি

দেশের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ফলে সমাজ সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানুষ মাত্রেরই সম-অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে এক নূতন ধারণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। মিল, বেন্থাম, পেইন প্রভৃতি মনীষীর রচনা পাঠের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক উদারনৈতিক ভাবধারার প্রকাশ শুরু হয়। অন্যায়-অবিচার, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবার মানসিক শক্তি ও আগ্রহ ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃত মূল্য কি তাহা ভারতীয়দের মধ্যে প্রকাশিত হইল। ভারতের প্রাচীন সবকিছু জানিয়া আধুনিক সবকিছুর মূল্যায়নের চেষ্টা চলিল। বহু ইওরোপীয় পণ্ডিত এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের জ্ঞানীগুণী



উইলিয়াম জোন্স

প্রাচীন ভারতকে জানিবার আগ্রহ

অনেকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। উইলিয়াম জোন্সের নাম এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান,

সাহিত্য সবকিছু সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান অপরিসীম। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জনাথন ডানকান সাহেবের প্রচেষ্টায় বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজও স্থাপিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ও দেশীয়, বিশেষভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির পণ্ডিতগণ ভারতীয় শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের অতীত ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে পুনরায় অবহিত হইবার ফলে ভারতবাসীর মনে ভারতের নিজস্ব সবকিছুর উপর আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল।

এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান

ভারতীয় সবকিছুর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্য যাবতীয় কিছুর উপর যে অন্ধ বিশ্বাস এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল উহার অবসান ঘটিল। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সবকিছুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এইরূপ এক নূতন ধারণা সৃষ্টি হইবার ফলে ভারতবাসীর অন্তরের হীনমন্যতা দূর হইয়া আত্মনির্ভরশীলতা দেখা দিয়াছিল। ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি এইভাবে হইতে লাগিল।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ : (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয়দের, বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তা, উদার নীতি প্রভৃতি আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বদ্ধমূল হইল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ইতিহাস পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় ঐক্য আন্দোলন প্রভৃতির সাফল্য স্বভাবতই ভারতবাসীকে নিজ দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করিয়া তুলিল। উনবিংশ শতাব্দী ছিল ইওরোপীয় ইতিহাসের এক উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ। সেই সময়ে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬৭) ক্ষুদ্র দেশ জাপানের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং দ্রুত উন্নতি ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের পথে আরও অগ্রসর করিয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল একথা অনস্বীকার্য। ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব : জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানধারণার প্রভাব : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইয়াছিল কিন্তু উহা এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল বাঙালী মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য কীর্তির মাধ্যমে।

বঙ্কিমের আত্মমর্যাদা-বোধ

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুইজন স্নাতকের অন্যতম ছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আত্ম-মর্যাদাবোধ, সর্বোপরি তাঁহার দেশপ্রেম বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতার নিকট সে-যুগের ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যে-যুগে পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোন ভারতীয়ের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব ছিল সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজ মর্যাদায় সামান্যতম আঘাত সহ্য করেন নাই। কর্ণেল ডাফিন তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয়দের জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হইয়াছিলেন। ইংরেজদের অধীনে সরকারী চাকরি করিলেও বঙ্কিমের অন্তর ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিকের অন্তর। তাঁহার নানাবিধ রচনার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তেমনি সমাজের নৈতিকতা এবং দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিজে সরকারী চাকরি করিয়াও তিনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নানা প্রকার ত্রুটি তাঁহার রচনার মাধ্যমে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে ভয় পান নাই। 'বাংলা শাসনের কল', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামক তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তেজস্বী ব্যক্তিত্বের প্রভাব

তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে দেখাইয়া একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার রচনায় বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ প্রচার করিয়া তিনি নবজাত জাতীয়তাবোধকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং উহাকে এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত করিবার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ছিল অতুলনীয়। আনন্দমঠ বাঙালী জাতিকে জাতীয়তাবোধের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। আনন্দমঠের 'সন্তানদল' সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশমাতৃকাকে কালীমাতা রূপে

আরাধনা করিত। দেশমাতার ধূলিমলিন, অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আসল রূপে রূপমণ্ডিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এই আদর্শকে সফল করিবার জন্যই তাহারা সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশমাতৃকার কাছে তাহারা উৎসর্গীকৃত। আনন্দমঠ বাঙালী এবং ক্রমে ভারতবাসীকে যতদূর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সেরূপ অন্য কোন কিছুই করে নাই। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫) এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম্' ভারতবাসীর নিকট দেশাত্মবোধের বীজমন্ত্র রূপে কাজ করিয়াছে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অসংখ্য স্বাধীনতা সৈনিক হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমকে ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম তাঁহার রচনায় দেশপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল।* একমাত্র শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' ভিন্ন অপর কোন বাংলা রচনা বাঙালী যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে অতটা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। (১) জাতির স্বার্থ ও নিজের স্বার্থকে এক এবং অভিন্ন করিয়া দেখা, এবং (২) জাতির স্বার্থবৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের মূল বৈশিষ্ট্য।

আনন্দমঠের অবদান

'বন্দেমাতরম্' জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র



শরৎচন্দ্র

(৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ফলে যখন বাঙালীদের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখা দিয়াছিল, ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যখন অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতীয়দের এই হীনমন্যতার অবসান ঘটাইয়াছিল। নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারতের বুকে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি। দক্ষিণেশ্বরের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করিয়া বাঙালীদের বিদেশী অনুকরণের পথ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত—পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বাণী ছিল সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাণী। ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির চিন্তা যখন আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল তখন উহা এক বিশাল শক্তি হিসাবে জাতীয়

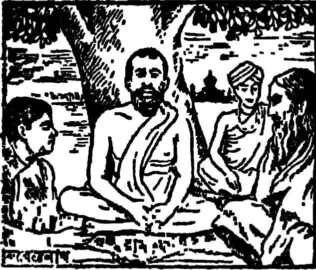
ভারতীয়দের হীনমন্যতার অবসান

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের বাণী

* "Bankim Chandra converted patriotism into religion and religion into patriotism." Bharatiya Vidya Bhavan, *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol X. Part II, p 496.

জীবনের প্রতি স্তরে এক নবচেতনা, নবজাগরণের সৃষ্টি করিল। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়া এবং কার্যে পরিণত করিয়া ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির স্রষ্টা হিসাবে, জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ছিল অপরিসীম। হিন্দুধর্মের মূল নীতির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করিয়া তিনি হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর জাতি ইওরোপীয়দের মধ্যেও শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারক বিবেকানন্দ





রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

দরিদ্র, নিপীড়িত দেশবাসীর সেবাকেই বিবেকানন্দ ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ভারতের প্রকৃত শক্তি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য, অনাদৃত ভারতবাসীর উন্নতির মধ্যে নিহিত। ভারতবাসীকে একথাই তিনি মনে করিতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার ভাই। ভারতবাসীর কাছে ভারতভূমি হইল স্বর্গ, ভারতের উন্নতি হইল ভারতবাসীর উন্নতি। তাঁহার দেশপ্রেম এক অতি উচ্চ জীবনাদর্শে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেই দেশমাতৃকার কাছে বলিপ্রদত্ত, অর্থাৎ ভারতবাসীর সবকিছুই দেশমাতৃকার নিকট উৎসর্গীকৃত। হীনমন্যতা, কাপুরুষতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সাহসিকতা ও বীরত্বের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, একথা তিনি বলিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনাদর্শ দেশপ্রেম, দেশবাসীর সেবা

বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশ ও দেশবাসীর সেবা, দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকে তিনি ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক

(৪) **অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষিতদের বেকারি, সহজ সংযোগব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব :** ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসারের আরও নানাবিধ কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে

ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে সেই দেশে যন্ত্রযুগের সূচনা হয়। মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন-প্রণালীর এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যও হ্রাস করিয়াছিল। এই সকল বিলাতী পণ্য ভারতের বাজার-বন্দর ছাইয়া ফেলিলে ভারতের কুটির শিল্পগুলি বিশেষভাবে বস্ত্র ও রেশম শিল্প টিকিতে পারিল না। বিদেশীদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সবকিছুরই বিনাশ ঘটিল। ক্রমে অসংখ্য লোক বেকার হইয়া পড়িল। ইহার ফলে কৃষি-জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইল। শিল্প-শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকলেই কৃষির মাধ্যমে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা শুরু করিল। বিদেশী ব্রিটিশ সরকার ভারতের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের কোন চেষ্টা করা দূরের কথা ইংরেজ বণিকদের সুবিধার জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটাইল। বাংলাদেশ নীলকুঠিতে ছাইয়া গেল। 'নীলকর' সাহেবদের অত্যাচার প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইল। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত তখন সম্পূর্ণভাবে কৃষি-আশ্রয়ী দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতের যে কৃষিজাত কাঁচামাল বিদেশে চালান যাইত তাহা হইতে তৈয়ারী সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া বহুগুণ অধিক মূল্যে পুনরায় ভারতের বাজারে-বন্দরে ফিরিয়া আসিত। এইভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতবাসীর দারিদ্র্য শোচনীয়তার চরমে পৌঁছিল। দাদাভাই নৌরজীর উক্তি এই বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি একসময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড় মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ২০ টাকার বেশী না হইবার কারণ হইল ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি। ব্রিটিশ-সরকারের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে উদাসীনতার ফলে কিছুকাল পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগিল। এমতাবস্থায় যখন ভারতে

ইংরেজগণ কর্তৃক ভারতীয়দের শোষণ

বিলাতী সামগ্রীর প্রতিযোগিতা ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের সর্বনাশ

কৃষির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা


দীনবন্ধু মিত্র


দাদাভাই নৌরজী

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিল তখন স্বাভাবিকভাবেই উহা ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বহু ভারতবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিল। প্রথমে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এইরূপ শিক্ষিত ভারতীয়দের কর্মসংস্থান সম্ভব হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন কর্মসংস্থান আর সম্ভব হইল না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে অসন্তোষের উদ্রেক হইল উহা শিক্ষিত বেকারদের জাতীয়তাবোধকে বহুগুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। ভারতবাসীর স্বার্থের ব্যাপারে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতাই যে ভারতের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী একথা সকলের অন্তরে বদ্ধমূল হইল।

শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি

ভারতবাসীর মধ্যে যখন জাতীয়তাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, সেই সময়ে একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য এবং ভারতীয়দের প্রতি অমর্যাদাসূচক ব্যবহার, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার, ভারতবাসীর প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অপরদিকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবির প্রতি উপেক্ষা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে বহুগুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের অমর্যাদা-সূচক, অত্যাচারী ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার

ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রসারের ব্যাপারে ছাপাখানার প্রভাবের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও মনীষীদের চিন্তাধারার বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, তেলেগু, তামিল, কন্নাদ, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় রচনার মাধ্যমে ভারতবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল মুদ্রাযন্ত্র। সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাপাখানার প্রচলনের ফল

প্রশাসনিক সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুযোগবৃদ্ধির জন্য ইংরেজগণ ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেলপথ, রাস্তা নির্মাণ, নদীপথে স্টীমার চালনা, টেলিগ্রাম, ডাক চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তাহা রপ্তানির জন্য বন্দরে পৌঁছান প্রভৃতির সুযোগ ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে এক স্থান হইতে অপর স্থানে দ্রুত চলাচলের এবং সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইহাতে ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়দের দিক হইতে এই যোগাযোগের সুযোগ বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই ঐক্যবোধ আবার ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ধারণাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে একতাবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রসার

(৫) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপত্রের ভূমিকা : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, বিশেষত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে ভারতীয়দের মালিকানায় এবং সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই সকল সংবাদপত্র ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিয়া জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের শিক্ষায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের সম্পাদনা ও মালিকানায় যে-সকল পত্রিকা প্রকাশিত হইত সেগুলি ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলিয়া যাইবার ফলে এই সকল সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ভাল হউক আর মন্দ হউক, সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করিয়া চলা। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই ছিল ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধিতা

কিন্তু ভারতবাসী কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের ত্রুটির সমালোচনা করিত, অপরদিকে তেমনি ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ করিয়া, ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছিল। বাংলাদেশে হরিশ মুখার্জী কর্তৃক পরিচালিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' (Hindoo Patriot) ব্রিটিশ সরকারের পুলিশব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের জাতীয়তাবাদী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয়দের মনে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতাস্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছিল। অনুরূপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠ-পোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (Indian Mirror), সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী', নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশন্যাল পেপার' ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'

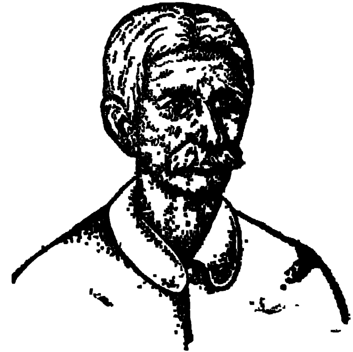
'ইণ্ডিয়ান মিরার'

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় সংবাদপত্র মাত্রেই দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এ-বিষয়ে সোমপ্রকাশ, শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন প্রভৃতি বাঙালীদের মনে একথাই বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, যতদিন ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিবে ততদিন ভারতবাসীর অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না। আর্যদর্শন পত্রিকা ইতালির জাতীয় ঐক্যের নেতৃবৃন্দ ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি এবং অপরাপর বিপ্লবীর জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধের এক অদম্য প্রেরণা জাগাইয়া

'সোমপ্রকাশ', 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার', 'বঙ্গদর্শন', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি

তুলিয়াছিল অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। যশোহরের (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) গ্রামে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক। তিন বৎসর পর এই পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন উহার একাংশ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইত। কিন্তু দেশীয় ভাষায় পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত বলিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) তাঁহার কুখ্যাত 'দেশীয় ভাষায় পত্রিকা আইন' (Vernacular Press Act) পাশ করিয়া সেগুলির সরকারের ত্রুটিপূর্ণ কার্যকলাপের সমালোচনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই আইনের আওতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা এক রাত্রির মধ্যেই সম্পূর্ণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ এবং সমগ্র উত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিবার ব্যাপারে এই পত্রিকার অবদান অপরিসীম। এই সকল সংবাদপত্র ভিন্ন আরও বহু পত্রিকা দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা



শিশিরকুমার ঘোষ



লর্ড লিটন

বাংলাদেশ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুরূপ সাংবাদিকতা জাতীয়তাবাদের প্রসারে সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এগুলির মধ্যে লাহোরের 'ট্রিবিউন', বোম্বাইয়ের 'কেশরী', যুক্তপ্রদেশের 'ইণ্ডিয়ান হিরাল্ড', মাদ্রাজের 'হিন্দু' প্রভৃতি সংবাদপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাহোরের 'ট্রিবিউন', মাদ্রাজের 'হিন্দু' ইত্যাদি

জনমত গঠনে এবং জনমত প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্র হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতাস্পৃহা ব্যাপকভাবে জাগাইবার ব্যাপারে, জনমত গঠন ও প্রকাশে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান ছিল অপরিসীম।

ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান

(৬) ভারতের পুনরাবিষ্কার: মহৎ কাজ মাত্রেই চাই মহান্ আদর্শ। মোগল যুগের অবসান এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ভারতবাসী আত্মকেন্দ্রিক এবং আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় ঐক্য বা দেশাত্মবোধের ধারণা ছিল তখন অত্যন্ত ক্ষীণ। ভারতবাসী তখন আত্মবিস্মৃত এবং অবচেতন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই

অবচেতন জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে নূতন শক্তি, ধ্যানধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতবাসী আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরিয়া আসে। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া গঠিত, প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারত পরস্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হইয়াছে একথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার ফলে ভারতীয়গণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল। পরাধীনতার অমর্যাদা, নিজ দেশে পরের পদানত থাকার অসম্মান, বিদেশী শোষণে ক্লিষ্ট ভারতবাসীর দারিদ্র্য সবকিছু ভারতবাসী এক নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে লাগিল। এক নূতন জীবনাদর্শ, এক নূতন স্বাধীন ভারত তাহাদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইল। পরমুখাপেক্ষিতার স্থলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরশীলতা, একতার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া এক সুস্থ, শোষণহীন, দারিদ্র্যমুক্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের আদর্শ ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। এক নূতন ভারত উহার প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নবীকরণের মাধ্যমে নূতন রূপ লইয়া তাহাদের মানসচক্ষে দেখা দিল। জাতীয়তাবোধের প্রসারের যে-সকল কারণ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে উহার সামগ্রিক ফল ছিল এক নূতন জীবনাদর্শ সম্বলিত, স্বাধীন নব-আবিষ্কৃত ভারত।

নূতন জীবনাদর্শ সম্বলিত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন

দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ: ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসারের ফলে তাহাদের নিকট এ-কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, যতদিন ভারতবাসী বিদেশী সরকারের অধীন থাকিবে ততদিন ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব হইবে না। ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব না আসিলে ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই দুরবস্থার অবসান ঘটিবে না। একথাও তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছিল যে, বিদেশী শাসকবর্গের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ বা কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের একমাত্র উপায়ই ছিল ভারতীয়দের দাবিকে সোচ্চার করিয়া তোলা। প্রথমদিকে ভারতীয়দের দাবি প্রধানত সরকারী চাকরিতে অধিকতর সংখ্যায় প্রবেশ অধিকার, সর্বোচ্চ পদে ভারতীয়দের গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের দাবির প্রকৃতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় আইনসভায় ভারতীয়দের গ্রহণের দাবিতে। পরবর্তী কালে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট পাশ করিবার পূর্বে যখন ইংলণ্ডে এ-বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর বাঙালী নেতার পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নানাবিধ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া সেগুলির প্রতিকার দাবি করা হয়। এই সকল দাবির

ভারতীয়দের হস্তে শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের অবস্থা উন্নয়নের একমাত্র উপায়

জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

মধ্যে শাসনক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পৃথকীকৃত করিয়া সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আইনসভা গঠনের এবং উহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সেই আইন-সভাকে গণতান্ত্রিক করিয়া তুলিবার দাবি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করিবার দাবি এইভাবে উত্থাপিত হইয়াছিল।

দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আগ্রহ

ইহা ভিন্ন, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের ক্ষমতা একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না রাখিয়া উহার পৃথকীকরণের দাবিও করা হইয়াছিল। এই দরখাস্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। উদারচেতা ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের অনেকে ভারতবাসীর এই দাবির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের দাবি স্বীকৃত না হইলেও ভারতবাসী যে গণতান্ত্রিক পন্থায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আগ্রহী একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ইহা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।*

(খ) রাজনৈতিক সমিতি : জমিদার সমিতি হইতে হোমরুল লীগ পর্যন্ত (Political Associations : From Land-holders' Society to Home Rule League)

রাজা রামমোহন—রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেরও পথিকৃৎ ছিলেন। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি, ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির এবং অন্যায়মূলক আদেশ ও আইনকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' (Press Ordinance) জারি করিয়া ভারতে কোন সংবাদ-পত্র প্রকাশ শুরু করিবার পূর্বে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন। লাইসেন্স বাতিল করিবার অধিকারও এই আদেশের বলে সরকারকে দেওয়া হয়। রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর প্রভৃতি পাঁচজন গণ্যমান্য বাঙালী এই আদেশের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাষায় ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁহার কাউন্সিলের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। অনুরূপ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জুরি আইন' (Jury Act) পাশ করিয়া হিন্দু বা মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত জুরি কোন ইওরোপীয় বা ভারতীয় খ্রীষ্টানের বিচার


দ্বারকানাথ ঠাকুর

* Vide *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. X. Part II, pp. 450, 455.

করিতে পারিবে না, এই নিয়ম চালু করা হয়। পক্ষান্তরে, ইওরোপীয় বা ভারতীয় খ্রীষ্টান লইয়া গঠিত জুরী হিন্দু, মুসলমান সকলেরই বিচার করিতে পারিবে স্থির হয়। এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধেও রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া দরখাস্ত করেন। এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সরকারের শত্রুতে পরিণত করিবে একথা উল্লেখ করিতে রামমোহন দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইভাবে রাজা রামমোহন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রেস অর্ডিন্যান্স ও জুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সমসাময়িক কালে ইওরোপের জাতীয় আন্দোলন, বিপ্লব প্রভৃতিও ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলনের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলাদেশে এই আগ্রহ অত্যধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দিলে কলিকাতায় এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। ইওরোপে উদারনৈতিক আন্দোলন মাত্রেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। এইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

ইওরোপীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

প্রাথমিক প্রস্তুতির পর রাজনৈতিক স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

জমিদার সমিতি : জমি-মালিক সমিতি : সর্বপ্রথম যে-সংগঠন স্থাপিত হইল উহা পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল একথা বলা চলে না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠের জমিদারগণ হিন্দু কলেজে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'জমিদারি সমিতি' (Zamindary Association) নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করা হয়। অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'জমি-মালিক সমিতি' (Landholders' Society) করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমির মালিক মাত্রেই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই সমিতির উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জমিদারের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের পথ দেখাইয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অভাব-অভিযোগ দূর করিবার এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার দাবি করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা টাউন হলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক [illegible]



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভিযোগের প্রতিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন

বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার জন্য যে-বিরাট সভার আয়োজন জমি-মালিক সমিতি করিয়াছিল তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর যে-কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন। যাহা হউক, জমি-মালিক সমিতি জমির মালিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার এবং তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য স্থাপিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসম্মত উপায়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। এই সমিতির শাখা ভারতের বিভিন্নাংশে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার দৃষ্টান্তও এই সমিতিই স্থাপন করিয়াছিল।

সর্ব-ভারতীয় সংগঠন স্থাপনের আদর্শ

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : রাজা রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম এ্যাডাম ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ইংলণ্ডে জনমত গঠনের জন্য 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (British India Society) নামে যে-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন উহার সহিত জমি-মালিক সমিতি যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। এমনকি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে জমি-মালিক সমিতির পক্ষে ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইবার জন্য টমসন সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর কিছুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া দেশে ফিরিবার কালে টমসন সাহেব তাঁহার সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। তাঁহার নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া বাংলাদেশে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি গড়িয়া উঠে (১৮৪৩)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা এবং আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলির প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করা। জমি-মালিক সমিতি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ছিল অভিজাত ব্যক্তিদের সংগঠন। এজন্য জনসাধারণের মধ্যে এগুলির প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই। তথাপি রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করিতে জমি-মালিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ইওরোপীয়দের বিচার কেবল কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট করিতে পারিত। মফস্বলে কোন ইংরেজ কর্মচারীর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে বিচারপ্রার্থী হওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন চারটি বিল বা আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে ফৌজদারী বিচারালয়গুলিকে ফৌজদারী অপরাধের জন্য যে-কোন ইওরোপীয়কে বিচার করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইল। ইওরোপীয়দের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত এই বিলগুলি আইনে পরিণত হইল না

এইভাবে ন্যায়সংগত সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাংলার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন। ফলে জমি-মালিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একত্রীভূত হইয়া 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (British Indian Association) নামে এক রাজনৈতিক সমিতি জন্মগ্রহণ করিল (১৮৫১)। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পিতা বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

এই সমিতি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইন (Charter Act) পাশ করিবার প্রাক্কালে ভারতের আইনসভা, ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া গঠনের, প্রশাসনিক ও আইন প্রবর্তন ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের শাসন এবং বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট উত্থাপন করিয়াছিল। এই সকল দাবি ব্রিটিশ সরকার স্বীকার না করিলেও আইন প্রবর্তন ও প্রশাসন ক্ষমতা আংশিকভাবে পৃথক করা হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি (১) আইনসভায় ভারতীয়দের গ্রহণ, (২) আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, (৩) শিক্ষার জন্য অধিকতর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, (৪) ভারতে আই সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন চালাইলেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছিল অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সমিতি। ইহা স্বভাবতই কতক পরিমাণে রক্ষণশীল নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিত। তথাপি শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহার আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সমিতির অনুরূপ সমিতি পুনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতির সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। ফলে ইহা এক সর্ব-ভারতীয় রূপ লাভ করিয়াছিল। এই সর্ব-ভারতীয় চরিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন এবং বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে এই সমিতির মতামত গ্রহণ করিতেন।

সর্ব-ভারতীয় চরিত্র

দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন (The National Association) বা জাতীয় সভা নামে একটি সংস্থা কলিকাতার পাইকপাড়ার রাজার বাড়ীতে স্থাপন করা হয়। কিন্তু ঐ বৎসরই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হইলে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

ইণ্ডিয়ান লীগ : ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বাঙালী মনীষী ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দাবি উত্থাপন

করেন। ভারতের শাসন ভারতবাসী চালাইবে, এই রাজনৈতিক ধারণা তাঁহাদের বক্তৃতায় প্রচারিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান ছিল সেগুলির মাধ্যমে এই নূতন রাজনৈতিক



আনন্দমোহন বসু



কৃষ্ণদাস পাল

আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া বাঙালী নেতৃবৃন্দ 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলেন (১৮৭৫)। ইণ্ডিয়া লীগ সামান্য কাল ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রকৃত জাতীয় চরিত্র ইণ্ডিয়া লীগই দিয়াছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাতীয় চরিত্র দান

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক জনসভা আহবান করিয়া 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি নূতন রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার ফলে ইণ্ডিয়া লীগের অবসান ঘটে। সুরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, নব-ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা, ভারতের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোককে ঐক্যবন্ধ করা, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোমরুল লীগ : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ছিলেন সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী। এইভাবে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্থী। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি ছিলেন নরমপন্থী। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হইল। চরমপন্থিগণ কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। পর বৎসর তিলককে ব্রিটিশ সরকার কারাদন্ডে দণ্ডিত করিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিলক 'হোমরুল লীগ' (Home Rule League) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। অপরদিকে অ্যানি বেসান্ত প্রথমে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে হোমরুল লীগ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া কংগ্রেসের সম্মতি পাইলেন না। তিনিও ঐ বৎসরের (১৯১৬ সেপ্টেম্বর মাসেই হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করেন। বোম্বাই,



ফিরোজশাহ্ মেহতা

তিলকের হোমরুল লীগ



বালগঙ্গাধর তিলক



অ্যানি বেসান্ত

কানপুর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি তাঁহার হোমরুল লীগের শাখা স্থাপন করেন। তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত পৃথকভাবে হোমরুল লীগ

স্থাপন করিলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় করা। তিলক ও অ্যানি বেসান্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন।

অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ

তিলকের চেষ্টায় হোমরুল আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক গভীর উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এই আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইলে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণায় ক্রমপর্যায়ে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দান করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস তিলক তথা চরমপন্থীদিগকে পুনরায় সদস্যভুক্ত করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থী মতের বিলোপ ঘটিয়া চরমপন্থী মতের প্রাধান্য ঘটে।

ভারত সেবক সঙ্ঘ বা সার্ভেন্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভেন্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া বা ভারত সেবক সঙ্ঘ নামে একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করেন। দেশমাতৃকার জন্য নির্ভীকভাবে সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইবার মনোবৃত্তি গঠন করা ছিল এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশসেবাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করাই ছিল এই সঙ্ঘের নীতি। এজন্য কাজ ও চিন্তায় দেশকে সর্বাগ্রে স্থাপন করা, দেশবাসীকে ভাই বলিয়া মনে করা, নিজের আয়ের একাংশ দেশের কাজে ব্যয় করিবার প্রতিশ্রুতি দান এবং দেশসেবার মাধ্যমে নিজ স্বার্থসিদ্ধি হইতে বিরত থাকা প্রভৃতি শপথ এই সঙ্ঘের সদস্যদের গ্রহণ করিতে হইত। এইভাবে গোখলে আনন্দমঠের আদর্শকে বাস্তব রূপ দান করিয়াছিলেন।

আনন্দমঠের আদর্শের বাস্তব রূপদান


গোপালকৃষ্ণ গোখলে

বোম্বাই, পুনা ও মাদ্রাজ : বাংলাদেশের পরই বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। ফিরোজশাহ্ মেহতা, বদরুদ্দিন তৈয়বজী, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং—এই তিনজন নেতার নেতৃত্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন (Bombay Presidency Association) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয় (১৮৮৫)। ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার অনেক আগে (১৮৫২) বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন নামে অপর একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমিতি অল্পকালের মধ্যেই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বিলোপ ঘটে। জ্ঞানেশ

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৫)

পুনার সার্বজনীক সভা (১৮৬৭)

বাসুদেব যোশী ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নেতৃত্বে পুনার সার্বজনিক সভা (১৮৬৭), জি. সুব্রহ্মনিয়া আয়ার ও আনন্দ চারলুর নেতৃত্বে মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪) ভিন্ন আরও বহু রাজনৈতিক সংঘ এবং সমিতি ভারতের অপরাপর অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪)



জ্ঞানেশ বাসুদেব যোশী



মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে



জি. সুব্রহ্মনিয়া আয়ার

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা যেমন বাংলাদেশেই হইয়াছিল, রাজনৈতিক সংঘ, সমিতি প্রভৃতি যেগুলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তি অর্জন করিয়াছিল সেগুলির অধিকাংশই বাংলাদেশে বাঙালী মনীষীদের নেতৃত্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশ ও বাঙালী নেতৃত্বের অবদান

(গ) নীলবিদ্রোহ: অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদ-পত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: ইলবার্ট বিল বিতর্ক: ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারত জাতীয় সম্মেলন (Indigo Agitation : Protest against Arms Act and Vernacular Press Act: Ilbert Bill Controversy: All-India National Conference, 1883)

নীলবিদ্রোহ: অত্যাচার-অবিচার যখন সহ্যের মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তখন দুর্বল, নিরীহ সাধারণ মানুষের মনেও কিভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৮-৬০) নীলবিদ্রোহে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাংলাদেশে প্রথম নীলচাষ শুরু করে। তখনও রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম নীল উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। নীল-গাছের চাষ করিয়া নীল উৎপাদন করা তখন অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে নীল রপ্তানি করিয়া প্রচুর লাভ হইত। এজন্য বহু ইংরেজ বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কুঠি স্থাপন করিয়া নীলচাষ করিতে

নীলচাষ প্রবর্তন

প্রবৃত্ত হয়। এই সকল সাহেব নীলকর সাহেব নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের কুঠি নীলকুঠি নামে অভিহিত হইত। বাংলার নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ, মালদহ, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীলচাষ হইত। বিহারের কোন কোন অঞ্চল এবং বারাণসীর নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানেও নীলচাষ করা হইত।

নীলকর সাহেবরা জমি ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে যেমন নীলচাষ করিত, আবার কৃষকদিগকে অর্থ দাদন দিয়া তাহাদের জমিতে নীলচাষ করিবার শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করাইয়া লইত। নিজেদের জমিতে চাষকে বলা হইত 'নিজ-আবাদ চাষ' আর চুক্তি-বদ্ধ কৃষকদের জমিতে চাষকে বলা হইত 'রায়তি চাষ'। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া সেই অঞ্চলের রায়তদিগকে নীলচাষ করিতে বাধ্য করা হইত। নিজ-আবাদ চাষে দেশীয় প্রজাবর্গকে জোরজবরদস্তি করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বা অতি সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করান হইত। রায়তি চাষের ক্ষেত্রে সামান্য অর্থ দাদনের বিনিময়ে রায়তদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উর্বর জমিতে নীলচাষ করিতে এবং অতি সামান্য দামে উৎপন্ন নীল ফসল নীলকর সাহেবদিগকে দিতে হইত। বাজার দরের এক-তৃতীয়াংশ দামও রায়তদিগকে দেওয়া হইত না। ইহা ভিন্ন, ফসল নীলকুঠিতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যয়, নীলকর সাহেবদের গোমস্তাদের অবৈধ দাবি মিটাইবার পর নীলচাষীদের হাতে কিছুই থাকিত না। ফলে একবার দাদন গ্রহণ করিলে বংশ পরম্পরায় নীলকর সাহেবদের নিকট ঋণ রহিয়া যাইত। কেহ ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিলে তাহাও গ্রহণ করা হইত না। ইহার ফলে রায়তগণ নীলকর সাহেবদের ভূমিদাসে পরিণত হইত।

নিজ-আবাদ চাষ ও রায়তি চাষ

নীলচাষী রায়তগণ ভূমিদাসে রূপান্তরিত

নীলচাষ যতই লাভজনক হইয়া উঠিতে লাগিল নীলকর সাহেবরা ততই বেশি পরিমাণ জমি নীলচাষের অধীনে আনিতে চাহিল। এজন্য রায়তদের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া দিয়া সেই জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করা হইত। নীল-চাষে অবহেলা করিলে বা সময়মত যোগান না দিতে পারিলে রায়তদের ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর দৈহিক নির্যাতন করা হইত। এই নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক রায়ত মারা যাইত। নীলকর সাহেবরা একদল করিয়া পশ্চিমী লাঠিয়াল রাখিত। রায়তদের উপর নির্যাতন, তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করা, আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া সবকিছুর জন্য এই সকল লাঠিয়ালকে নিয়োগ করা হইত। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও বর্বরতা হইতে রায়তদের পরিবার-পরিজন এমনকি স্ত্রীলোকও রেহাই পাইত না।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার বা সেগুলির প্রতিকার দাবি করিবার সাহস কাহারো ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সবই ছিল নীলকর সাহেবদের পক্ষে নীলকুঠিতে আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিয়া শিকার প্রভৃতি করিয়া আনন্দ-উল্লাস করা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রায় সকলেরই অভ্যাস ছিল। এজন্য কোন রায়ত ইচ্ছা থাকিলেও এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নীলকর

সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইতে সাহস পাইত না। কোন কোন জমিদার রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহারাও রায়তদের পক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেন না। এমনকি উকিল, মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবীও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থিত হইতে চাহিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদিগকেই 'অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট' (Honorary Magistrate) নিয়োগ করা হইত। এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আদালত এমনকি সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন নীলকর সাহেবদের সপক্ষে ছিল। দুই-একজন ন্যায়পরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট এই সকল অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিলেও রায়তদের দুঃখের শেষ ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, এককথায় সমগ্র প্রশাসন নীলকর সাহেবদের সমর্থক

ম্যাজিস্ট্রেট স্যার এশলি ইডেন একবার রায়তদের জমিতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে নীলচাষ বন্ধ করিবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীয়ার কমিশনার এই আদেশের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

স্যার এশলি ইডেন

রায়তগণ নীলচাষের চুক্তি অমান্য করিলে তাহাদিগকে ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ করিবার আইন পাশ করিতে নীলকর সাহেবরা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। প্রথমে সরকার ইহাতে রাজী না হইলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাশ করিয়া (Regulation V of 1830) রায়তগণ নীলচাষে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইবে এবং সেজন্য যথাযথ শাস্তি পাইবে স্থির হইল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আইন (Regulation V of 1830)

এইভাবে যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলাদেশে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিতে লাগিল তখন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপয়িতা ও সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এবং রামগোপাল ঘোষ এইসব অমানুষিক অত্যাচারের কথা জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু প্রকৃত কার্যকরী এবং সক্রিয় নেতৃত্ব আসিল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে বর্তমান নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের সাধারণ পরিবারের দুই ভাইয়ের মধ্য দিয়া।* নীলকর সাহেবদের দেওয়ানের কাজ করিতে গিয়া এই দুই ভাই রায়তদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছা গ্রামবাসী রায়তদিগকে সংঘবদ্ধভাবে নীলচাষ না করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করাইলেন। এভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের পথ এই দুই ভাই প্রদর্শন করিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রায়তগণও নীলচাষ না করিবার শপথ গ্রহণ করিল। নীলকর সাহেব ও তাহার লাঠিয়ালরা চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ করিয়া রায়তদের উপর অত্যাচার করিল। একজন রায়ত প্রাণে মারা গেল। কিন্তু বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় যে-বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইলেন তাহা ক্রমে নদীয়া, যশোহর, পাবনা, মালদহ,

হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান

বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের সক্রিয় নেতৃত্ব : বিদ্রোহের সূচনা

বিদ্রোহের বিস্তার

* মতান্তরে বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর উভয়েই ছিলেন জমিদার বংশের লোক। বিষ্ণুচরণ ছিলেন চৌগাছার এবং দিগম্বর পোড়াগাছার।

রাজসাহীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ঔরঙ্গাবাদ ও বানিয়াগাঁও নামক স্থানের নীলকুঠি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। মালদহেও এইরূপ ঘটনা ঘটিল। উত্তরবঙ্গে নীলবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন ওহাবী নেতা রফিক্ মণ্ডল।

এমতাবস্থায় সরকার নীলবিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। নানা স্থানে পুলিশ ভিন্ন সেনাবাহিনীকেও বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করা হইল। এদিকে নীলকর সাহেবদের সমিতির চাপে সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে এক আইন পাশ করিয়া (Act XI of 1860) দাদন লইবার পর কোন রায়ত নীলচাষ না করিলে তাহাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে এবং কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে স্থির করিলেন। ইহা ভিন্ন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-অবিচার, নীলচাষীদের অসুবিধা প্রভৃতির তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল। এই আইন বিদ্রোহীদিগকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিল। প্রায় বিশ লক্ষ* লোক জীবনমরণ পণ করিয়া নীলচাষ না করিতে এবং নীলকর সাহেবদের সহিত নীলচাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হইতে বা দাদন না লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আইনটি আর বলবৎ রাখিলেন না। তদন্ত কমিশন বা নীল কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলার ছোট লাট (Lieutenant Governor) জে পি. গ্রান্ট রায়ত এবং নীলকর সাহেব উভয়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুপারিশ করিলেন। এগুলি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এক আইনে সন্নিবিষ্ট হইল। অবশ্য এই আইনে নীলকর সাহেবদের স্বার্থের দিকটাই বেশি দেখা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও নীলচাষ আর বেশিদিন চলিল না। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নীলচাষও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। বিহারে অবশ্য আরও বেশ কিছুকাল নীলচাষ চলিতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের ন্যায় বিহারের রায়তগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জকিতিয়া নামক গ্রামে সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আইন (Act XI of 1860)

বিশ লক্ষ লোকের বিদ্রোহে যোগদান

নীল তদন্ত কমিশন. ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের আইন

কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীলচাষের অবসান

বিহারে নীলবিদ্রোহ

বাংলাদেশে নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি অভিমানী ইংরেজগণ নিজ দেশে আইন করিয়া দাসপ্রথা যখন তুলিয়া দিয়াছিল ঠিক সেই সময়ে তাহারা বাংলা ও বিহারে নূতন করিয়া এক দাসত্বপ্রথা চালু করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ক্ষমতা নীলকর সাহেবদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া

বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্কময় অধ্যায়

* "20 lakhs of poor ryots combined and resolved, even at the sacrifice of their hearth and homes, nay of their lives, not to cultivate their lands with indigo, nor to enter into any fresh contract with the planters for the same." *Ibid.*, p. 931.

বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকর সাহেবদের সন্ত্রাসের কাহিনী এবং নিরীহ দেশীয় প্রজাবর্গের ও তাহাদের পরিবার-পরিজনের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দর্পণের ন্যায়ই সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। নীলদর্পণ তদানীন্তন ভারতে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। রেভারেণ্ড জে লং-এর তত্ত্বাবধানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এজন্য রেভারেণ্ড লং-কে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে এবং অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'

নীলবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। শত অত্যাচার করিয়াও নীলচাষীদিগকে দমনে ব্রিটিশ সরকার ও নীলকর সাহেবদের ব্যর্থতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি প্রমাণিত করিয়াছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের ইহা ছিল সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা। পরবর্তী কালে এই অস্ত্রই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তরভাবে মহাত্মা গান্ধী সর্ব-ভারতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নীলবিদ্রোহ মূহ্যমান শিক্ষিত বাঙালী জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জাতীয়তা-বোধের এক গভীর প্রভাব নীলবিদ্রোহের মাধ্যমে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম সুদৃঢ়, সফল পদক্ষেপ ছিল এই নীলবিদ্রোহ।

নীলবিদ্রোহ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলনের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত

জাতীয়তাবোধের বিস্তার

অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : লর্ড লিটন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৭৬-৮০) নিযুক্ত হইয়া আসিলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলীর (Disraeli) সাম্রাজ্যবাদী, রক্ষণশীল নীতির প্রয়োগ ভারতবর্ষেও শুরু হইল। তাঁহার শাসনকালে ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী কয়েকটি আইন প্রবর্তিত হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে বার্লিন চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিয়াছিল বটে; কিন্তু তুরস্কের মিত্র হিসাবে এই চুক্তি সম্পাদনে সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী তুরস্কের নিকট হইতে সাইপ্রাস দখল করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধাদি বাহির হয়। ইহা ভিন্ন, লিটনের আফগান-নীতি, শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশের কঠোর সমালোচনা বিশেষভাবে বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ কোন মন্তব্য বা তথ্য যাহাতে ছাপাইতে না পারে সেজন্য 'দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) পাশ করিলেন। এই আইন দ্বারা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক বা সামাজিক

দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

বিষয়ে সমালোচনা করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। বাংলাভাষায় সংবাদ-পত্রগুলিই ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত সর্বাপেক্ষা বেশি। বলা বাহুল্য, বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলি সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী চেতনার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছিল। এগুলিকে দমন করাই ছিল লিটন-প্রবর্তিত দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের মূল উদ্দেশ্য। অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল সমসাময়িককালের সর্বাপেক্ষা নির্ভীক, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাংলাভাষায় মুদ্রিত পত্রিকা। লিটনের সংবাদপত্র আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা এক রাত্রিতে বাংলা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিস্তারে অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান ছিল অপরিসীম।

অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান

ঐ বৎসরই (১৮৭৮) লর্ড লিটন অস্ত্র আইন (Arms Act) পাশ করিয়া ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বা বহন করা নিষিদ্ধ করেন। ইওরোপীয়রা অবশ্য এই আইনের আওতার বাহিরে ছিল। এইভাবে অস্ত্র আইন একদিকে যেমন ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ইওরোপীয় তথা ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

অস্ত্র আইনে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্য

ইংরেজ জাতির ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে যে ধারণা তখনও বিদ্যমান ছিল, তাহা লর্ড লিটনের উপরি-উক্ত দুইটি বৈষম্যমূলক এবং দমনমূলক আইন প্রবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল। লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের দিক দিয়া শাপে বর হইল। দুই বৎসর পূর্বে (১৮৭৬) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ করা হইলে সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে এত অল্প বয়সে এই পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র ভারতে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে বক্তৃতা দিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা বাড়াইবার এবং ভারতেও এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক এই দাবি করিলেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করা। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের সুবিশাল জনসমাজ জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ নির্বিশেষে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। এই ঐক্যের মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সর্ব-ভারতীয় ঐক্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই আন্দোলন ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপরি-উক্ত দাবি পেশ করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান হইল। লণ্ডনে এক বিশাল জনসভায় লালমোহন ঘোষের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এক দারুণ প্রভাব বিস্তার করিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আই. সি. এস. নিয়োগসংক্রান্ত নিয়মকানুনের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল।

অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

এইরূপ সময়ে লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইন প্রবর্তিত হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইল। কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু প্রতিনিধি যোগদান করিয়া সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের প্রমাণ দিলেন। লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন বাতিল করিবার প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সম্বলিত স্মারকলিপি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপনের শাসনকালে (১৮৮০-৮৪) লিটন-প্রবর্তিত দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এই সাফল্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

কলিকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভা

দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

জাতীয় আন্দোলন উৎসাহিত



লর্ড রিপন

ইলবার্ট বিল বিতর্ক : ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ যখন এক শক্তিশালী প্রভাবে পরিণত হইয়াছে সেই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ উপস্থিত হইল। লর্ড রিপন ছিলেন উদারপন্থী শাসক। তাঁহার শাসনকাল কতকগুলি উদারনৈতিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ফৌজদারী আইনবিধি অনুসারে কোন ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ (Sessions Judge) ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। দশ বৎসর পর (১৮৮৩) লর্ড রিপনের আমলে এই ব্যাপার লইয়া এক জটিল সমস্যা দেখা দিল। ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ দায়রা বিচারকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অথচ জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে তাঁহাদিগকে ইওরোপীয়দের বিচার করিতে দেওয়া হইত না। এই অযৌক্তিক বৈষম্যের প্রতি স্বভাবতই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পতিত হইল। লর্ড রিপন এই জাতিভেদমূলক, যুক্তিহীন বৈষম্য দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদানীন্তন আইনসদস্য স্যার ইলবার্ট (Sir Ilbert) একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহা 'ইলবার্ট বিল' (Ilbert Bill) নামে খ্যাত। এই আইনের খসড়ায় ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজদিগকে ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইল।

ইলবার্ট বিলে ভারতীয় ও ইওরোপীয় বিচারকদের ক্ষমতার বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা

ইলবার্ট বিলে জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতার তারতম্য দূর করিবার নীতি গৃহীত হইলে ইওরোপীয়রা ইহা অপমানজনক মনে করিয়া ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরোধিতা শুরু করিল। তাহারা 'ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন', অর্থাৎ প্রতিরক্ষা সমিতি (Defence Association) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া ইওরোপীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইল। তাহারা লর্ড রিপনকে নানাভাবে বিব্রত করিয়া তুলিল, এমনকি পরোক্ষভাবে তাঁহাকে অপমান করিতেও তাহারা ছাড়িল না। পরিস্থিতির চাপে রিপন ইলবার্ট বিলের কতক পরিবর্তনসাধনে বাধ্য হইলেন। স্থির হইল যে, ভারতীয় বা ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা দায়রা জজের আদালতে বিচারের কালে ইওরোপীয়গণ জুরী (Jury) দ্বারা বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে। সেই জুরী অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া গঠিত হইবে। এইভাবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করিবার জন্য রিপনের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হইল।

ইওরোপীয়দের প্রতিবাদ আন্দোলন

ইলবার্ট বিলের পরিবর্তনসাধন

ইলবার্ট বিল লইয়া ইওরোপীয়গণ যখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ জাতীয় নেতা এই বিল সমর্থন করিয়া এক প্রতি-আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। ইলবার্ট বিলের কতকগুলি ধারা শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হইলে ভারতীয়দের আন্দোলন সফল হইল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে অভাব-অভিযোগ দূর করিবার শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে সরকারকে যে নতি স্বীকার করিতে হয় একথা ইওরোপীয়দের আন্দোলনের সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছিল। সঙ্ঘবদ্ধ সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিতে বাধ্য করা সম্ভব এই শিক্ষা ভারতীয়রা লাভ করে। ইলবার্ট বিল লইয়া যে-আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঐক্য আরও দৃঢ় করিয়াছিল। ইহাই ছিল ইলবার্ট বিল আন্দোলনের গুরুত্ব।

ভারতীয়দের ইলবার্ট বিল সমর্থন

ইলবার্ট বিল আন্দোলনে শিক্ষা

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন : নীলবিদ্রোহ, অস্ত্র আইন, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন প্রভৃতি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে ক্রমেই সর্ব-ভারতীয় রূপদান করিয়াছিল। জাতীয় ঐক্যবোধ, সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ভারতবাসী যখন উপলব্ধি করিয়াছে সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে

সর্ব-ভারতীয় ও জাতীয় ভিত্তিতে স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন

'ভারতের জাতীয় সম্মেলন' (Indian National Conference) নামে এক জাতীয় সম্মেলন কলিকাতার এলবার্ট হলে আহ্বান করিলেন (ডিসেম্বর ২৮-৩০)। বাংলাদেশের প্রতিনিধি ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশের প্রতিনিধিরা এই জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য একটি জাতীয় তহবিল খোলা হইল। এই সম্মেলনে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়া দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, বেকার সমস্যার সমাধান, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতে শিল্প ও কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়। এইভাবে একটি স্থায়ী সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ খ্রীঃ
(Foundation of the Indian National Congress, 1885)

কংগ্রেসের উৎপত্তি : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বা ভারতের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সময়ে মিঃ এলান অক্টাভিয়ান হিউম (Mr. Allan Octavian Hume) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদিগকে (Graduates) উদ্দেশ্য করিয়া এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে ভারতবাসীর মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার উপদেশ তিনি দেন। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ডাফরিণ (১৮৮৪-৮৮) নিজেও এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত ছিলেন। বস্তুত, তিনিই মিঃ হিউমকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দিয়াছিলেন।* শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত ও মনোভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই জানিতে পারা যাইবে, এই ছিল তাঁহার ধারণা। মিঃ হিউম এবং সেই সময়কার শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভারতীয়দের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয়

মিঃ এলান অক্টাভিয়ান হিউমের খোলা চিঠি

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

* Vide *The British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. X, Part II, p. 530

কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসে। বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ উমেশচন্দ্র বনার্জী (Mr. W. C. Bonnerjee) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

সাধারণ্যে এই ধারণাই প্রচলিত যে, মিঃ হিউম-ই ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জনক। কিন্তু কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যান্য আরও অনেক মতবাদ



লর্ড ডাফরিণ



অক্টাভিয়ান হিউম



উমেশচন্দ্র বনার্জী

আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর দরবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছিল। আবার কাহারো কাহারো মতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল উহা হইতেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছিল। অ্যানি বেসান্তের মতে মাদ্রাজে থিওসোফিক্যাল কনভেনশন (Theosophical Convention) নামে যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে যে সতরজন ভারতীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন। অ্যানি বেসান্ত সুরেন্দ্রনাথকে ঐ সতরজন নেতার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিলেও সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ সময়ে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এইভাবে নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কংগ্রেসের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একথার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুরেন্দ্রনাথ তথা তাঁহার ইণ্ডিয়ান

কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত

এ্যাসোসিয়েশন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে ভারতের জাতীয় সভার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বীজ উপ্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া কলিকাতায় ভারতের বিভিন্ন অংশের লোকের উপস্থিতির সুযোগ লইয়াছিলেন। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতের জাতীয়তাবোধ যখন স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হইবার

সুরেন্দ্রনাথের ভারতের জাতীয় সম্মেলন জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত

পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশন ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হয়। তার পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণী সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত ছিল ভারতের জাতীয় সম্মেলন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। মিঃ অক্টাভিয়ান হিউম উদ্যোগী হইয়া সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী ধারণাকে সংগঠিত রূপদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিঃ হিউম লর্ড লিটনের দমনমূলক নীতির ফলে ভারতবাসীর মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল উহার ফলে কোন গণবিদ্রোহ যাহাতে ঘটিতে না পারে সেজন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া কংগ্রেসের ন্যায় একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস দেশকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করুক একথা তাঁহার কল্পনায় স্থান পায় নাই। বরঞ্চ ব্রিটিশ শাসনকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে মিঃ হিউমের প্রকৃত উদ্দেশ্য

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশনের পর হইতে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর ভারতের কোন-না-কোন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ প্রধানত দুইটি মূল নীতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল : (১) সরকারী কার্যকলাপের ও সরকারের নীতির সমালোচনা এবং (২) ভারতবাসীদের উন্নতি সাধনের জন্য সংস্কার দাবি করা। প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল সেই সময়কার কংগ্রেস সদস্যদের কর্মপন্থা। দেশবাসীর দারিদ্র্য, লর্ড লিটনের অস্ত্র আইন, আবগারি শুল্ক, লবণ কর প্রভৃতি ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা ও সংস্কার কংগ্রেস দাবি করিতে লাগিল। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দান, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে একই সঙ্গে

প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের কার্য-কলাপের পশ্চাতে দুইটি মূলনীতি : সমালোচনা ও সংস্কার দাবি

কংগ্রেসের বিভিন্ন দাবি

আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ, শাসনব্যবস্থায় উচ্চকর্মচারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রভৃতি দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনায় বা সংস্কার দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সংযত এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে ত্রুটি করিলেন না। ভারতবাসীর দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করিয়া তোলাই ছিল তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

প্রথম দিকে সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অধিবেশনে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বনার্জী প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হইবার পূর্বদিন পর্যন্ত কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল সেজন্য বাঙালী নেতৃবৃন্দের অনেকেই বোম্বাই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথম অধিবেশনে অপরাপর সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, কে. টি. তেলাং এবং আর. এম. সায়ানি ও এ. এম. ধরমসি নামক দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কংগ্রেসের আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সভাপতি উমেশচন্দ্র বনার্জী (১) ভারতের বিভিন্নাংশের দেশসেবকদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপন, (২) পারস্পরিক পরিচিতি ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, প্রদেশগত যাবতীয় সংকীর্ণতা দূর করিয়া ভারতের সকল দেশপ্রেমিকের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করিয়া সুদৃঢ়ভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন, (৩) দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করা, এবং (৪) পরবর্তী এক বৎসর কংগ্রেস দেশবাসীর স্বার্থে কি কর্মপন্থা অনুসরণ করিবে তাহা স্থির করা—এই চারিটি কথার উল্লেখ করেন।*

কংগ্রেসের আদর্শের ব্যাখ্যা (১৮৮৫ খ্রীঃ)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করিলে ভারতের জাতীয় সম্মেলন ও কংগ্রেস একীভূত হইয়া পড়ে। তখনও সরকার কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এই অধিবেশন শেষে লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তৃতীয় অধিবেশনের (১৮৮৭) পর মাদ্রাজের গভর্ণরও অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব প্রথম পর্যায়ে এইরূপ ছিল।

কংগ্রেসের প্রতি সরকারের সহানুভূতি

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে স্বদেশী জিনিসপত্রের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিবার জন্য একটি

* *Ibid.* p. 537.

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক দোষত্রুটি দূর করিবার জন্য কংগ্রেস একটি সামাজিক সম্মেলনও আহ্বান করে। এইভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন যখন ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ এবং শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল তখন কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মনোভাবও পরিবর্তিত হইয়া গেল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ ও পত্র-পত্রিকা কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল। এমনকি, সেই সময় হইতেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। লণ্ডনের 'দি টাইমস্' (The Times) পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার অর্থ ছিল ভারতীয়দিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করা। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি কংগ্রেসের এই বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে না। ইহা ভিন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনে দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'দি টাইমস্' পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন মুসলমানও যোগদান করেন নাই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ সর্বপ্রথম এইভাবে ছড়াইবার চেষ্টা শুরু হইয়াছিল।

কংগ্রেসের শক্তি সঞ্চয়ে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন

প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের কোন সংবিধান বা গঠনতন্ত্র ছিল না। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ—যথা, দাদাভাই নৌরজী, দিনশ ওয়াচা, ফিরোজশাহ্ মেহতা, অক্টাভিয়ান হিউম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কর্মপন্থা ও কার্যসূচী নির্ধারণ করিতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতার চেষ্টায় কংগ্রেসের 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' (Subjects Committee) গঠন করা হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনার ভারও একটি কমিটির উপর দেওয়া হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দিন তৈয়বজী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনার ব্যবস্থা

কংগ্রেস সরকারের নিকট নানাবিধ দাবি উত্থাপন করিয়া চলিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি ভারতের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের দাবি বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিল। কংগ্রেস ভারতের অগণিত অশিক্ষিত, দরিদ্র জনগণের মুখপাত্র বলিয়া দাবি করিল। কিন্তু সরকার ইহাতেও অবহিত হইল না. কংগ্রেসের দাবি তাহারা এড়াইয়া চলিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মিঃ অক্টাভিয়ান হিউম সরকারের মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সরকারকে কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রয়োজনসম্পর্কে শিখাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকার সেই শিক্ষাগ্রহণে রাজী নহে।*



বদরুদ্দিন তৈয়বজী

* "The National Congress had endeavoured to instruct the Government, but the Government refused to be instructed." *An Advanced History of India*, p. 890. 3rd Ed.

কংগ্রেসের প্রাথমিক চেষ্টায় কোন ফল হইল না দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই কংগ্রেসের দাবির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরু করিল। এজন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি ব্রিটিশ কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ড হইতে 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইল (১৮৯০)। ইহা ভিন্ন, ভারত সম্পর্কে সভা-সমিতিতে বক্তৃতার কাজও চলিল। দাদাভাই নৌরজী তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নামে যে শোষণ চলিতেছে সে-বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইবার কংগ্রেসের দাবির প্রতি ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িল। ইতিমধ্যে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য চার্লস ব্রাডলফ (Charles Bradlaugh) স্বয়ং যোগদান করিলেন। পর বৎসর তিনি কংগ্রেসের দাবির ভিত্তিতে ভারতের আইনসভাগুলির সম্প্রসারণের জন্য নিজে একটি বিল বা আইনের প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার নিজেই একটি বিল উত্থাপন করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহা পাশ করিল। এই আইন 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট' (India Councils Act) নামে অভিহিত। ইহাই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সর্বপ্রকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে আন্দোলনের ব্যবস্থা

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট

'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট' অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি করা হইল। অবশ্য এই সংখ্যাবৃদ্ধি কংগ্রেসের দাবির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ছিল। কিন্তু এই আইন অনুসারে বর্ধিত সদস্যসংখ্যা গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবেন, একথা স্বীকৃত হইল। লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪) নির্বাচনের মাধ্যমেই এই নূতন সদস্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সামান্য ব্যবস্থায় কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কংগ্রেসী আন্দোলন পূর্ববৎ চলিল।

কংগ্রেসী দাবির আংশিক স্বীকৃতি

এযাবৎ কংগ্রেস আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের, অনুরোধ-উপরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নিষ্ক্রিয় নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সরকার-বিরোধী মনোভাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি ত্যাগ করিয়া কার্যকরীভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, জাতীয়তাবোধ এবং ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিলক

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিতে অসন্তোষের সূচনা

'কেশরী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তিলক শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসীকে শিবাজীর দেশাত্মবোধ, বীরত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা মারাঠা জাতির মধ্যে এক অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। সামান্য কাল পূর্বে মারাঠা জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে যোগদানে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি।* তিলক ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ।

তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শুরু করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কংগ্রেস কুড়িটি অধিবেশনে শাসনসংস্কার, ভারতীয়দের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠন প্রভৃতি দাবি-দাওয়া উত্থাপিত করিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর একই ধরনের দাবি-সম্বলিত প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাহা পেশ করিতেছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট ভিন্ন অপর কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার কংগ্রেস আদায় করিতে সমর্থ হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবর্গের অধিকাংশই তখন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থাবান ছিলেন। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি স্বীকার করাইয়া লইবার নীতিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের এই নীতি তেমন সাফল্যলাভ না করিলেও ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তা-বোধ জাগাইয়া তুলিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইহা ভিন্ন, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আইনসভায় ফিরোজশাহ্ মেহ্তা, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতা নির্বাচিত হইয়া ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ, রাজনৈতিক দাবি প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারের সম্মুখে সরাসরি উপস্থাপিত করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশনে কংগ্রেস দাবির মাত্রা আরও বাড়াইল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তখন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই চলিতেছিল। অনেক পূর্বেই বাংলার মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ-হীনতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের সাফল্য বিচার

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠন



অশ্বিনীকুমার দত্ত

* *Idem.*

কিন্তু তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতা কর্তৃক কংগ্রেসকে সক্রিয় আন্দোলনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি হয়। সংস্কার আদায়ের জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া বার বার ব্রিটিশের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই অসন্তোষ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

নূতন চেতনার সৃষ্টি

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খ্রীঃ
(Partition of Bengal, 1905)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক গভীর জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যখন জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল সেই সময়ে জাপানের হস্তে রাশিয়ার পরাজয় সমগ্র এশিয়ায় এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ, জাপান সর্বত্র বৈদেশিক প্রভাব বা অধীনতা মুক্ত হইবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি করিল। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ছিল জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল আন্তর্জাতিক ঘটনা বাঙালী জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া তোলে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব : এশিয়ার সর্বত্র জাতীয়তাবাদী প্রভাব

সেই সময়ে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ছিলেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়। তিনি ছিলেন স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার শাসনকালে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন-নীতি, জনমত উপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন, সর্বোপরি তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ দান করিল। বাংলার জাতীয়তাবাদ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল। লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, কলিকাতা পৌরসভার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে তাঁহার কটূক্তি এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। কিন্তু তাঁহার বাংলা ব্যবচ্ছেদ অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে দারুণ বিক্ষোভ ও ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল উহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন



লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধকে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই বাঙালী জাতিকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে। পূর্ববঙ্গের শহর, নগর, গ্রাম সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কার্জনের পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব ছিল এজন্য ইহার প্রতিবাদ পূর্ববঙ্গেই অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ভবিষ্যতে এই জাতীয়তাবোধ যে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে একথা উপলব্ধি করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা

বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ

এদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও বাংলা ও বাঙালীর এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সামিল হইল। বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করিল। এই পরিস্থিতিতে সরকার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলা ব্যবচ্ছেদের গোপন ব্যবস্থা করিয়া চলিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতেই কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার কতক কতক সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙালী জাতি তখন হইতেই ইহার বিরোধিতা শুরু করে। ঐ বৎসর জুলাই মাসে সরকার বাংলা ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। (এই ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে কার্জনের যুক্তি ছিল এই যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বিশাল প্রদেশের শাসনভার একই ব্যক্তি অর্থাৎ গভর্ণরের উপর ন্যস্ত রাখা শাসনকার্যের দক্ষতার দিক দিয়া উচিত নহে। এজন্য বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং দার্জিলিং—এক কথায় উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (Eastern Bengal and Assam) নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হইল। এই প্রদেশটির শাসনভার একজন ছোটলাট বা লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের (Lieutenant Governor) উপর থাকিবে, ঢাকা শহর হইবে এই নূতন প্রদেশের রাজধানী। পক্ষান্তরে, মূল বাংলা প্রদেশ বিহার-উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিবে।)

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রীঃ)

পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নূতন প্রদেশ গঠন

(শাসনের সুবিধার অজুহাত দেখান হইলেও লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের জাতীয়তাবাদী ঐক্য বিনষ্ট করা। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আসামের সহিত সংযুক্তির ফলে যে নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া এবং

সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর ঐক্যবোধকে আঘাত করা হইয়াছিল। অন্যদিকে বিহার-উড়িষ্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া মূল বাংলা প্রদেশেও বাঙালীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছিল। বস্তুত, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইলে বাংলাদেশ হইতে বিহার এবং উড়িষ্যাকে পৃথক করিলেই চলিত এবং তাহাই ছিল যুক্তিসম্মত। কিন্তু বাঙালীকে দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালীর জাতীয় ঐক্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য দুই-ই বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দেশবিভাগ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে কার্যকরী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

শাসনকার্যের সুবিধা অজুহাত মাত্র: বাঙালীর জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আঘাত করা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিনাশ করা মূল উদ্দেশ্য

বঙ্গদেশ
(বঙ্গভঙ্গের পর)
বঙ্গদেশ
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ
ডিব্রুগড়
তেজপুর
ব্রহ্মপুত্র নদ
রংপুর
গৌহাটী
শ্রীহট্ট
ভাগলপুর
মণিপুর
ময়মনসিংহ
ব্রহ্মদেশ
ঢাকা
বর্ধমান
রাঙ্গামাটি
খুলনা
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
ব ঙ্গো প সা গ র
ভুবনেশ্বর

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া: স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ বাঙালী জাতির তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐক্যের উপর এক কঠিন আঘাতস্বরূপ ছিল। কিন্তু সেইদিন বাঙালী জাতি এই আঘাতের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে ত্রুটি করে নাই। বাঙালী জাতি বঙ্গভঙ্গকে দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের মতই এক মর্মন্তুদ ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইল। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শহরে, নগরে, গ্রামে সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে। বাঙালী মনীষী সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলনের শুরু হয়। তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রিকা, এবং 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক জাতীয় বিপর্যয়

বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্যের উপর কঠিন আঘাত

ও সর্বনাশাত্মক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করে। প্রথমদিকে ইংরেজ রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকায়ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটস্‌ম্যান', 'পাইওনিয়ার' প্রভৃতি পত্রিকা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এমনকি, ইংলণ্ডের 'লণ্ডন ডেইলি নিউজ' (London Daily News), 'দি লণ্ডন টাইমস্' (The London Times), 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' (Manchester Guardian) প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালী জাতির মতামত উপেক্ষা করিয়া নূতন প্রদেশ গঠনকে লর্ড কার্জনের দূরদর্শিতার কাজ হয় নাই এবং ইহার ফলে গঠিত দুইটি প্রদেশেই গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিবে, একথা উল্লেখ করা হয়। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স" (The Bengal National Chamber of Commerce) নামক ইংরেজ বণিক সভাও ইহার প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করে নাই।

দেশীয় ও বিদেশীয় পত্র-পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরূপ সমালোচনা

এদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হইল তাহাতে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ধনী-দরিদ্র, শহরবাসী, গ্রামবাসী সকলেই সমান উৎসাহ লইয়া যোগদান করিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বাংলাদেশের 'মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লর্ড কার্জন এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি কুটচালে ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নূতন প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু নবাব সলিমউল্লাহই সেই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি হইবেন এবং তাঁহার নিজ শহর ঢাকা এক সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হইবে এই প্রলোভনে তাঁহাকে দলে টানিলেন। ফলে মুসলমানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনে অর্থাৎ বিলাতী জিনিসমাত্রেই বর্জন এবং স্বদেশজাত জিনিসপত্র ব্যবহারের জন্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল, ইংরেজগণ তখন বঙ্গভঙ্গের সমর্থন শুরু করিল। কিন্তু তাহাতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বা ব্যাপকতা হ্রাস পাইল না।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব. হিন্দু-মুসলমান, শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র সকলের আন্দোলনে অংশগ্রহণ

লর্ড কার্জন কর্তৃক ঢাকার নবাবকে নিজ পক্ষে আনয়ন : সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ার সূচনা

প্রতিবাদে যখন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল না তখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী এক সক্রিয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব করিলেন। মফস্বল অঞ্চলেই বয়কট আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে এক বিরাট জনসভায় (জুলাই ১৭, ১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রস্তুত সামগ্রী বয়কট করা অর্থাৎ ব্যবহার না করার এবং ছয় মাসের মধ্যে কোন আনন্দানুষ্ঠানে যোগ না দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে প্রস্তাব করিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য ব্রিটিশ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ

বয়কট আন্দোলনের সূচনা : বাগেরহাটে সভা

পন্থা হইল বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করা। এইভাবে বিলাতী সামগ্রী বর্জনের নীতি গৃহীত হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লালমোহন ঘোষ ভিন্ন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নাম বয়কট আন্দোলন কার্যকরী করিবার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



কৃষ্ণকুমার মিত্র



কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

বয়কট আন্দোলন কেবল বিলাতী পণ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। দিনাজপুরে তথাকার মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভায় (জুলাই ২১, ১৯০৫) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, পঞ্চায়েত প্রভৃতির সদস্য এবং সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (Honorary Magistrate)-কে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইয়া এবং পরবর্তী বার মাস জাতীয় শোক কাল হিসাবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্নাঞ্চলে দিনাজপুর ও বাগেরহাটের প্রস্তাবসমূহের অনুকরণে প্রস্তাব গৃহীত হইলে বয়কট আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররাও সভায় সমবেত হইয়া বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ এবং বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন। আগস্ট মাসের ৭ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনসমাগম ক্রমশ বাড়িতে থাকিলে টাউন হলের বাহিরে আরও দুইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে হয়। টাউন হলে সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বাহিরের দুইটি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। কলিকাতার ছাত্রসমাজের এক বিরাট সংখ্যা সেইদিন কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া শোকযাত্রার ন্যায় শোভাযাত্রা করিয়া টাউন হলের সভায় যোগদান করে। 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা', 'একতাই বল', 'বন্দেমাতরম্,' 'বঙ্গভঙ্গ চাই না' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া তাহারা সেইদিন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নূতন শক্তি দান করিয়াছিল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গভঙ্গকে বাঙালী জাতির এক চরম দুর্দৈব বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ঐ বৎসর পুণ্য মহালয়ার দিন (সেপ্টেম্বর ২৮) কালীঘাটের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত বাঙালী শপথ

দিনাজপুরে সভা

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের বয়কট আন্দোলন সমর্থন

৭ই আগস্ট, ১৯০৫ কলিকাতা টাউন হলের সভা : বয়কট সমর্থন

লইয়াছিলেন "বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিব না, বিদেশীয়দের দোকান হইতে কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিব না" ইত্যাদি। কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গকে অন্যায়মূলক, অপ্রয়োজনীয়,



মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯)



অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২)

স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ বলিয়া নিন্দা করা হইল এবং মফস্বলের শহরাদিতে যে বয়কট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হইয়াছিল তাহা সর্ববাদিসম্মতভাবে সমর্থিত হইল। এইভাবে বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার ছাত্রসমাজ বিলাতী দ্রব্যাদি যাহাতে কেহ ক্রয় না করে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং শুরু করিল।

ক্রমে বয়কট আন্দোলন সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইল। বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীলোকগণ স্থির করিলেন, রেশমী চুড়ি অর্থাৎ বিলাতী কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি আর ব্যবহার করিবেন না।* বরিশালে উড়িষ্যাবাসী পাচকগণ 'সাহেবীখানা' প্রস্তুত করিবে না স্থির করিল। অনুরূপ ফরিদপুরের মুচী সম্প্রদায় বিলাতী জুতা মেরামত করিতে রাজী হইল না। কালীঘাটে ধোপারা বিলাতী কাপড় না ধুইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হিন্দু পুরোহিতগণ পূজাপার্বণে বিলাতী লবণ, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করা ধর্ম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম সর্বত্র বয়কট আন্দোলন এক সর্বাত্মক বিলাতী বর্জনে পরিণত হইল।

সামাজিক ক্ষেত্রে বয়কট প্রসারিত

বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের আবার দুইটি পৃথক দিক ছিল - যথা, (১) বিলাতী পণ্যদ্রব্য বয়কট করিয়া, বিশেষভাবে ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বর্জন করিয়া, ইংরেজ জাতিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তাহার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। (২) বিলাতী সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিয়া ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বয়কট আন্দোলন একটি নেতিবাচক আন্দোলন। বিলাতী পণ্য বর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতী সামগ্রীর স্থান গ্রহণ না করিতে পারিলে বয়কট আন্দোলন অর্থহীন হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। এজন্য বয়কট

বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

* এই সূত্রে কবি মনোমোহন চক্রবর্তীর 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরো না' গানটি উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে শুরু হইল স্বদেশী আন্দোলন। সুতরাং বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন একটি অপরটির পরিপূরক ছিল। বয়কট ও স্বদেশী একই আন্দোলনেরই দুইটি দিক। একটি নেতিবাচক (negative) অপরটি ইতিবাচক (positive)। বিলাতী জিনিসপত্র বর্জন করা এবং স্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় করা ছিল এই আন্দোলনের দুইটি ধারা। এই আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, বিলাতী কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রকাশ্য স্থানে অগ্নিসংযোগ করা প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার ছাত্রসমাজ সর্বত্র এক জাতীয়তাবাদী উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার অবদানও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' (Dawn Society) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দেশমাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মহামন্ত্র রূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই মহামন্ত্রের প্রভাবে একদিকে যেমন বাঙালী জাতি ও ক্রমে সমগ্র ভারতবাসী এক নবশক্তি লাভ করিল অপরদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্তরে ইহা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনায় ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালী জাতিকে

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন পরস্পর পরিপূরক

ছাত্রসমাজের অবদান

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের প্রভাব



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশী আমলে)



শিবনাথ শাস্ত্রী

উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অনেকের রচিত জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। মুকুন্দ দাশ দেশাত্মবোধক গান গাহিয়া বাংলার, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন। দাক্ষিণাত্যে কবি সুব্রহ্মনিয়া ভারতী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও

স্বদেশী সঙ্গীতের প্রভাব

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বাঙালী জাতির অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিলাতী পোশাকধারী বাঙালী বিদেশী পোশাক পরিত্যাগ করিয়া, নারী জাতি গৃহস্থালীর কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, ছাত্রসমাজ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া দিয়া, উকিল-মোক্তার বিচারালয় ত্যাগ করিয়া, এমনকি বহু সংখ্যক জমিদার-ব্যবসায়ী নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এইভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক সর্বাত্মক আন্দোলনে পরিণত হইল।

আন্দোলনের ব্যাপকতা

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ঔষধের কারখানা, চিনি, লবণ, দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা এবং বহু বৃহদায়তন ও কুটির শিল্প গড়িয়া উঠিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুন্দরীমোহন দাশ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বাঙালী মনীষী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন।

দেশীয় শিল্পোন্নয়ন

বাঙালী মনীষীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ



সুরেন্দ্রনাথ ভাবতী



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও—অর্থাৎ বিলাতী সামগ্রী বর্জন ও দেশীয় সামগ্রী ব্যবহার এবং সেজন্য দেশীয় শিল্পোন্নয়ন এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও ক্রমে ইহা দেশীয় সবকিছুর প্রতি এক গভীর মমত্ববোধে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। তবে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রভাবেই এই মমত্ববোধ জাগিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব ও উঁহার সমর্থকদিগকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনের সহিত হিন্দুদের সহিত সমভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে কলিকাতার রাজাবাজারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় মুসলমান সম্প্রদায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিশীল নহে ইংরেজদের এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করা হয়। ইহা ভিন্ন এক প্রস্তাবে একথাও বলা হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায় শুধু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুদের সহিত ঐক্যবদ্ধ। স্বদেশী জিনিসপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন আছে একথাও এই সভায় ঘোষণা করা হয়। লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনভি, মহম্মদ ইস্‌মাইল চৌধুরী প্রমুখ গণ্যমান্য মুসলমানও বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সমর্থন



লিয়াকৎ হুসেন



আব্দুল রসুল

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গভঙ্গ বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী হইয়াছিল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর নবগঠিত আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। ঐ দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র বাঙালীরা উপবাস থাকিয়া উহাকে জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালন করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐদিন 'রাখীবন্ধন' উৎসবের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যে অটুট, বাঙালী মাত্রেই যে ভাই ভাই এই মনোভাবের প্রকাশ করিলেন। বাঙালীরা একে অপরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে বাঙালীরা যে ভাই ভাই এবং তাহাদের ঐক্য যে অটুট এবং উহা কোন শক্তিই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিল। বাঙালী জাতির ঐক্য যে অটুট তাহার প্রতীক হিসাবে ঐদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মতিলাল ঘোষ, লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনভি প্রমুখ বাঙালীর উপস্থিতিতে 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আনন্দমোহন বসু অসুস্থ অবস্থায় এই সভায় উপস্থিত হইয়া ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাখীবন্ধন

ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়া এক সর্ব-ভারতীয় চরিত্র লাভ করে। বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র পশ্চিম-ভারতে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত

করিলেন। বোম্বাই প্রদেশে তিলক ভিন্ন পরাঞ্জপে, শ্রীমতী কেতকার, শ্রীমতী ঘোশী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রাম গঙ্গারাম, পণ্ডিত চাঁন্দ্রকা দত্ত, মুন্সীরাম (পরবর্তীকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি। মাদ্রাজ প্রদেশে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সুব্রহ্মানিয়া আয়ার, আনন্দ চারলু, টি. এম নায়ার প্রভৃতি নেতার চেষ্টায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তৃতি

এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে এবং আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন হিসাবে শুরু হইয়া এক বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী ছাত্রসমাজ অংশগ্রহণ করিলে উহা অত্যধিক শক্তি সঞ্চয় করে। নেতৃবৃন্দের অগ্নিক্ষরা বক্তৃতায় বাঙালী ছাত্রসমাজের অন্তরে দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তাহাদের হস্তে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হইল। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং, বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ, সভাসমিতিতে যোগদান, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া ছাত্রসমাজের দৈনন্দিন কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যুবসমাজ এইভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকারের ভীতির সঞ্চার হইল. তাহারা যুব তথা ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কার্লাইল সার্কুলার (Carlisle Circular) জারি করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা করিল। ছাত্রদের জলপানি (Scholarship) কাটিয়া দিবার, যে যে কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগদান করিবে সেগুলির অনুমোদন নাকচ করিবার, ছাত্ররা পিকেটিং করিলে তাহারা যে স্কুলে বা কলেজে পড়িত সেই সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য এই সার্কুলারে বলা হইল। মিঃ কার্লাইল ছিলেন বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী বা প্রধান সচিব। শিক্ষা-অধিকর্তা মিঃ পেড্‌লার হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) পিকেটিং করিবার দায়ে ছাত্ররা যে কলেজে পড়িত উহার অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। এই সকল সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এক বিরাট সভায় আব্দুল রসুল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা সরকারী আদেশের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন।

বাংলার ছাত্রসমাজকে দমনের চেষ্টা

কার্লাইল সার্কুলার

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

ইহা ভিন্ন, অপর দিক দিয়াও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। বহু ছাত্র, শিক্ষক স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিদেশী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার জন্যও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা একান্ত দরকার ছিল। সরকারের দমননীতি এবং বহু সংখ্যক ছাত্রকে স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় স্কুল' নামে বিভিন্ন অঞ্চলে

অনেক স্কুল স্থাপিত হইল। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু নামে একজন ছাত্র 'এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি' (anti-Circular Society) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া সরকার কর্তৃক স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি'র কার্য-কলাপও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্রের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ময়মনসিংহের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র

এণ্টি সার্কুলার সোসাইটি; ডন সোসাইটি


সুবোধচন্দ্র মল্লিক


ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এজন্য দান করিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী


তারকনাথ পালিত


সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী

পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর এক বিরাট সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) নামে একটি পরিষদ গঠিত হইল। এই সম্মেলনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, ডাঃ নীলরতন সরকার, আব্দুল রসুল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন

চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঙালী মনীষীর প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, দেশীয় এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও আদর্শ বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শরূপে বর্ণিত হইল। ভারতের জাতীয়তাবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি।

কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া এই কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাই পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। মফস্বল অঞ্চলেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উহার কার্যকলাপ প্রসারিত করিয়াছিল। রংপুর জাতীয় স্কুল ও ঢাকা জাতীয় স্কুল ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর যাবতীয় জাতীয় স্কুল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন

বাংলার বাহিরে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রসার

বাংলার বাহিরেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বেরার, বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯০৬ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শে অন্ধ্র অঞ্চলে অন্ধ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (Andhra National Council of Education) স্থাপিত হইয়াছিল। এলাহাবাদ ও অযোধ্যায় জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় কলিকাতা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে অনুমোদিত স্কুল হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের এক অতি সুন্দর বহিঃপ্রকাশ বলা যাইতে পারে। এইভাবে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মনীষীরা ভারতের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব
(Growth of Militant Nationalism)

ঊনবিংশ শতকের শেষ কয়েক বৎসরে ভারতের জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার যে পরিবর্তন ঘটিয়া এক নূতন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল উহাই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত। এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ (১) ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, (২) ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

এবং (৩) স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ অধীনতা হইতে মুক্তি এই তিনটি মূল আদর্শকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এই নূতন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমে উহা এক সর্ব-ভারতীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তাঁহারা ভারতের তিনটি পৃথক অংশে যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেগুলি ক্রমে একত্র হইয়া এবং বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নূতন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী (Extremists) বা জাতীয়তাবাদী (Nationalists) নামে পরিচিত ছিলেন।

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ও উহার আদি প্রবক্তাগণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায্য বিচারে আস্থাবান ছিল। ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য রাখিয়া আবেদন-নিবেদন নীতির অনুসরণ করাই ছিল কংগ্রেসের পন্থা। প্রতি বৎসর একই ধরনের প্রস্তাব পাশ করিয়া বার বার ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশের কাছে অনুরোধ-উপরোধ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই সমর্থিত নীতি ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব হইতেই এই আবেদন-নিবেদন নীতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের একাংশের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। আবেদন-নিবেদনের বিরোধীরা 'চরমপন্থী' (Extremists) নামে অভিহিত হইলেন আর আবেদন-নিবেদনের সমর্থকগণ পরিচিত হইলেন 'নরমপন্থী' (Moderates) নামে। চরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমদিকে তেমন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন না।

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরোধিতা

চরমপন্থীদের উদ্ভব।

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল। কলিকাতা পৌরসভা এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়াইয়া লর্ড কার্জন আইন প্রবর্তন করিলে সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল তাহাতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে কতক পরিমাণে উগ্র রূপ দান করিল। ইহার পর কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন আন্দোলন শুরু হইল এবং উহা ক্রমে সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল তখন ভারতের জাতীয়তাবাদী স্পষ্টভাবেই সংগ্রামশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নরমপন্থী রহিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী মতবাদের প্রবক্তা। বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে নরমপন্থী

চরমপন্থীর প্রবক্তাগণ: তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল ও লাজপৎ রায়

নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তিনিও চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ভারতের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যেও এই পরিবর্তন শুরু হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল তখন ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে। এই নূতন জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিলে সরকার স্বদেশী আন্দোলন দমনের চেষ্টায় অত্যাচার শুরু করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তখনও ব্রিটিশ সরকারের উপর আস্থা রাখিয়া চলিবার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসী নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াইলেন। কংগ্রেসে নরমপন্থীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তখনও বিদ্যমান।

নরমপন্থীদের ব্রিটিশ সরকারের উপর আস্থা

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। নরমপন্থীরা মনে করিতেন যে, ভারতবাসীর সেই সময়কার পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসনে থাকা অপরিহার্য ছিল। অভিজ্ঞতার দিক দিয়া, শিক্ষার দিক দিয়া পশ্চাৎপদ ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি বিরোধিতা অপেক্ষা সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হইবে। কিন্তু বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সেই সময়ে যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব দান করিবে এই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। এমতাবস্থায় বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বালগঙ্গাধর তিলকের অনুসরণে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন (১৯০৬ খ্রীঃ)। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি চরমপন্থী নেতা শিবাজী উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নরমপন্থী নেতা এই উৎসবে যোগদানে বিরত রহিলেন। নরমপন্থীদের মধ্যে একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত চরমপন্থীদের প্রতি তাঁহার সমর্থন জানাইলেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় চরমপন্থী মতবাদও ক্রমে এক সর্ব-ভারতীয় মতবাদে রূপান্তরিত হইল।

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পার্থক্য রাজনৈতিক আদর্শ এবং সেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার পন্থা কি হইবে এই দুই দিক দিয়াই বিদ্যমান ছিল। নরমপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যেরূপ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ করে ততটুকু অধিকারই চাহিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, চরমপন্থিগণ চাহিয়াছিলেন ব্রিটিশ অধিকারমুক্ত পূর্ণ স্বরাজ। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

দুই দলের রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন রূপ

রাজনৈতিক আদর্শ কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে নরমপন্থিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয়দের শাসনকার্যের ক্ষমতার অভাব এবং ভারতীয়দের মধ্যে একতার অভাব হেতু ভারতের অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকিলেই সম্ভব হইবে। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীর পদক্ষেপে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতি সাধন করিতে। পক্ষান্তরে, চরমপন্থিগণ চাহিয়াছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ আদায় করিতে। এজন্য তাঁহারা সরকারের সবকিছুর সহিত সংস্রব ত্যাগ অর্থাৎ বয়কট করিতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ (Passive Resistance) আন্দোলন করিতে চাহিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অসহযোগ আন্দোলন পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী অস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। চরমপন্থীরা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মপ্রত্যয় এবং নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শিক্ষা ও শক্তি ভারতবাসীকে দিতে চাহিয়াছিলেন তেমনি অসহযোগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।

আদর্শ রূপায়ণে দুই দলের পন্থার বিভিন্নতা

চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে লাগিল। গোখলের ন্যায় নেতার নেতৃত্বও নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ রোধ করিতে পারিল না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছিল। নরমপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় চরমপন্থীদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। চরমপন্থীরা সাময়িকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভে সমর্থ না হইলেও বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং লালা লাজপৎ রায়ের শক্তিশালী নেতৃত্বে চরমপন্থীদের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী প্রভাব ক্রমে সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করিল। 'সন্ধ্যা', 'কেশরী', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে চরমপন্থীরা ভারতের যুবসমাজকে এক নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের ধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। অল্পকাল পরে কংগ্রেসে চরমপন্থীদেরই জয় হইল। কংগ্রেস চিরতরে উহার আবেদন-নিবেদনের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের পথে নামিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে পরিচালিত হইতে থাকে।

সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরম-পন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ

শেষ পর্যন্ত চরম-পন্থীদের জয়

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০). মহারাষ্ট্রের পেশওয়া বংশের সন্তান বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তা-

বাদের জনক। মারাঠা বীর, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনচেতনার মূর্ত প্রতীক শিবাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে দেশপ্রেমের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে* তিনি শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। শিবাজীর জীবনাদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে এই উৎসব ভারতের অপরাপর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব পালিত হয়। ইহার পর প্রতি বৎসর এই উৎসব কলিকাতায় এমনকি বাংলার মফস্বল শহরাদিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' পাঠ করিয়াছিলেন। শিবাজী উৎসব ভিন্ন মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসবকে তিলক এক জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়া উহার মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন।

তিলক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জনক

শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন (১৮৯৫ খ্রীঃ)

গণপতি উৎসব



তিলক (শিবাজী উৎসব)

তিলক ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিলক এজন্য ব্রিটিশ সরকারের অপদার্থতাকেই দায়ী করেন। তাঁহার 'কেশরী' (১৮৮৯ খ্রীঃ) পত্রিকায় তিনি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য চাপ দিতে নির্দেশ দেন। এমনকি, তিনি তাহাদিগকে খরা, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য উৎসাহ দান করেন।

* 15th March 1895: Vide: *British Paramountcy and the Indian Renaissance* Vol. X, Part II, p. 579. 'The Shivaji festival was first held on 15th April 1896': Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 59.

বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, নির্ভীক স্বাধীনতা সৈনিক এবং অনন্যসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা যখন ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভিক্ষা পাত্র লইয়া আবেদন-নিবেদনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে তাঁহার রাজনৈতিক তথা ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। সেইদিন হইতে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল 'স্বরাজ'।

স্বরাজ জন্মগত অধিকার

তিলক তাঁহার সংগ্রামী এবং আপসহীন দেশাত্মবোধের জন্য একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তিলক এক অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় দেশরক্ষার জন্য শিবাজী কর্তৃক বিজাপুরের প্রবীণ সেনাপতি আফজল খাঁর হত্যা অন্যায় ছিল না এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেশরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হত্যার কাজও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক। এই বক্তৃতার দশদিনের মধ্যে পুনার কালেক্টর মিঃ র‍্যাণ্ড্ এবং লেফ্টেনাণ্ট্ আয়ার্স্ট নামে একজন সামরিক কর্মচারীকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় হত্যা করিলে সরকার তিলককে গ্রেপ্তার করেন। পুনায় প্লেগ প্রতিরোধের অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্যরা জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চাপেকার ভ্রাতারা এই হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিলককে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রধান শত্রু মনে করিতেন। সুতরাং এই অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শিবাজী উৎসবে তাঁহার বক্তৃতার জন্যই এই হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে যুক্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার দোষ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাতে তিলকের প্রভাব দমন করা দূরে থাকুক, ভারতবাসীর মনে তিলকের প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার সংগ্রামী মতবাদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকতর হইল। দেশবাসী তাঁহাকে 'লোকমান্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল।

তিলকের মতবাদ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি

তিলকের ১৮ মাস কারাদণ্ড

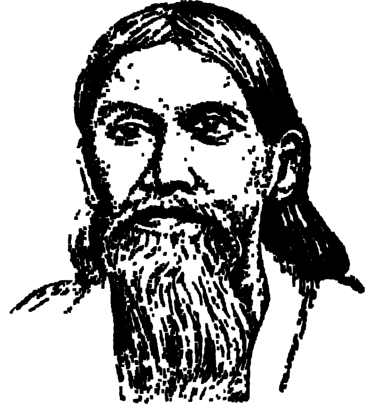
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশরী পত্রিকায় মজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের উল্লেখ করিয়া তিলক লিখিয়াছিলেন যে, যতদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বরাজ না দিবেন ততদিন ভারতবর্ষ হইতে বোমা নিক্ষেপ দূর করা যাইবে না। এজন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে দীর্ঘ ছয় বৎসর মান্দালয়ে কারাবন্ধ করিয়া রাখা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্তির পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিলক এবং চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলে কংগ্রেস চরমপন্থীদের প্রাধান্যাধীন হইয়া পড়ে।

তিলকের ছয় বৎসর দেশ হইতে নির্বাসন ও কারাদণ্ড : কারামুক্তির পর কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ : চরমপন্থীদের প্রাধান্য লাভ

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) : মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যেমন সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন তেমনি বাংলাদেশে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তিলক শিবাজীর দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং স্বাধীন চেতনা দ্বারা যেমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, অরবিন্দও তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দ ঘোষও তিলকের ন্যায় হিন্দু ধর্ম, ভারতের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশী শাসনের অবসান—এই তিনটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার মতবাদ রচনা করিয়াছিলেন। চরমপন্থী মতবাদের এই তিনটিই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অরবিন্দের প্রবন্ধে তাঁহার উপর ফরাসী বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের চরমপন্থী। তাঁহার জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম ভারতের পূর্ণ স্বরাজ ভারতবাসীর বিপ্লবী কর্মপন্থার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাসী ছিল। স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বা ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে তাহা কদাচ সম্ভব নহে। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের তিনি 'অ-জাতীয়তাবাদী' (un-national) বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

ধর্ম, অর্থনীতি ও স্বরাজ—চরমপন্থী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য



ঋষি অরবিন্দ

ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া অরবিন্দ বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষপদে যখন কাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি উদয়পুরের বিপ্লবী ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া অরবিন্দ বাংলাদেশে বিপ্লবী সংস্থা স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়া সত্যেন বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি মেদিনীপুরের যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালকাতা অনুশীলন সমিতি নামক গোপন বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিবার এবং উহার কার্যকলাপ সুসংগঠিত করিবার জন্য বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধ আন্দোলন শুরু হইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া অরবিন্দ যখন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আসিলেন তখন অনুশীলন সমিতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

অরবিন্দের উপর বিপ্লবের প্রভাব

অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ

তিলক মহারাষ্ট্র ও মারাঠা জাতির মধ্যে যেরূপ সংগ্রামী জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন অরবিন্দ সেরূপ করিয়াছিলেন বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে। কিন্তু তিলকের

তুলনায়ও অরবিন্দের ধ্যানধারণা ছিল অধিকতর চরমপন্থী। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার নিকট ধর্মস্বরূপ, এবং দেশমাতৃকা নিজ মাতৃস্বরূপা। কংগ্রেসের ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি ভারতবাসী, বিশেষভাবে বাঙালী জাতির অন্তরে নূতন জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক অরবিন্দ

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কৃত হইলে অরবিন্দ ঘোষকে অপরাপর ৪৭ (৩৬ ?) জন বিপ্লবীর সহিত গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুর বিচারালয়ে অরবিন্দের বিচার চলিল। চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিবার দোষে অরবিন্দকে ব্রিটিশ সরকার শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের (পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বেকসুর খালাস পাইলেন। ইহার পর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধির ফলে তিনি পণ্ডিচেরীতে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন (১৯০৯ খ্রীঃ)।

আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের বিচার, বেকসুর মুক্তি আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২). চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং পূর্ণ স্বরাজ এই তিন বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল একথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নরমপন্থী এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদ ক্রমেই পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তিনি চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁহার জাতীয়তাবোধের মূল আদর্শ হইয়া উঠে ভগবানের মধ্যে মানুষকে দেখা এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখা।*

বিপিনচন্দ্র নরমপন্থী নীতিতে বিশ্বাসী


বিপিনচন্দ্র পাল

* "The ideal is that of humanity in God, of God in humanity." (Uttarpara Library speech of B. C. Pal), vide : Tripathi's *The Extremist Challenge* p. 29.

এইভাবে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রয়োগ ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। তারপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ঐ বৎসর তিনি কংগ্রেসের ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে দান গ্রহণের কঠোর সমালোচনা শুরু করিলেন।

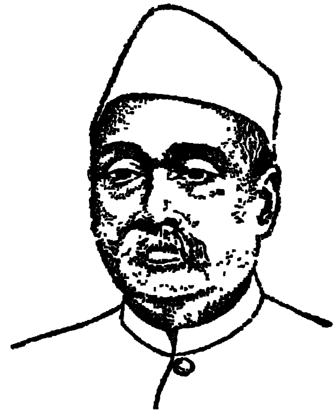
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বিপিনচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার প্রভাব

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনের কালে বিপিনচন্দ্র পালের চরমপন্থী মতবাদ বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা এবং 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁহার ক্ষুরধার রচনা বাংলার তথা ভারতীয় যুবসমাজের মধ্যে একদিকে যেমন স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধের প্রবল বন্যার সৃষ্টি করিল, অপরদিকে তেমনি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার হিসাবে যেমন কাজ করিল তেমনি ব্রিটিশের উপর আঘাত হানিবার অস্ত্ররূপেও শক্তি সঞ্চয় করিল। লর্ড কার্জনের দমন নীতি বিপিনচন্দ্র পালের মোহভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় চরমপন্থীতে রূপান্তরিত করিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বরাজ স্থাপন তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতির সহিত যুগ্মভাবে চরমপন্থী মতবাদে বাঙালী তথা ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

বিপিনচন্দ্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তায় রূপান্তরিত

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের কালে তিনি সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহাতে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, বলা বাহুল্য।

বিপিনচন্দ্রের কারাদণ্ড


লালা লাজপৎ রায়

লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮): সর্বভারতীয় চরমপন্থী নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। ধর্মের দিক দিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত আর্য সমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। গুরুদত্ত, হংসরাজ প্রভৃতি আর্যসমাজীদের প্রভাব তাঁহার উপর গভীরভাবে পতিত হয়। ফলে ভারতের প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে। কংগ্রেসের আদর্শ বা আন্দোলন হইতে প্রথমে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মতে কংগ্রেস জনসাধারণের সহিত সংযোগহীন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংস্থা ছিল। প্রকৃত

প্রথম পর্যায়ে লাজপৎ রায়ের কংগ্রেসের প্রতি উদাসীনতা

জাতীয় আন্দোলনের পদ্ধতি কংগ্রেস অনুসরণ করিত না এজন্য লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সচেতনতার যেমন অভাব, জাতীয় আদর্শের প্রতি আস্থাও তাঁহাদের তেমন নাই। লালা লাজপৎ রায় ছিলেন তিলকের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিক্ষানীতির তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরোধী। দেশের পুনরুজ্জীবন এবং ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বরাজ স্থাপন ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। সেই সময়ে যে নূতন জাতীয়তাবাদী আদর্শ অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়াছিল উহার প্রসারের ব্যাপারে লালা লাজপৎ রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। স্বাধীনতাকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন পৃথিবীর সকল সম্পদ জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তিনি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করিয়া পাঞ্জাবে উহার প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, ভারতবাসীকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইতে হইবে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলে নরমপন্থীদের ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। দেশাত্মবোধ এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগকে লাজপৎ রায় পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। চরমপন্থীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের রোষ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে লাজপৎ রায়কে মান্দালয়ে কিছুকালের জন্য নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ধারা সর্ব-ভারতীয় ধারায় পরিণত করিতে চারিজন নেতার অন্যতম ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। অপর তিনজন ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ও বিপিন পাল।

ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বরাজ লাজপতের জীবনাদর্শ

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব

দেশাত্মবোধ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ লালা লাজপৎ রায়ের নিকট ধর্মে পরিণত

(খ) বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম
(Revolutionary Struggle in Bengal, Maharastra and the Punjab)

বাংলাদেশ : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। ক্রমে উহা সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের একটি ধারা বিপ্লবী সন্ত্রাসের দিকে চলিতে থাকে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশানের (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) কয়েকজন ছাত্র প্রমথনাথ মিত্রকে সভাপতি করিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। উহার নাম তাঁহারা দেন অনুশীলন সমিতি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ,

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা (১৯০২ খ্রীঃ)

বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ এবং ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁহাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রথম প্রবক্তা অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠের আদর্শে বিপ্লবী সঙ্ঘ স্থাপনের কল্পনা করিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি বরোদা হইতে কলিকাতা আসিয়া মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু ও অপরাপর কয়েকজনকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। ফরাসী বিপ্লব ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের দৃষ্টান্ত অরবিন্দকে বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বরোদায় ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক বিপ্লববাদীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজে বোম্বাইয়ের বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা হইতে কলিকাতা বিপ্লবী সংগঠনের কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অরবিন্দ-ই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম দিয়া বরোদার সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সামরিক শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহাকে অরবিন্দ কলিকাতা পাঠান। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী সংগঠনের কাজে তেমন সাফল্যলাভে সমর্থ না হওয়ায় নিজ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উপর অরবিন্দ সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।



প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০)

অরবিন্দ ঘোষ ও বাংলার বিপ্লবী সংগঠন

অনুশীলন সমিতি উহার সদস্য যুবকদের মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত লাঠিখেলা, ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যায়াম প্রভৃতির অনুশীলন চলিলেও গোপনে এই সমিতি বিপ্লবী সন্ত্রাসে উহার সদস্য যুবকদের শিখাইয়া তুলিবার চেষ্টা চালাইতেছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংগঠনী ক্ষমতার ফলে একদল নির্ভীক, দেশাত্মবোধসম্পন্ন যুবক অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। শুধু তাহাই নহে, ইঁহাদের মধ্য হইতে অনেককে বাংলাদেশের বাহিরে, এমনকি মাদ্রাজে পর্যন্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি পাঠাইয়াছিলেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক বিপ্লবী সংগঠনের কাজ

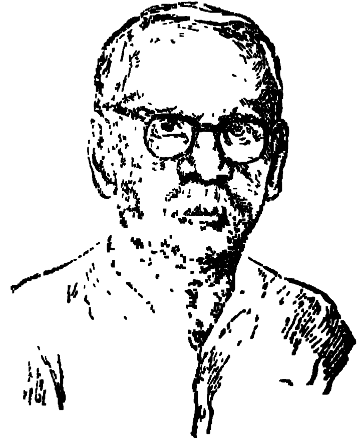
প্রথমে এই বিপ্লবী সংগঠনের মুখপাত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসেই অনুশীলন সমিতির কর্মকেন্দ্র ছিল। কিন্তু পুলিশের নজর এড়াইবার জন্য মাণিকতলা মুরারি-

পুকুরের এক বাগানবাড়ীতে অনুশীলন সমিতির আখড়া বা কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হয়। এই বাগানবাড়ীতে বোমা প্রস্তুতের কাজ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষার কাজ গোপনে চলিতে থাকে। এদিকে অরবিন্দও নিষ্ক্রিয় রহিলেন না। বিপ্লবী প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভবানী মন্দির' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিপ্লবী ধারণার প্রভাব

মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ী বিপ্লবী প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র



সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮)



বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯)

পরিলক্ষিত হয়।* ঐ বৎসরই বাংলাদেশে লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। ইহা ভিন্ন তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতার চেষ্টায় ভারতের জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হইয়া উঠিলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের কাজ আরও বিস্তার লাভ করিল।

সন্ত্রাসবাদী প্রস্তুতি

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকিলে ব্রিটিশ সরকার উহা দমন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। যুবসমাজ, বিশেষভাবে ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হইল। সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান করা, পিকেটিং করা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার ত্রুটি করিলেন না। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু বাংলার যুবসমাজ তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের ন্যায়ই অপমানজনক ও মর্মান্তিক বলিয়া উহার প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় সরকারী দমনমূলক অত্যাচার তাহাদিগকে মরিয়া করিয়া তুলিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হইলে বাংলার গণ্যমান্য নেতা মাত্রেই উহাতে যোগদানের

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আন্দোলন দমনের জন্য অত্যাচার শুরু

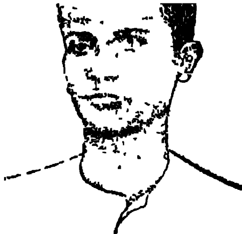
* Vide Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 65.

জন্য গেলে তাহাদিগকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করিল। এদিকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারীদের বিচারের নামে অবিচার এবং সংবাদপত্রগুলির উপর জুলুম করিতে লাগিলেন। বিচারকের আসনে বসিয়া তিনি প্রশাসকের ন্যায় আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবসমাজ স্বভাবতই তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। তাঁহার আদালতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিবার অপরাধে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক কিশোর সুশীলকে কিংসফোর্ড পনর ঘা বেত মারিবার আদেশ দিলেন। এই ঘটনার পর বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজের ধৈর্য আর বাঁধ মানিল না। কিংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্যায়, অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা

ইতিমধ্যে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া ৭৫০ টাকা মাসিক বেতনের পরিবর্তে মাত্র ৭৫ টাকা মাসিক বেতন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে তাঁহার যোগাযোগ স্বভাবতই স্থাপিত হইল। মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী সমিতির সহিত বাংলার বিপ্লবীদের অনেকেই সংযুক্ত ছিলেন।

অনুশীলন সমিতির সহিত অরবিন্দ এবং বাংলার বিপ্লবী যুবকদের সংযোগ


সুশীল সেন (?—১৯১৫)


পুলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯)

রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), সত্যেন বসু প্রভৃতি সকলেই ছিলেন এই সমিতির বিপ্লবী কর্মী। ঢাকা ও মেদিনীপুরে এই বিপ্লবী সমিতি অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির শাখা খোলা হইয়াছিল। ঢাকা শাখার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ।

প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম: কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অত্যাচারের অবসান ঘটান চাই—এই প্রতিজ্ঞা বাংলার বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এই খবর পাইতে বিলম্ব হইল না। কিংসফোর্ডকে বিপ্লবীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার তাঁহাকে মজফ্ফরপুরে বদলি করিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা সেখানেও তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রফুল্ল চাকি এবং মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকে বোমা ও পিস্তল দিয়া

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য মজফ্ফরপুরে পাঠান হইল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া ভুলক্রমে ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা যে গাড়ীতে যাইতেছিলেন উহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই মারা



ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮

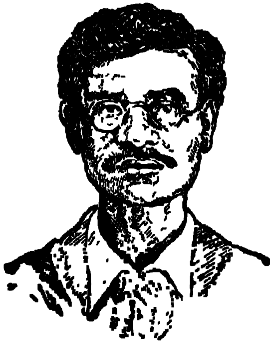


প্রফুল্ল চাকি (১৮৮৮-১৯০৮)

গেলেন। মোকামা স্টেশনে পুলিশ প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে তিনি নিজ রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসী হইল। উনিশ বৎসরের যুবক ক্ষুদিরামের নির্ভীকতা এবং বিচারকালে তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। ক্ষুদিরাম বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার চিরআসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ক্ষুদিরামের ফাঁসী (১৯০৮ খ্রীঃ)

ক্ষুদিবাম যেদিন ধরা পড়িলেন তাহার পরদিন প্রাতে বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় পুলিশ হানা দিয়া অরবিন্দ-সহ মোট ৪৭ (৩৬ ?) জনকে গ্রেপ্তার করে (মে,



কানাই দত্ত (১৮৮৭-১৯০৮)



অবিনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬১

১৯০৮ খ্রীঃ)। বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই কোন তথ্য ফাঁস করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নরেন গোঁসাই বিপ্লবী রীতি ও প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া রাজসাক্ষী হইলেন এবং যাবতীয় গোপন

তথ্য বলিয়া দিতে রাজী হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসইকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এজন্য তাঁহারা জেলের বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিচারে কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসি হইল। দেশমাতার সেবায় বিশ্বাসঘাতকের স্থান নাই একথা সত্যেন ও কানাই জীবন দিয়া প্রমাণ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় বিচারে অরবিন্দ খালাস পাইলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। এই মকদ্দমা আলিপুর বোমার মামলা নামে পরিচিত।

আলিপুর বোমার মামলা

আলিপুর বোমার মামলার সময় হইতে বাংলার বিপ্লবিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ফলে বাংলার বিভিন্নাংশে বহু গোপন বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠিল। এগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি-ই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বিচ্ছিন্ন হইলেও এই সকল গোপন বিপ্লবী সমিতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। সরকারী অত্যাচার বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করিলেও তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিল না। বিপ্লবী আন্দোলন বাংলার বাহিরে যুক্ত-প্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র এবং ভারতের অপরাপর বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমনকি, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনলাল ধিংড়া নামে জনৈক ভারতবাসী লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান অফিসের একজন পদস্থ অফিসার কার্জন-উইলিকে (Curzon-Wyllie) গুলি করিয়া হত্যা করেন। কারণ ইনি ভারতে থাকাকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত যুবকদের কয়েকজনকে ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ইংলণ্ডস্থ জনসাধারণের মধ্যেও ভীতির সঞ্চার হইল।

বিপ্লবিগণ বিচ্ছিন্ন কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত নহে



মদনলাল ধিংড়া

ব্রিটিশ সরকার দমননীতির কঠোরতা ক্রমেই বাড়াইয়া চলিলেন। সভাসমিতি, সংবাদপত্র, সবকিছুই দমনমূলক আইনের কবলে পড়িল। কলিকাতাস্থ অনুশীলন সমিতিকে নিষিদ্ধ করা হইল (অক্টোবর, ১৯০৯ খ্রীঃ)। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা ও কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য হইলেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে বিহার ও উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের মধ্যে রহিল না। আসামও স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইল। ইতিপূর্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোর্লি-মিণ্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ান হইল। প্রাদেশিক আইনসভায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্য

বঙ্গভঙ্গ বাতিল (১৯১১)

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মোর্লি-মিণ্টো সংস্কার

বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদিগকে বাজেট বা অপরাপর প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্ক, নূতন কোন প্রস্তাব উত্থাপন, এবং এই সকল ব্যাপারে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল। ছোটলাট (Lieutenant Governor) শাসিত প্রদেশগুলিতে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে (Executive Council) ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি সর্বপ্রথম এই সংস্কার আইনে স্বীকৃত হইল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হইল না। সংস্কার দাবি সেজন্য অব্যাহত রহিল।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অরবিন্দের বাংলাদেশ পরিত্যাগে এবং বহুসংখ্যক বিপ্লবীর দ্বীপান্তরেও থামিল না। রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রভৃতি বিপ্লবী তরুণদের নেতৃত্বে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি গোপনে চলিতে লাগিল। রাসবিহারী বসু তাঁহার কর্মকেন্দ্র



রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫)



নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৫৪)

বাংলার বাহিরে বিস্তার করিলেন। '১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় ও গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬) আগ্রা হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লীতে কার্যভার গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলে প্রকাশ্য দিবালোকে রাসবিহারী বসু তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। হার্ডিঞ্জ আহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী ভারতীয় একজন মারা গেলেন। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইল না। তিনি পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের লইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেখানে তাঁহারই অনুচরদের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহার দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়িলে রাসবিহারী ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে জাপানে চলিয়া যান (১৯১৫ খ্রীঃ)। বিদেশী সাহায্য লইয়া দেশ উদ্ধারের চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।)

রাসবিহারী বসু

বাঙালী বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, নির্ভীক নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় এই বিপ্লবী অধিনায়ক গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান। ইহার পর তিনি সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী দলের সহিত সংযুক্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙালী বিপ্লবিগণ জার্মানির ন্যাশন্যাল পার্টির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সেই দেশ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আনাইবার ব্যবস্থা করিলে দুইটি জাহাজভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ভারতের দিকে রওয়ানা হইল। একটি বাংলাদেশের সুন্দরবনের রাইমঙ্গল নামক স্থানে অপরটি উড়িষ্যায় পৌঁছিবার কথা ছিল। একটি তৃতীয় জাহাজও হাতিয়াতে আসিবার কথা ছিল। বালেশ্বর রেল-লাইন দখল করিয়া ইংরেজদের সংযোগপথ রোধ করাই ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনা। বাঘা যতীন তাঁহার সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষ পাল, নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হইলেন। যতীন ঘোষাল ও হরিকুমার চক্রবর্তী



বাঘা যতীন (১৮৭০-১৯১৫



চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী



হরিকুমার চক্রবর্তী (১৮৮২-১৯৬৩)

সুন্দরবন অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বিদেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাঘা যতীনের নির্দেশে ফাদার মার্টিন ছদ্ম নামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রওয়ানা হইলেন বাটাভিয়ার দিকে। ব্রিটিশ সরকার গোপনে এই জাহাজগুলির সংবাদ পাওয়ায় সেগুলি আর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিল না। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্ট বাঘা যতীনকে ধরিবার উদ্দেশ্যে এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লইয়া বালেশ্বর পৌঁছিলেন। পুলিশের নজর যখন এড়ান সম্ভব হইল না তখন বাঘা যতীন ও তাঁহার দল বুড়ীবালাম নদীর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া পুলিশের সহিত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ শুরু হইল। চিত্তপ্রিয় গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু যতীনকে প্রাণে বাঁচান গেল না। ব্রিটিশের শাস্তি তিনি এড়াইয়া গেলেন। জ্যোতিষকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হইল।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

এইসব কারণে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিদেশী সাহায্য সংগ্রহের জন্য মালয়, জাপান, কোরিয়া, চীন, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এম. এন. রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়), হরি সিং প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি অবশ্য আজীবন বিপ্লবী চিন্তা লইয়াই চলিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়)

বাঘা যতীন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই সত্য কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবের মূল গভীরে চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলেও বিপ্লবের অনুশীলন গোপনে চলিতে লাগিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ

মহারাষ্ট্র : বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রেই জন্ম লইয়াছিল। শিবাজীর জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ ভারতের অপরাপর অংশের তুলনায় অল্পকাল পূর্বে ব্রিটিশের নিকট স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। মারাঠা জাতির মধ্যে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্পৃহা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কিছু নাই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসাধারণের চরম দুরবস্থায়ও ব্রিটিশ সরকার উদাসীন রহিলেন। বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কে নামক একজন সাধারণ ব্যক্তির অন্তরে একথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই দুর্ভিক্ষের জন্য বিদেশী শাসনই দায়ী। ফাদ্‌কে সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে একদল সাধারণ লোককে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিখাইয়া তুলিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিলেন। এই বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করিয়া বিত্তশালীদের নিকট হইতে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাদ্‌কে তাঁহার অনুচরদের লইয়া ধামারি গ্রাম আক্রমণ করিয়া উহা লুঠ করিলেন এবং পুলিশের সহিত এক খণ্ডযুদ্ধ করিলেন। পুলিশ ফাদ্‌কের গ্রেপ্তারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইল না। ইহার পর আরও কয়েকটি ডাকাতি তিনি করিলেন এবং সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগৃহীত অর্থ তাঁহার অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন আত্মসাৎ করিলে ফাদ্‌কে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। অল্পকাল পর তিনি রোহিলা সর্দার ইস্‌মাইল খানের সাহায্যে পাঁচশত রোহিলা এবং অপরাপর ব্যক্তির সাহায্যে আরও চারিশত অনুচর

মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা-স্পৃহার গভীরতা

১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় দারুণ দুর্ভিক্ষ


বাসুদেব ফাদ্‌কে

বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কের ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনা

রাজনৈতিক ডাকাতি

সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু মেজর দানিয়েল এবং নিজামের পুলিশ কমিশনার মাহমুদ সাহেব গোপনে এই পরিকল্পনার সংবাদ পাইয়া ফাদ্‌কেকে বহু চেষ্টার পর গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে তাঁহার নির্বাসন দণ্ড হইল (১৮৮২)। এডেনে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার কালে স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ প্রায় ত্যাগ করিলে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে (১৮৮৩) প্রাণ হারাইলেন।

ফাদ্‌কের গ্রেপ্তার, নির্বাসন (১৮৮২)
ফাদ্‌কের মৃত্যু (১৮৮৩)

দেশপ্রেমের ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন ফাদ্‌কেই প্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন মহারাষ্ট্রে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহারই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং দামোদর চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা পুনার কালেক্টর মিঃ র‍্যাণ্ড্ এবং লেফ্‌টেনাণ্ট্ আয়াস্ট নামে জনৈক সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। পুনায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে প্লেগ প্রতিরোধের নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচার, স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভৃতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবের দশ দিনের মধ্যেই এই দুই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাকে এজন্য দায়ী করিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হইয়াছিল (১৮৯৭)।

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ফাদ্‌কের দৃষ্টান্তে প্রভাবিত
দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী হত্যা
চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি, তিলকের কারাদণ্ড

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে চালিত করিয়াছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তাঁহার গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসব ধর্ম ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তে জনসাধারণকে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিলকের কেশরী পত্রিকার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব

বালকৃষ্ণ চাপেকার ও দামোদর চাপেকার দুই ভাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে (১৮৯৭) তাঁহাদেরই তৃতীয় ভ্রাতা বাসুদেব চাপেকার ও তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দ্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে (Dravid Brothers) হত্যা করিলেন। কারণ এই দুই ইংরেজ ভ্রাতার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইয়াছিল। এজন্য ব্রিটিশ সরকার দ্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বাসুদেব ও তাঁহার বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

বাসুদেব চাপেকার: দ্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক রাজপুত অভিজাত ব্যক্তি সমগ্র পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠনের কাজ করিতেছিলেন। তিনি এজন্য বোম্বাইয়ে একটি পরিষদ এবং বহু মারাঠা গণ্যমান্য রাজনীতিককে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর-

ঠাকুরসাহেব: বোম্বাই গোপন সমিতি

সাহেব বোম্বাইয়ের বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন। ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসিয়া অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজে কর্মরত অবস্থায় এই বোম্বাই সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন। এই গোপন সমিতি মহারাষ্ট্র এবং মারাঠা জাতির মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিল। ঠাকুরসাহেব সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে কতক পরিমাণে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বোম্বাই গোপন সমিতি বা ঠাকুরসাহেবের কার্যকলাপের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অরবিন্দের উপর ঠাকুরসাহেবের প্রভাব

কিন্তু মহারাষ্ট্র ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র। চাপেকার ভ্রাতাদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে বাল্যকালেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। চাপেকার ভ্রাতাদের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাভারকর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিকে মিত্র মেলা নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। চারি বৎসর পর (১৯০৪) পুনরায় 'মিত্র মেলা' সংগঠিত হয় এবং উহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'অভিনব ভারত' রাখা হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিনব ভারত ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের জনক ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' নামক সমিতির আদর্শে গঠিত ছিল। বোম্বাই, নাসিক ও পুনার বিদ্যালয় মাত্রেই অভিনব ভারতের গোপন শাখা খোলা হইয়াছিল। এই সকল গোপন সমিতি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগী হইল। সাভারকরের 'তলোয়ার' পত্রিকা ছিল বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার এক অতি শক্তিশালী মুখপত্র।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর. 'মিত্র মেলা' —'অভিনব ভারত'

অভিনব ভারতের আদর্শ ব্রিটিশ বিতাড়ন



ম্যাৎসিনি

পাঞ্জাব: পাঞ্জাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর শাহরাণপুর জেলার দামোলা নদীর তীরে কয়েকজন যুবক দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন। প্রবাসী বাঙালী পরিবারের যুবক জে এম. চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।* বলা বাহুল্য, শাহরাণপুরের গুপ্ত সমিতির কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ ভারতের অপরাপর অঞ্চলে স্থাপিত বিপ্লবী সমিতিগুলি হইতে ভিন্ন ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ

শাহরাণপুরে গুপ্ত সমিতি স্থাপন (১৯০৪ খ্রীঃ)

* Vide *History of Freedom Movement*, Vol. II p. 304 ff. R. C. Majumdar

শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বদেশের মুক্তিসাধন ছিল এই গুপ্ত সমিতির মূল আদর্শ। কিছুকাল পর এই সমিতির কর্মকেন্দ্র শাহরাণপুর হইতে রুরকিতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নূতন আরও বহু সদস্য এই সমিতিতে যোগদান করেন। রুরকি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা এই সমিতির কর্মসূচীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। হরদয়াল সিং, অজিত সিং ও সুফি অম্বাপ্রসাদ নামে তিনজন নির্ভীক কর্মী এই বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিলে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রুরকিতে গুপ্ত সমিতি স্থানান্তরিত

সেই সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইয়াছে। এই আন্দোলন সারা ভারতের ন্যায় পাঞ্জাবেও দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা প্রবাসী বাঙালী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের সহিত গোপনে যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। হরদয়াল সিংয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের এক প্রবল আকাংক্ষা বিস্তারলাভ করে এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

হরদয়াল সিং, অজিত সিং, অম্বাপ্রসাদ — বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ

পাঞ্জাবের স্বনামধন্য নেতা লালা লাজপৎ রায় বিপ্লবী সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলকের ন্যায়ই তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। বিপ্লবীরা গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ চালাইতে লাগিলেন, আর অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ সাধারণের মধ্যে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

লালা লাজপৎ রায়ের সমর্থন

পাঞ্জাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসের জন্য আর্য সমাজের অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য আর্য সমাজই প্রধানত দায়ী মনে করিতেন। বস্তুত, ১৯০৭ হইতে শুরু করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আর্য সমাজের সদস্যগণের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।

আর্য সমাজ ও বিপ্লবী কার্যকলাপ

যাহা হউক, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অপরাধে লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংকে দেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ছয় মাস পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসেন। পরবর্তী কিছুকাল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ থাকে। কিন্তু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হয়। অজিত সিং ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী প্রচারপত্র পাঞ্জাবের সর্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা শুরু হইলে তিনি পারস্যে পলাইয়া যান। ভাই পরমানন্দ ধরা পড়িলেন, তাঁহার নিকট হইতে বোমা প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে একখানা পুস্তক পাওয়া যায়। কলিকাতার বিপ্লবিগণও এই পুস্তক ব্যবহার করিতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন

১৯০৭-০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ স্তিমিত

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি

হরদয়াল সিং। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে হরদয়াল ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব পড়িল তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য জে. এম. চট্টোপাধ্যায় ও দীননাথের উপর। দিল্লীর আমীরচাঁদও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। জে. এম. চট্টোপাধ্যায়ও কিছুকালের মধ্যে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহার পূর্বে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নেতা রাসবিহারী বসুর সহিত দীননাথের পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু সেই সময়ে দেরাদুনে কর্মরত ছিলেন: তাঁহার চেষ্টায় বিপ্লবী কার্যকলাপ, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ ছিল রাসবিহারী বসুর পরবর্তী পদক্ষেপ। দেরাদুন হইতে এই ঘটনার পর পলাইয়া গিয়া রাসবিহারী পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করিলেন। তিনি বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলেন।


আমীরচাঁদ

রাসবিহারী বসু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তুরস্ক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যোগদান করিলে পাঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই ব্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। মৌলবী ওবেদুল্লার নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এদিকে পাঞ্জাব হইতে যে-সকল লোক আমেরিকায় অর্থ উপায়ের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচার ও অপমানজনক ব্যবহার তাঁহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে বিদেশীদের নিকট মর্যাদালাভ সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া আমেরিকার প্রবাসী পাঞ্জাবীরা গদর পার্টি (Ghadar Party) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সংবাদ তাঁহাদের নিকট পোঁছিলে তাহাদের অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য তাঁহারা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সেই সুযোগে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহারা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য সচেষ্ট হন। কানাডা, ম্যানিলা, হংকং এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশদের উৎখাত করা। গদর পার্টির কর্মসূচী এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা পাঞ্জাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সেনাবাহিনীর

আমেরিকার গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা

পাঞ্জাবে গদর পার্টির কর্মসূচী

মধ্যেও বিপ্লব ছড়াইয়া দিবার চেষ্টারও কোন ত্রুটি বিপ্লবীরা করেন নাই। রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। এইভাবে যখন পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে সেই সময়ে লাহোরের বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হয়। এই মামলার শুনানীর কালে বিপ্লবীরা কিভাবে সেনাবাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, কি কি পরিকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশ পায়। তাহা হইতে পাঞ্জাবে এক ব্যাপক বিপ্লবের যে প্রস্তুতি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

এদিকে রাসবিহারী বসু সমগ্র উত্তর-ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাইয়া যাইতেছিলেন। গদর পার্টি (গদর অর্থ হইল বিদ্রোহ) প্রেরিত বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে লাহোর, আম্বলা, মীরাট, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানের সামরিক শিবিরের মধ্যেও গোপনে বিপ্লবের প্রভাব ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলিতেছিল। স্থির হইল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র উত্তর-ভারতে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হইবে। ইহাতে ভারতীয় সৈনিকদের অনেকে যোগদান করিবে। সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বন্দীদের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা হস্তগত করা হইবে। কিন্তু বিপ্লবীদের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবের পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবিগণ ধরা পড়েন। রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করা অবশ্য সম্ভব হয় নাই। তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ধৃত বিপ্লবিগণ শাস্তিভোগ করেন।

রাসবিহারী বসু কর্তৃক বিপ্লবের প্রস্তুতি পরিকল্পনা ফাঁস

এইভাবে বাংলা মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিলে বিপ্লবী কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া পড়ে। অবশ্য গোপনে বিপ্লবীদের প্রস্তুতি তখনও চলিতে থাকে।

বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের অবসান

পঞ্চম অধ্যায়

নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(New Leader : M. K. Gandhi)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিত্র হিসাবে যুদ্ধে জড়াইলেন। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় অর্থ যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। ভারতীয়দের বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগদান করান হইল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের বাহিরে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে মিত্রপক্ষে যোগদানে বাধ্যকরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয় : হোমরুল লীগ

ছয় বৎসর ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে কারাবাসের পর বালগঙ্গাধর তিলক ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগ নামে একটি স্বায়ত্তশাসন সংঘ স্থাপন করিলেন। অ্যানি বেসান্তও একটি পৃথক হোমরুল লীগ স্থাপন করিলেন। এই দুইটি সংঘেরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বায়ত্তশাসন আদায় করিবার জন্য আন্দোলন করা।

চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ

এদিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে নরমপন্থী (Moderates) ও চরমপন্থীদের (Extremists) মধ্যে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থীদের স্থলে চরমপন্থীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরই (১৯১৬) কংগ্রেস ও মুসলিম

লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুগ্ম দাবি

লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে এই দুই রাজনৈতিক সংস্থা যুগ্মভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট (১) আইনসভার অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে, (২) আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে, এবং (৩) গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক সভার (Executive Committee) অন্তত অর্ধেক সদস্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে গ্রহণ করিবার দাবি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল আন্দোলনেরও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতা এই আন্দোলনের সমর্থন করেন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে স্বভাবতই ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে এবং সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন।

কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ঐক্যে ব্রিটিশ সরকার ভীত

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোর্ল-মিণ্টো সংস্কারে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'অল্-হিলাল' নামক দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ প্রস্তুতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ চুক্তি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইলে এবং তিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সমর্থনে দাঁড়াইলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন, ফলে

দমনমূলক অত্যাচার

সরকার দমনমূলক অত্যাচার শুরু করিলেন। সংবাদপত্রে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হইলে সরকার 'অল্-হিলাল', 'কমরেড্', 'হামদদ'



মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রভৃতি পত্রিকা নিষিদ্ধ করিলেন। মাদ্রাজে হোমরুল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিলে অ্যানি বেসান্তকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার পত্রিকা 'নিউ ইণ্ডিয়া' বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহাতে দেশের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার উচ্চারিত হইল। হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম নেতা বালগঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার এবং বিচারের প্রহসনের পর বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তিলককে ব্রিটিশ সরকার এক অনমনীয় শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর দমনমূলক অত্যাচার-অবিচার ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা যেমন বৃদ্ধি করিল তেমনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা শতগুণে বাড়াইয়া দিল। তাঁহার হোমরুল আন্দোলনও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। পরিস্থিতি ক্রমেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মণ্টাগু ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের আদর্শ হইল ক্রমপর্যায়ে ভারতবাসীকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থান দিয়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করা।

ভারত-সচিব মণ্টাগুর ঘোষণা (১৯১৭)

মণ্টাগুর ঘোষণার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীকে রাজনৈতিক দিক দিয়া ব্রিটিশদের সমপর্যায়ে স্থাপন করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে পর ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মণ্টাগু এবং তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-২১) ভারতের শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলেন। তাঁহাদের তদন্ত রিপোর্ট মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (Montague-Chelmsford Report) নামে খ্যাত। উহার ভিত্তিতে মণ্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯) অনুসারে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এই সংস্কার আইনে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশরক্ষা, রেলপথ, বৈদেশিক সম্পর্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, মুদ্রাব্যবস্থা, শুল্ক, সরকারী ঋণ প্রভৃতি সর্ব-ভারতীয় বিষয়গুলির দায়িত্ব দেওয়া হইল। আর প্রাদেশিক সরকারের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, রাজস্ব, শ্রমিক, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, কৃষি, হাসপাতাল প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব রহিল। প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বকে আবার হস্তান্তরিত (Transferred) এবং সংরক্ষিত (Reserved)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হইল। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি—যথা, বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ের ভার ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপরাপর যাবতীয় বিষয়—যথা, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, রাজস্ব প্রভৃতি গভর্ণর ও তাঁহার কার্যনির্বাহক পরিষদের (Executive Council) উপর ন্যস্ত করা হইল। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের কার্যনির্বাহক পরিষদে কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দুই কক্ষযুক্ত

মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট

মণ্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯ খ্রীঃ)

এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে এককক্ষযুক্ত আইনসভায় পরিণত করা হয়। এই সংস্কার আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের শাসনকার্যাদিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া এই সংস্কার আইন দ্বারা প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা 'দ্বৈতশাসন' (Diarchy) নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, বলা চলে না। কারণ, কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গভর্ণর বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। এই দ্বৈত শাসনের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, প্রকৃত শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে রহিয়া গিয়াছিল আর যে-সকল বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম ছিল সেগুলি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিকতার দিক দিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মণ্টাগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার কতক উন্নতিবিধান করিলেও ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের আশা ছিল যুদ্ধাবসানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা দিলে ভারতবাসীর দুর্দশা বৃদ্ধি পাইল অপর দিকে তেমন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের অনুদারতায় তাহাদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিল। ভারতবাসীদের মধ্যে সংস্কার দাবি আরও জোরাল হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে পরিস্থিতি যখন জটিল হইয়া উঠিয়াছে তখন ব্রিটিশ সরকার কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা দূরের কথা, কঠোর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করিয়া বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সরকার যে বিশেষ ক্ষমতাবলে যে-কোন ব্যক্তিকে দমনমূলক শাস্তি দিতে পারিতেন সেই ক্ষমতা বজায় রাখিতে চাহিলেন। বিনাবিচারে যে-কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা, যথেচ্ছভাবে দণ্ডদান করা বা ভারতীয়দিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা প্রভৃতি ক্ষমতা সরকার আইনত গ্রহণ করিলেন। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হইল।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত

সংস্কার দাবির অধিকতর শক্তি সঞ্চয়

ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি . রাওল্যাট এ্যাক্ট

মহাত্মা গান্ধী গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে রাওল্যাট আইনে সম্মতি না দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চেমস্‌ফোর্ড এই আইনে নিজ স্বাক্ষর দিয়া উহা বলবৎ করিলেন। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী মর্মাহত হইলেন এবং এই আইন অমান্য করিবার জন্য দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করিতে আহ্বান জানাইলেন। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রতিরোধকে মহাত্মা গান্ধী নাম দিলেন 'সত্যাগ্রহ'। শক্তিশালী, অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের সহিত যুঝিবার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসীকে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন পথ

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ

সত্যাগ্রহের আহ্বান

এবং নূতন শক্তির সন্ধান দিলেন। তাঁহার আহ্বানে অগণিত ভারতবাসী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিল। দেশের নানা স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করিতে বলপ্রয়োগ করিলে বহুলোক হতাহত হইল। অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগের চারিদিক ঘেরা উদ্যানে এক প্রতিবাদ সভায় জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে দশ মিনিট ধরিয়া ১,৬০০ গুলিবর্ষণ করা হইলে প্রায় এক হাজার (সরকারী হিসাবে ৩৭৯) নিরস্ত্র নরনারী প্রাণ হারাইলেন, আহত হইলেন অসংখ্য জন।

জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

ব্রিটিশ দমননীতি বর্বরতার নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিল। ব্রিটিশ সরকার জেনারেল ডায়ারের এই বর্বরতা শুধু সমর্থনই করিলেন না, তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিলেন। জালিনওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং প্রতিশোধের মনোভাব জাগ্রত হইল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্বরতার প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' (Knight) অর্থাৎ 'স্যার' (Sir) উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল।



জেনারেল ডায়ার

মহাত্মা গান্ধী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে এক নূতন পথে চালিত হইল। এই সময় হইতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বাবধি ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁহার নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীতে পরিণত

তাঁহার যোগীসুলভ জীবনযাত্রা, আপামর জনসাধারণের প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহাকে এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারতবাসীর নিকট তিনি 'মহাত্মা গান্ধী' নামে পরিচিত হন।

ইংলণ্ড হইতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করিবার পর গান্ধীজী ভারতে আসিয়া আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু পর বৎসরই (১৮৯২) দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ের জন্য চলিয়া যান। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুসংখ্যক ভারতীয় বসবাস করিত। তাহাদের অনেকের বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক ব্যবহার মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার জীবনাদর্শ ও কর্মসূচী নূতনভাবে গঠন করিতে বাধ্য করে।

আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সত্যাগ্রহ

ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য তাঁহার মানবতাবোধকে আহত করে। তিনি নিজেও শ্বেতাঙ্গদের

হস্তে একাধিকবার নির্যাতন ভোগ করেন। এই কৃত্রিম পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণকায়দের পশুর স্তরে রাখিয়া তাহাদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন মহাত্মা গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিতে বাধ্য করে। তিনি সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ হিংসার আশ্রয় না লইয়া বিরোধী পক্ষের সহিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নূতন ধরনের আন্দোলন সর্বত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ত ও পীড়িতের সেবার কাজও চালাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার-বিরোধী আন্দোলন তাঁহাকে ভারতীয়দের অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান করে।



মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(১৮৬৯-১৯৪৮)

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক কৃষক-শ্রমিক সকলকে জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রস্তুত

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু সেই সময়েও তিনি ব্রিটিশদের অন্যায়-অবিচার বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে নীলচাষ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিহারের কোন কোন অঞ্চলে তখনও নীলচাষ অল্প-বিস্তর চলিতেছিল। নীলচাষের আনুষঙ্গিক নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও তেমনি চালু ছিল। চম্পারণ নামক স্থানে নীল কর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল (১৯১৭-১৮)। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে চম্পারণ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিলে তিনি এই আদেশ অমান্য করিলেন। এজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আদালতে হাজির করিবার পর তাঁহাকে কোনপ্রকার শাস্তি না দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়া তোলে। আমেদাবাদে বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকগণ তাহাদের বেতন বৃদ্ধি দাবি করিয়া মালিকদের নিকট হইতে কোনপ্রকার সহানুভূতি

না পাইলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাহারা ধর্মঘট শুরু করে। তাহাতেও কোন কাজ না হইলে মহাত্মা গান্ধী নিজে শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষকদের উপর জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গান্ধীজী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন। এইভাবে মহাত্মা গান্ধী শ্রমিক, কৃষক সকলের জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রস্তুত করেন।

জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড মহাত্মা গান্ধী ঘোষিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শক্তি আরও বাড়াইয়া দিল। দেশের সর্বত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি ব্রিটেন ও উহার মিত্রদেশগুলির ব্যবহার পৃথিবীর মুসলমান মাত্রেরই বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভার্সাই চুক্তির ফলে ইস্‌লাম ধর্মের অধিকর্তা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশসরকারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত।* ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের সামিল করিবার ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে যুক্ত করিতে চাহিলেন। সি. বিজয় রাঘবাচারিয়ার সভাপতিত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (Non-violent Non-co-operation Movement) নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করিল এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত এই

খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ খ্রীঃ)


সি. বিজয় রাঘবাচারিয়া

* **খিলাফৎ আন্দোলন** : তুরস্কের সুলতানকে মুসলমানগণ তাহাদের খলিফা বা ধর্মের প্রধান এবং হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী বলিয়া মানিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতীয় মুসলমানগণ তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীন মুসলমানগণের পক্ষে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। একদিকে তাহাদের ধর্মের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি আনুগত্য অপরদিকে ব্রিটিশ-প্রজা হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে মিত্রশক্তিবর্গ, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি যে-সকল দেশ তুরস্ক-জার্মানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তুরস্কের সাম্রাজ্য হইতে এশিয়া মাইনর, থ্রেস প্রভৃতি অঞ্চল যেগুলি তুর্কীজাতি-অধ্যুষিত সেইগুলি বিচ্ছিন্ন করিবে না। এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, আর যাহাই হউক ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের স্বাধীনতা বা সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুন্ন হইতে দিবেন না। অন্তত তুরস্কের এশীয় সাম্রাজ্যাংশ পূর্ববৎই থাকিবে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে দেখা গেল থ্রেস গ্রীসকে দেওয়া হইয়াছে, এবং তুরস্কের এশীয় সাম্রাজ্যাংশ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অধীন 'ম্যাণ্ডেট্' অর্থাৎ অভিভাবকত্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। মুসলমানদের নিকট, বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলমানদের নিকট ইহা ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া স্বভাবতই বিবেচিত হইল। ভারতবর্ষে সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে 'আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের' নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হয়। ইহাই খিলাফৎ (অর্থাৎ খলিফা সংক্রান্ত) আন্দোলন।

আন্দোলনকে যুক্ত করিবার নীতি মানিয়া হইল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান এবং হসরৎ মোহানির নেতৃত্বে একটি খিলাফৎ কমিটিও গঠিত হইল। খিলাফৎ ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ ছিল পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের, তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি অবিচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ স্থাপন।)

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ধারণা: সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস উপায়ে অসহযোগ ও আইন অমান্য মহাত্মা গান্ধীর পূর্বেও ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং এ-বিষয়ে তাঁহার ধারণা ইহাকে এক নূতন চরিত্রদান করিয়াছিল। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদকে গান্ধীজী নাম দিয়াছিলেন সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল দুই প্রকার যথা, অহিংস-অসহযোগ এবং আইন অমান্য। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষ বা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার হিংসার আশ্রয় না লইয়া তাহার সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা হইতে বিরত থাকা; প্রতিপক্ষ সরকার হইলে আইন অমান্য করা। আদর্শের প্রতি অচলা ভক্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা, মানসিক বল এবং নৈতিক শক্তি হইল সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য। সত্যাগ্রহী কোন প্রকার নির্যাতনকে ভয় করে না, যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে, এমনকি জীবন বিসর্জন দিতেও সত্যাগ্রহী সর্বদা প্রস্তুত। সত্যাগ্রহীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইল প্রতিপক্ষের অন্তরে নীতিবোধকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহার মন জয় করা এবং তাহার কার্যপন্থার পরিবর্তন সাধন করা। স্বভাবতই দুর্বলচেতা লোকের পক্ষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন সহজ ছিল না। মূলত সত্যাগ্রহ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ানের পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে সত্যাগ্রহ নামক এক অমোঘ অস্ত্র দিয়াছিলেন। অহিংস-অসহযোগ ও আইন অমান্যের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহ—অহিংস-অসহযোগ, আইন অমান্য

সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য

খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়া গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিতে চাহিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ঐ বৎসরই (১৯২০) নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদিত হইলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে চলিল। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে দুই ভ্রাতা মহাত্মা গান্ধীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়িল। অহিংসভাবে সত্য ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া আন্দোলন চালান ছিল মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও

কংগ্রেস-খিলাফৎ যুগ্ম আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অভূতপূর্ব সাড়া

আদর্শ। এজন্য তিনি ভারতবাসীকে চাকরি ছাড়িয়া দিতে, স্কুল, কলেজ, আইনসভা, বিচারালয় সবকিছু ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন। বহু উকিল-মোক্তার, ব্যারিস্টার, ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারী কর্মচারী, শিল্প-শ্রমিক এই আহ্বানে সাড়া দিয়া অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কারখানা ছাড়িয়া দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। আইনসভাও বর্জন করা হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী খেতাব বর্জন এবং সরকারী চাকরি বর্জনের ক্ষেত্রে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যায় নাই। তথাপি সরকারী চাকরি বর্জনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই অসহযোগ আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চাকরি ত্যাগ করিয়া, অনুরূপ ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকারী টাঁকশালের এক অত্যুচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সরকারী পদ ত্যাগ

দেশের সর্বত্র বিলাতী দ্রব্য বর্জনের এবং সরকারের সহিত অসহযোগিতার আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিল। বিলাতী কাপড় ও বিলাতী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বহ্নি-উৎসব করা হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্ষে যখন এই আন্দোলনের ফলে এক ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময় (১৯২১) ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্ ওয়েলসকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে ভারতীয়দের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে, রাজপুত্র তথা ব্রিটিশরাজের প্রতি তাহাদের আনুগত্য ফিরিয়া আসিবে এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের ধারণা। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। তাঁহার আগমনের দিনে ভারতবর্ষে হরতাল পালিত হইল। রাজপুত্র জনশূন্য রাস্তাঘাট দেখিতে পাইলেন। ইহা অসহযোগ আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইল। বোম্বাই শহরে অবশ্য হরতাল-বিরোধী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং পার্সী সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত হরতালের সমর্থকদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ইওরোপীয়দের এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও পার্সীদের যথেচ্ছ আক্রমণে বহু হিন্দু ও মুসলমান পথচারী আহত হইলে সংঘর্ষ খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হইতে চলিল। ব্রিটিশ সরকারকে পুলিশ ও সৈনিকদের সাহায্যে ইহা দমন করিতে হইয়াছিল। ফলে পুলিশ ও সৈনিকদের গুলিতে ৫৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং চারিশত লোক আহত হয়। বোম্বাই ভিন্ন অপরাপর সকল অঞ্চলেই হরতাল শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হইয়াছিল। ইংরেজী পত্রিকাগুলি স্বভাবতই অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলি বেআইনী ঘোষণা করিলেন। এক সপ্তাহ পর সভাসমিতি সর্বকিছু নিষিদ্ধ করা হইল। বস্তুত, প্রিন্স অব্ ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে যে

প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত সফর, সর্বভারতে হরতাল

পুলিশ ও সৈনিকদের গুলিতে ৫৩ জনের মৃত্যু

ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

হরতাল পালিত হইয়াছিল ইহার পর হইতে অসহযোগ আন্দোলন বলপ্রয়োগে দমন করিতে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম প্রভৃতি যে-সকল অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংবাদ-পত্র, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির উপর সরকারী দমননীতির কঠোর প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু চিত্তরঞ্জন পাঁচ-জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের ছোট ছোট দলকে খদ্দর বিক্রয়ের জন্য বাহির করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ



চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

সৃষ্টির জন্য প্রথমে তিনি নিজ স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও পুত্র চিররঞ্জনকে আইন অমান্য করিতে প্রেরণ করিলেন। চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হইলে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার সমগ্র বাংলাদেশে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল যে, মধ্যরাত্রেই সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে আন্দোলন স্তিমিত হইল না। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আইন অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার বরণ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতার সেণ্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সী জেল স্বেচ্ছাসেবকে ভরিয়া গেল। জেলখানার সম্প্রসারণের জন্য সাময়িকভাবে শিবির স্থাপন করা হইল।

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলিকাতার আইন অমান্য আন্দোলন

অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের কারাবরণ

সেগুলিও অল্পদিনের মধ্যে ভরিয়া গেল। সরকার প্রমাদ গণিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেককে তাঁহারা মুক্তি দিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ জেলখানা ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি উপস্থিত হইল। সরকার তখন স্বেচ্ছাসেবকদের আর গ্রেপ্তার না করিয়া লাঠি, ব্যাটন প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে লাগিলেন। বাংলার গভর্ণর চিত্তরঞ্জনের সহিত আপস করিতে চাহিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত আন্দোলন তিনি আপসের মাধ্যমে বন্ধ করিতে পারিবেন না জানাইলেন।

সরকার কর্তৃক আপসের চেষ্টা ব্যর্থ

ইহার পর আন্দোলনকে আরও জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন নিজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আইন অমান্য করিতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে এবং সেই সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেস ও খিলাফৎ-এর যে-সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইল। ক্রমে এই দমনমূলক ব্যবস্থা ভারতের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে অনুসরণ করা হইল। মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, গোপবন্ধু দাশ প্রমুখ বহু কংগ্রেসী

মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতা কারারুদ্ধ

নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি যতই কঠোর হইতে লাগিল আন্দোলন ততই শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণ্যমান্য ব্যক্তি, আইনসভার সদস্য সকলেই সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করিলেন। এদিকে প্রায় চল্লিশ হাজার সত্যাগ্রহীকে সরকার জেলে বন্দী করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন তাহাতে ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

বারদোলি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি

মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে গুজরাটের বারদোলি জেলায় সরকারের রাজস্ব না দিয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিতে মনস্থ করিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ইতিপূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে অসহযোগ আন্দোলন যখন আইন অমান্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে এবং অসহযোগ আন্দোলন সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া এক চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলি, সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে

চৌরিচৌরা ঘটনা : মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহৃত

এমন সময় গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলন হিংসাত্মক হইয়া উঠিল। সেইখানে আন্দোলনকারিগণ পুলিশ থানায় অগ্নিসংযোগ করিলে ২২ জন পুলিশ প্রাণ হারাইল। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন হিংসার পথ ধরিয়াছে দেখিয়া উহা থামাইয়া দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এইভাবে শেষ হইল (১৯২২)।

মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ সমগ্র ভারতে এক হতাশার সঞ্চার করিল। সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতা মহাত্মা গান্ধীর এই আদেশে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর কঠোর সমালোচনাও অনেকে করিতে ছাড়িলেন না। দেশের জনগণ যখন এক গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ও আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে উপস্থিত

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার অসন্তোষ

হইয়াছে এবং ব্রিটিশ সরকার যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন সেই সময়ে আন্দোলন স্থগিত করিবার অর্থ ছিল জাতীয় আন্দোলনকে অনেকখানি পিছাইয়া দেওয়া, জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বিনাশ করা। কিন্তু গান্ধীজীর যুক্তি ছিল নৈতিকতা এবং আন্দোলনের ভবিষ্যতের দিক দিয়া। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, নীতি ও আদর্শ ভ্রষ্ট হইলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যের পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। ইহা হইতেও অধিকতর

মহাত্মা গান্ধীর সপক্ষে যুক্তি

দৃঢ় যুক্তি ছিল এই যে, নিরস্ত্র ভারতবাসী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যদি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব হইবে। একবার যদি আন্দোলন অহিংসার পথ ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই আন্দোলন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন বন্ধ করায় কংগ্রেসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল একথা আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অন্তত স্বরাজের আদর্শ পূরণে এই আন্দোলন সমর্থ হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের সাফল্য (১) ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতায়, (২) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রতি ভারতবাসীর অনাস্থার মনোভাবে, (৩) ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক এবং অপরাপর যাবতীয় অভাব-অভিযোগ দূর করিতে নিজেদের শক্তির উপর দাঁড়াইতে হইবে একথা উপলব্ধিতে, ৪) কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব এই বিশ্বাসে, এবং (৫) ব্রিটিশ অত্যাচার যতই কঠোর হউক না কেন জনসাধারণ তাহাতে ভীত বা দমিত হইবে না এই দৃঢ় মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এজন্য এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল বলা ভুল হইবে। এই আন্দোলন ছিল সর্বপ্রথম জনসাধারণের আন্দোলন। এদিকে কামাল আতাতুর্ক ইয়ং টার্ক (Young Turk) বা 'তরুণ তুর্কী' দল গঠন করিয়া তুরস্কের সুলতানকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিলেন। খলিফার পদ বাতিল করিয়া কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। ফলে খিলাফৎ আন্দোলনের আর কোন গুরুত্ব রহিল না। খিলাফৎ আন্দোলনেরও অবসান ঘটিল।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের বিচার


কামাল আতাতুর্ক

কংগ্রেস বিভক্ত : স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব : চিত্তরঞ্জন দাশ যখন জেলে ছিলেন সেই সময় হইতেই তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের এবং আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া ভিতর হইতে সরকারের বিরোধিতা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, কংগ্রেস আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার কোন আশা নাই এবং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আইনসভার অভ্যন্তরে থাকিয়া শাসনকার্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। ইহা ভিন্ন, সরকার ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া আইনসভার বিরোধিতার যাহা কিছু অসুবিধা দূর করিতে পারিবেন। আর আইনসভা বর্জন নীতি ত্যাগ করিয়া আইনসভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে একথাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তদুপরি গণ্যমান্য নেতাদের অনেকেই কারাদণ্ড ভোগ করিবার ফলে তাঁহারা আইনসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই সকল যুক্তির

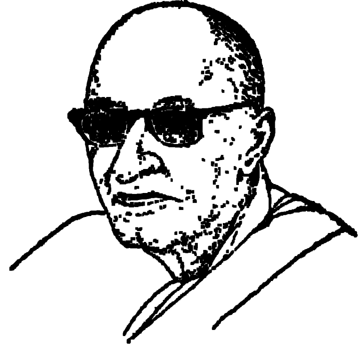
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাউন্সিলে অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশ লইয়া বিরোধ

পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। কাউন্সিল বা আইনসভা বর্জন যদিও কংগ্রেসী নীতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তথাপি কংগ্রেসের নরমপন্থীরা কাউন্সিল বর্জন করেন নাই। সুতরাং বর্জনের মাধ্যমে আইনসভা অচল করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। আর বয়কট আন্দোলনে তখন আর তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। সেজন্য নির্বাচনে অধিকসংখ্যক ভারতীয় ভোট দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে অপরাপর দলের পক্ষে কংগ্রেসের বর্জন নীতি সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। বরঞ্চ আইনসভার সদস্য হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া, সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করিয়া সরকারের দমননীতি বন্ধ করিতে, যাহাদিগকে জেলে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে চাপ সৃষ্টি করা সহজতর হইবে।

উভয় পক্ষের যুক্তি

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অন্ধ অনুসরণকারী নেতৃবৃন্দ—চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি আইনসভায় প্রবেশের যুক্তি মানিলেন না। গান্ধীজী তখনও কারাগারে রহিয়াছেন। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, সত্যমূর্তী, হাকিম আজমল খান, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি কেলকার মদনমোহন মালব্য, জয়াকার প্রভৃতি যাঁহারা আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে ছিলেন তাঁহারা 'স্বরাজ্য পার্টি' নাম দিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই একটি পৃথক দল গঠন করিলেন। এই দলের নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করিলেন এবং মোতিলাল নেহরু অন্যতম সম্পাদক হইলেন। বোম্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল, উত্তর-ভারতে মোতিলাল নেহরু বাংলাদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতে চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টিকে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আইনসভায় যোগদানের বিরোধী দল এবং স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ঐ বৎসরই (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে আবুল কালাম আজাদ কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রচার না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ফলে কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল।

কংগ্রেসে বিভেদ স্বরাজ্য পার্টি গঠন


চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী

কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাতিল . চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের নেতৃত্বের সাফল্য


বিঠলভাই প্যাটেল

ইহা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মোতিলাল নেহ্রুর শক্তিশালী নেতৃত্বেরই সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

হোমরুল লীগ ও হোমরুল আন্দোলন : এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আদর্শগত পার্থক্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং বিভেদ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগের সৃষ্টি করিয়াছিল। অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেস কর্তৃক আয়র্লাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের অনুকরণে স্বরাজ বা হোমরুল (Home Rule) দাবি আদায়ের জন্য হোমরুল লীগ স্থাপনের প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন (১৯১৫) করিয়া ব্যর্থকাম হন। এদিকে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ তখনও মিটে নাই। সুতরাং তিলক কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়াই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। পাঁচ মাস পর অ্যানি বেসান্ত পৃথক একটি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলে এই দুই লীগ বা সঙ্ঘ পরস্পর যোগাযোগ রাখিয়া হোমরুল আন্দোলন চালাইতে থাকে। ঐ বৎসরই (১৯১৬) নরমপন্থী-চরমপন্থীদের বিরোধের অবসান ঘটিলে তিলক এবং অপরাপর চরমপন্থী নেতা কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু হোমরুল আন্দোলন তিলক ও অ্যানি বেসান্ত—দুই কংগ্রেসীর নেতৃত্বেই চলিতে থাকে।

স্বরাজ বা হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতা

লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর যখন কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় সেই সময়ে বোম্বাইয়ে তিলক এবং মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া তোলেন। স্বরাজ প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার এই ধারণা তিলকের বিখ্যাত উক্তির—'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'—মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির কার্যকলাপ : ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে বাংলাদেশে স্বরাজ্য পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), আসাম প্রভৃতি প্রাদেশিক আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলেও যথেষ্ট সংখ্যায় আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। অপরাপর প্রদেশে অবশ্য স্বরাজ্য পার্টির অতি অল্পসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইতে সমর্থ হন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত ১০৫টি আসনের মধ্যে ৪৮টি স্বরাজ্য পার্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ২৪ জন নির্বাচিত হন। ইঁহারা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' নাম গ্রহণ করিয়া একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে স্বরাজ্য পার্টির সহিত যুগ্মভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে জাতীয় দাবি আদায় করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

স্বরাজ্য পার্টি ও জিন্নাহ্‌র ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের যুগ্ম কার্যসূচী

কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব করেন মোতিলাল নেহরু। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্র দলের সহায়তায় সরকারী বহু প্রস্তাব, এমনকি সরকারী বাজেট স্বরাজ্য পার্টি বাতিল করিতে সমর্থ হয়। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি উপস্থিত হয়। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে বহু প্রস্তাব পাশ করিতে এবং সরকারী প্রস্তাব বাতিল করিতে সমর্থ হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও তাঁহার স্বতন্ত্র দল স্বরাজ্য পার্টির সহিত পূর্বেকার যুগ্ম কার্যসূচীর পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কোন্ বিষয়ে স্বরাজ্য পার্টিকে সমর্থন করিবে, কোন্ বিষয়ে করিবে না তাহা স্থির করিবে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে স্বরাজ্য পার্টি ও স্বতন্ত্র দলের ঐক্য বিনষ্ট হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে আইনসভা বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় আইনসভা হইতে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণ বাহির হইয়া আসেন।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের মত পরিবর্তন

এদিকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং সরকার কর্তৃক কোন প্রকার সংস্কার চালু করিতে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস এবং স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে ব্যবধান দূর হইয়া গেল। অনেকেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের নীতিতে ফিরিয়া গেলেন। স্বরাজ্য পার্টির একাংশ, স্বতন্ত্র দল প্রভৃতি অবশ্য আইনসভায় সরকারের সহিত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তার নীতি গ্রহণ করিয়া আইনসভার সদস্য রহিয়া গেলেন। এইভাবে স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। স্বরাজ্য পার্টি ব্রিটিশ সরকার হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার আদায় করিতে সমর্থ না হইলেও শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে থাকিয়াও কিভাবে সরকারের বিরোধিতা করা সম্ভব সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। ভারতের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার মূল্য নেহাৎ কম ছিল না।

চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু · সরকারের উদাসীনতা · অসহযোগের পথে কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন



মহম্মদ আলি জিন্নাহ্

স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন

স্বরাজ্য পার্টির অবদান

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পুনরভ্যুত্থান : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সমগ্র উত্তর-ভারতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি এক সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। বহু বিপ্লবীকে ভারতরক্ষা আইনের বলে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবী সন্ত্রাসের মূল তখন দেশের গভীরে চলিয়া গিয়াছিল এবং উহার বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিপ্লবী কার্যকলাপ গোপনে চলিতেছিল। যুদ্ধাবসানে বিপ্লবীদিগকে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ক্ষমা করা হয় এবং মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে পুনরায় বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। অবশ্য বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী অত্যাচার তাঁহারা দুঃখ এবং ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিলেন। চৌরিচৌরার ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলে বাংলার বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে গোপনে মিলিত

বিপ্লবী সন্ত্রাসের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯২৩ হইতে শুরু

হইয়া পুনরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

'লাল বাংলা' প্রচারপত্র

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিকে 'লাল বাংলা' (Red Bengal) প্রচারপত্র বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়। ইহাতে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয়বার এই প্রচারপত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়।

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টির পুনরুজ্জীবন

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি পুনরায় নূতন শক্তি লইয়া পুনর্গঠিত হয়। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হইলে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্নাংশে উহার শাখা বিস্তৃত হয়। তারপর শুরু হয় সশস্ত্র ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করা। এদিকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ

মিঃ ডে হত্যা

সাহা মিঃ ডে নামে জনৈক সাহেবকে চার্লস্ টেগার্ট মনে করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করেন। এজন্য গোপীনাথের ফাঁসি হয়। বিচারালয়ে যখন ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় তখন গোপীনাথ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার রক্তের প্রতিটি কণা ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিবে। ঐ বৎসর মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈয়ারের এক গোপন কারখানা আবিষ্কৃত হইলে এবং কয়েক মাসের মধ্যে আরও একটি কারখানা আবিষ্কৃত হইলে সরকার সুভাষচন্দ্র বসু-

আলিপুর জেলের সুপারিন্টেনডেন্টকে হত্যা

সহ মোট ১৮৭ জনকে আটক করিলেন। সরকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে অত্যাচার শুরু করিলেন, পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা গোয়েন্দাদিগকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হইল বটে, কিন্তু আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট আটক বিপ্লবীদের পরিদর্শন করিতে গেলে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী তাঁহাকে লোহার ডাণ্ডা মারিয়া হত্যা করেন।


শচীন্দ্রনাথ সান্যাল


প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ? -১৯২৬)


গোপীনাথ সাহা (?—১৯২৪)

যুক্তপ্রদেশেও (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সতীশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালী যুবক বিপ্লবী সংগঠন

গড়িয়া তোলেন। যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র উহার শাখা বিস্তৃত হয়। এই সংগঠনের নাম দেওয়া হয় 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' (১৯২৪)। বিপ্লবী সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতে এক প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করা ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। মাদ্রাজ, বিহার, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে এই বিপ্লবী সংগঠনের শাখা বিস্তৃত হয়। রাজনৈতিক ডাকাতি, বিদেশী সরকারী কর্মচারী হত্যা, সরকারী অর্থ লুঠ করা প্রভৃতি কাজ এই বিপ্লবী সংস্থা শুরু করে। রেলগাড়ী হইতে সরকারী অর্থ ডাকাতির জন্য অনেক বিপ্লবী ধরা পড়িলে দীর্ঘকাল তাঁহাদের বিচার চলে। ইহা 'কাকোরি ষড়যন্ত্র' মামলা নামে পরিচিত। বিচারে চারিজনের ফাঁসির হুকুম হয়। অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। রামপ্রসাদ, রোশনলাল, আশফাক্-উল্লা ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহারা প্রাণ দান করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের প্রাণদণ্ড দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামান যাইবে না, একথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন।

বাংলার বাহিরে বিপ্লবী কার্যকলাপ; যুক্ত-প্রদেশে বিপ্লবী কার্য-কলাপ

'কাকোরি ষড়যন্ত্র' মামলা


আশফাক-উল্লা

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলে পর বৎসর সরকার সকল বিপ্লবীকে মুক্তি দেন। মুক্তিলাভ করিয়া কারাগার হইতে বাহির হইলে দেশের সর্বত্র বিপ্লবীদিগকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জনসাধারণের এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বিপ্লবীরা জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের বিভিন্নাংশে বহু রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন। তাঁহারা কংগ্রেসের স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভের নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা চাহিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র।

বিপ্লবীদের কারামুক্তি (১৯২৮ খ্রীঃ

পূর্ণ স্বাধীনতালাভ বিপ্লবীদের আদর্শ


ভগৎ সিং

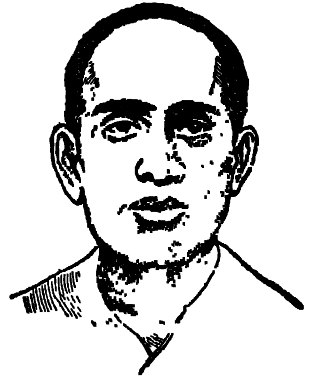
এদিকে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতে লাগিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন ভারতের স্বার্থবিরোধী বাণিজ্য বিলের আলোচনা চলিতেছিল সেই সময় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সেখানে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লাহোরেও বিপ্লবী কার্যকলাপ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। কিন্তু তাহা ফাঁস হইয়া গেলে লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় বহু বিপ্লবীর শাস্তি হয়। ঐ বৎসরই (১৯২৯) কলিকাতায় বিপ্লবীদের

গোপন সভায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কার্যসূচী গ্রহণ করা হইল। এই কার্যসূচী রূপায়ণে চট্টগ্রামে সূর্য সেন সামরিক শিক্ষায় নিজ দলবলকে শিখাইয়া তুলিলেন এবং ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন। এই ঘোষণাপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ বিতাড়নের কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন কাটিয়া দিয়া চট্টগ্রাম শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করা হইল। সূর্য সেন হইলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট। এদিকে সরকার বাহির হইতে সৈন্য আনাইয়া বিপ্লবীদের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন (২২শে এপ্রিল, ১৯৩০)। বিপ্লবীদের এগারজন এবং সরকারী পক্ষে মোট ৬৪ জন প্রাণ হারাইয়াছিল। পরদিন অধিক সংখ্যক সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে ইহা নিশ্চিত ভাবিয়া বিপ্লবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। এইরূপ একটি দলের সহিত কর্ণফুলী নদীতীরে এবং নদীবক্ষে সশস্ত্র পুলিশের রীতিমত যুদ্ধ হইল। ছয়জন বিপ্লবীর মৃত্যু হইল, দুইজন ধরা পড়িলেন। এইভাবে আরও একটি দল কয়েক মাস পর চন্দননগরে ধরা পড়িবার পূর্বে পুলিশের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া একজন প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং অন্যেরা ধরা পড়িয়াছিলেন। বিপ্লবীদের 'মাষ্টারদা' সূর্য সেনকে তখনও ধরা সম্ভব হইল না। পরে অবশ্য তিনি ধরা পড়িলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইল। লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল।

বিপ্লবী প্রস্তুতি

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

সূর্য সেনের ফাঁসি : অপরাপর অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড



'মাষ্টারদা' সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪)

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সমগ্র বাংলাদেশে বিপ্লবের এক নেশার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপ্লবীদের আক্রমণে সেই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বিপ্লবীরা তখন জীবনের বদলে জীবন, রক্তের বদলে রক্ত লইতে বদ্ধপরিকর। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী সন্ত্রাস দমনের জন্য যতই আইনের কঠোরতা এবং পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, বিপ্লবীরা ততই মরিয়া হইয়া উঠিলেন। বিপ্লবীদের মধ্যে সেই সময় বাঙালী তরুণীদের যোগদান ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তরুণ বিপ্লবীদের উৎসাহ বৃদ্ধি

এইবার শুরু হইল বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের চেষ্টা। বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। ঢাকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ লোম্যান ও হাডসন সাহেব সেই সময়ে বিপ্লবীদের সমূলে উৎখাত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া ছাত্রদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে তাঁহারা ছিলেন উৎসাহী। বিনয় এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সুযোগ তাঁহার সম্মুখে আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। জনৈক পদস্থ পুলিশ কর্মচারী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইলে লোম্যান ও হাডসন সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলে বিনয় উভয়কেই গুলি করিলেন। লোম্যানের মৃত্যু হইল, কিন্তু আহত হাডসন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচিলেন। বিনয়কে গ্রেপ্তারের শত চেষ্টা করিয়া পুলিশ ব্যর্থ হইল। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের জন্য যে তিনজন সাহসী তরুণ বিপ্লবীকে নির্বাচন করা হইল তাঁহাদের মধ্যে বিনয় বসু ছিলেন অন্যতম।

বিনয় বসু কর্তৃক লোম্যান ও হাডসনের উপর আক্রমণ : লোম্যানের মৃত্যু



বিনয় বসু (১৯০৮-৩০)



বাদল (সুধীর) গুপ্ত (১৯১২-৩০)



দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩১

অপর দুইজন ছিলেন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর সাহেবী পোশাক পরিহিত বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করিয়া কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবকে গুলি করিলেন। সিম্পসন নিজের চেয়ারেই এলাইয়া পড়িলেন। তিনি জেলে আটক বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নেলসন সাহেব গুলির শব্দ শুনিয়া রিভলভার-সহ বাহির হইয়া আসিলেন কিন্তু তিনিও গুলিবিদ্ধ হইলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব রাইটার্স বিল্ডিং পুলিশ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলে বিনয়-বাদল-দীনেশ এক কামরায় গিয়া আত্মহত্যার ব্যবস্থা করিলেন। বাদল (সুধীর) গুপ্তের নিকট আর গুলি অবশিষ্ট না থাকায় তিনি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিনয় ও দীনেশ নিজ নিজ রিভলভার হইতে নিজেদের গুলি করিলেন। আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে বিনয়ের মৃত্যু হইল, সুস্থ হইয়া উঠিলে বিচারে দীনেশকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ : বিনয় বাদল-দীনেশ

বিপ্লবীদের অন্যতম কর্মকেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, ব্রিটিশ অত্যাচারও স্বভাবতই সেখানে ছিল মাত্রাহীন। জেলাশাসক পেডি ছিলেন অত্যাচারের প্রতীক। বিমল দাশগুপ্ত পেডিকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। কানাই ভট্টাচার্য বিচারক গার্লিককে তাঁহার এজলাসে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। দীনেশের ফাঁসির হুকুম বিচারক গার্লিকই দিয়াছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের উপর গুলি করিলে দুইজন মারা যান এবং অনেকে আহত হন। এজন্য পেডি হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে গুলি করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই শান্তি ও সুনীতি নামে দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিভেনশনকে গুলি করিয়া হত্যা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (১৯৩২) গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে বীণা দাশ গুলি

পেডি হত্যা

গার্লিক হত্যা

ভিলিয়ার্সের উপর আক্রমণ



প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (১৯১৩-৩৩) অনাথবন্ধু পাঁজা (?—১৯৩৩) মৃগেন দত্ত (?—১৯৩৩)

করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় স্ট্যানলি জ্যাকসন রক্ষা পান। ঐ বৎসরই প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। পরবর্তী জেলাশাসক বার্জ সাহেবকেও অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত গুলি করিয়া হত্যা করেন (১৯৩৩)। উভয়েই অবশ্য বার্জের দেহরক্ষীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর আক্রমণ

ডগলাস হত্যা

বার্জ হত্যা

এইভাবে ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বহু তরুণ ব্রিটিশ অত্যাচারী কর্মচারীদের হত্যা করিয়া বা হত্যার চেষ্টা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। বাঙালী আত্মমর্যাদাহীন জাতি নহে এবং ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে তাঁহারা মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত একথাই তাঁহারা জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন।

বিপ্লবীদের জীবনদানের শিক্ষা

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব

(New Phase in the Freedom Movement)

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু, স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারকে সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য করিতে অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন এই সকল কারণে অনেকটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাইমন কমিশন নিয়োগের ঘোষণা পুনরায় জাতীয় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল।

জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের একটি শর্ত ছিল এই যে, দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সেই সংস্কার অনুযায়ী ভারতের শাসনব্যবস্থা কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখা হইবে। সেই অনুসারে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তদন্ত হইবার কথা। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই স্যার্ জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। স্যার্ জন সাইমন-সহ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মোট সাতজন সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠন করা হইল। কোন ভারতীয় প্রতিনিধিকে ইহাতে গ্রহণ করা হইল না।

সাইমন কমিশন



স্যার্ জন সাইমন

সাইমন কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনরায় গতিশীল হইয়া উঠিল। কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না লইয়া গঠিত কমিশন ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ইহা ভারতবাসী জাতীয় অপমান বলিয়াই গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার পক্ষপাতী ছিল। বিদেশীরা আসিয়া ভারতবাসী স্বরাজের জন্য উপযুক্ত কি না সে-বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহাদের সুপারিশ পার্লামেণ্টকে জানাইবে ইহা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কংগ্রেস এজন্য সাইমন কমিশন বর্জন করিবার এবং কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত না হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ভারতের অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলও সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত লইল। কংগ্রেস সাইমন কমিশনের

সাইমন কমিশন বর্জন : হরতাল ও বিক্ষোভ

জাতীয় আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয়

সদস্যগণ ভারতে পদার্পণ করিবার দিন সমগ্র ভারতে কালপতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কার্যসূচী গ্রহণ করিল। কমিশনের সহিত সর্বপ্রকার অসহযোগ হইল এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে উপস্থিত হইলে ভারতের সর্বত্র হরতাল ও বিক্ষোভ শুরু হইল। এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিল।


মোতিলাল নেহরু

এদিকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার ভার মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর দেওয়া হইয়াছিল। পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সর্ব-দলীয় কনফারেন্সে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। মোতিলাল নেহরুর নামানুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে রিপোর্টের নামকরণ হইল নেহরু রিপোর্ট। এই রিপোর্টে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের (Dominion) শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ভারতেও স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' (Dominion Status) বা ডোমিনিয়নের সমমর্যাদা দাবি করা হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের মূল আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি খুবই জোরালোভাবে উত্থাপন করিলেন। কংগ্রেসের তরুণ সদস্য সকলেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের সমর্থন করিলে মহাত্মা গান্ধী একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' অর্থাৎ কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমিনিয়নগুলি যে-সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করে তাহা দিতে রাজী হন তাহা হইলে ভারতবাসী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে। এই সময়-সীমার মধ্যে ভারতের দাবি মানা না হইলে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিবে এবং আইন অমান্য আন্দোলন হিসাবে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য ভারতবাসীকে নির্দেশ দিবে এই কথাও ঘোষণা করা হইল।

নেহরু রিপোর্ট

ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি

জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি

গান্ধীজীর আপস প্রস্তাব

এদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমানদের পক্ষে কতকগুলি দাবি উপস্থাপিত করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-দলীয় কনফারেন্স তাঁহার এই সকল দাবি অগ্রাহ্য

করিলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম কনফারেন্সে তিনি একটি প্রচারপত্র বণ্টন করেন। এই প্রচারপত্রে মুসলমানদের জন্য যে-সকল দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া জিন্নাহ্ ঐ বৎসরই তাঁহার 'চৌদ্দ দফা দাবি' প্রস্তুত করেন। এগুলিতে (১) ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করিতে হইবে; (২) এই যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য মাত্রেরই সমান অধিকার থাকিবে; (৩) প্রত্যেক নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হইবে; (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভার অন্তত এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমানদের মধ্য হইতে লইতে হইবে; (৫) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চালু করিতে হইবে, তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারিবে; (৬) ভারতীয় প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিতে হইবে, কিন্তু এই পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে (৭) ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকিবে; (৮) কোন আইনসভায় কোন একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ যদি কোন আইন বা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা যদি আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয় তাহা হইলে এ আইন বা প্রস্তাব পাশ করা চলিবে না; (৯) সিন্ধু অঞ্চলকে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠন করিতে হইবে; (১০) মুসলমান সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী কর্মচারী গ্রহণ করিতে হইবে; (১১) মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং উহার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (১২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রিসংখ্যা মুসলমানদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে; (১৩) প্রাদেশিক আইন-সভার মত গ্রহণ না করিয়া শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন করা চলিবে না; এবং (১৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, জিন্নাহ্-এর উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা দাবি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী ছিল। ঐ সময় হইতেই মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইতে থাকেন এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক দলের নেতায় পরিণত হন।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর 'চৌদ্দ দফা দাবি'

লর্ড আরউইন ছিলেন সেই সময়ে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৯২৬-৩১)। তিনি এক ঘোষণা দ্বারা ভারতবাসীকে জানাইলেন যে, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল হইলে পর লণ্ডনে এ-বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে। লর্ড আরউইনের এই ঘোষণা ইংলণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ জাতি ভারতবাসীকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দিতে অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতেও সম্মত ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের নিকট কোন কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা বিবেচনা করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি পরিত্যাগ

লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯ খ্রীঃ): পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি

করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল। ইহার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সাইমন কমিশনের ভারত আগমনকে কেন্দ্র করিয়া যে তীব্র জাতীয়তা-বোধ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহা কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে বিপ্লবী সন্ত্রাসে প্রকাশ পাইতেছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর সাইমন কমিশন বর্জন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে লালা লাজপৎ রায়ের মস্তকে পুলিশ আঘাত করিলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পরের মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রতিশোধ লাহোরের বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ সণ্ডার্সকে হত্যা করিয়া। এইভাবে পাঞ্জাব কেন, বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, দিল্লী—ভারতের বিভিন্নাংশে বিপ্লবী সন্ত্রাসমূলক কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে লাহোর ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ বন্দীরা অনশন শুরু করিলে শেষ পর্যন্ত বাঙালী যুবক যতীন দাশ লাহোর জেলে মারা গেলেন। দেশের সর্বত্র যুবসমাজ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি এবং আন্দোলনের প্রস্তুতি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু 'স্বাধীনতা সংঘ' বা 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' স্থাপন করিয়া প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। লাহোর অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই (১৯২৯)। এ-বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল।



লর্ড আরউইন



যতীন দাশ (১৯০৪-২৯)

স্বাধীনতা দিবস: ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি (Working Committee) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ২৬শে জানুয়ারি দিনটি ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবসে ভারতবাসীকে একটি শপথ গ্রহণের ব্যবস্থাও স্থির হয়। এই শপথ বাক্য মহাত্মা গান্ধী নিজে রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বলা হইল: "আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবাসী তথা যে-কোন জাতির স্বাধীনতা হইল সহজাত অধিকার। ভারতবাসীর নিজ শ্রমের ফলভোগ করিবার, জীবনধারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সুযোগ ভোগ করিবার এবং

স্বাধীনতা দিবসের শপথ বাক্য

উন্নততর জীবনযাপন করিবার অধিকার আছে। কোন সরকার এই সকল অধিকার হরণ করিলে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে ভারতবাসীর সেই সরকারকে পরিবর্তন করিবার বা ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার আছে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে সেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, "ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।"

ঐ বৎসরই ২৬শে জানুয়ারি দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করা হইল। ইহার পর হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ২৫শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হইয়াছিল। এই দিবসটি পালন করা এবং শপথ বাক্য পাঠ করার মধ্যে ভারতবাসী প্রতি বৎসর দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইত। ২৬শে জানুয়ারি ছিল সেই কারণে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের দিন, দেশসেবার অঙ্গীকার গ্রহণের দিন। স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতির মনে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে এবং উহা বদ্ধমূল করিতে এই দিবসের গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন সংবিধান রচিত হইলে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি অর্থাৎ পূর্বেকার স্বাধীনতা দিবসকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হইল। ঐ দিন ভারতের নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হইতেছিল সেই দিনটিকে ভারত-ইতিহাসে এবং ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব

স্বাধীনতার পর ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে পরিণত

আইন অমান্য আন্দোলন: ডাণ্ডি অভিযান ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরবৎসর লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উপর আইন অমান্য আন্দোলনের যে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সেই অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন নারী ও পুরুষ সত্যাগ্রহী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত ডাণ্ডি বা দাণ্ডী অভিযান শুরু করিলেন। দীর্ঘ ৩৮০ কিলোমিটার পথ মোট ২৪ দিনে পায়ে হাঁটিয়া মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীদের লইয়া ৫ই এপ্রিল গুজরাট প্রদেশের ডাণ্ডি বা দাণ্ডী নামক স্থানে পৌঁছিলেন। পরদিন ৬ই এপ্রিল সমুদ্রতীর হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া লবণ আইন অমান্য করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে সমুদ্র জল হইতে লবণ প্রস্তুত করা বেআইনী ছিল। এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা হইলে ভারতের সর্বত্র এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দেশের যে যে স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ ছিল সেই সকল স্থানে সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও চব্বিশ-পরগণার মহিষবাথানে লবণ প্রস্তুত শুরু হয়। সরকারী আদেশ অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়াও আইন অমান্য আন্দোলন চালান হইল। এইভাবে আইন অমান্য

লবণ সত্যাগ্রহ

আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনও চলিতে থাকে। বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, অফিস-আদালতে পিকেটিং সবকিছু মিলিয়া আইন অমান্য আন্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইল। এদিকে মহাত্মা গান্ধী সুরাট জেলায় ধর্‌সানা নামক স্থানের লবণ কারখানা ও গুদাম দখল করিবেন স্থির করিলেন। তিনি গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়কে চিঠি লিখিয়া লবণ কর বাতিল এবং ভারতবাসীর পক্ষে লবণ প্রস্তুতের আইনগত বাধা দূর করিতে অনুরোধ জানাইলেন। অন্যথায় তিনি ধর্‌সানা লবণ কারখানা ও গুদাম দখল করিবেন একথাও জানাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী ধর্‌সানা অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। আব্বাস তৈয়বজী গান্ধীর স্থলে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার লইলে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি ২৫০০ সত্যাগ্রহী লইয়া ধর্‌সানা লবণ কারখানা ও গুদাম দখল করিবার জন্য অভিযান চালাইলেন। ওখালদা লবণ গুদাম দখলের জন্যও একাধিকবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু পুলিশ সত্যাগ্রহীদিগকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়া এবং গ্রেপ্তার করিয়া লবণ কারখানা ও গুদাম রক্ষা করিল। সরোজিনী নাইডুকেও গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

ধর্‌সানা ঘটনা : গান্ধীজীর গ্রেপ্তার



সরোজিনী নাইডু

আইন অমান্য ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল সরকারী দমনমূলক অত্যাচার এবং আইনকানুনের কঠোরতাও তত বৃদ্ধি পাইল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মীরাটে এক জনসভায় লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত

সরকারী অত্যাচার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফগান নেতা খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ ছিলেন 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবক নামক একটি দলের নেতা। খোদা-ই-খিদ্‌মৎগারগণ লাল রঙের পোশাক ব্যবহার করিত বলিয়া ইহারা 'লাল কোর্তা' (Red shirts) নামে পরিচিত ছিল। খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন

কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৩১)। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি ও অসহযোগ আন্দোলনে গভীর বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। দৈহিক শক্তিতে অসাধারণ শক্তিশালী দুর্ধর্ষ পাঠান জাতি হিংসাত্মক কাজে কখনও পশ্চাৎপদ ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী খান গফ্ফর খাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দুর্ধর্ষ পাঠান জাতিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অহিংসার পথ গ্রহণ করিল। তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন চলিতে লাগিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আইন অমান্য করিয়া সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইন অমান্য আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিল।

খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ



খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ

সরকারী অত্যাচার

পেশোয়ারে সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে আন্দোলন দমন করিতে গিয়া গুলি চালাইলেন। বহুসংখ্যক সত্যাগ্রহী হতাহত হইল। খান আব্দুল গফ্ফর খাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অহিংস নীতিতে তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার অসাধারণ সাফল্য তাঁহাকে ভারতবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে। ভারতবাসী তাঁহাকে 'সীমান্ত গান্ধী' নাম দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। লাহোরে পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলি করিবার চেষ্টা হইলে পাঞ্জাবের সর্বত্র পুলিশ অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহে মুসলমান রমণীগণও অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও অপরাপর অঞ্চল

পাঞ্জাব ভিন্ন বিহারের বিভিন্ন শহরে, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং পুলিশের অত্যাচারও চরম নির্মমতায় পরিণত হয়। বিহারের পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি শহরে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

বাংলাদেশ : মেদিনীপুর

বাংলাদেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন তীব্রতা ধারণ করিলে সরকারী দমননীতিও অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করে। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশের গুলি, নারী সত্যাগ্রহীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, তাঁহাদের প্রতি অশোভন আচরণ

সত্যাগ্রহীদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগান প্রভৃতি মেদিনীপুরকে আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক অত্যুচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছে।

আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ৯০ হাজার সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, মোতিলাল নেহ্‌রু, জওহরলাল ও তাঁহার স্ত্রী কমলা নেহ্‌রু, সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ, আব্বাস তৈয়বজী, খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেককেই আন্দোলনে যোগদান করিবার অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা হইয়াছিল। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে এক অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

৯০ হাজার কংগ্রেসী সত্যাগ্রহী ও নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ

এদিকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্যার্ জন সাইমন তাঁহার রিপোর্টে ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, সরকারী মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য নিয়োগ বাতিল করিবার সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ প্রাধান্য রাখা এবং ভবিষ্যতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের কথাও সাইমন কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ঐ বৎসরই (১৯৩০) লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এক গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস হইতে কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিলেন না।

জন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল (মে, ১৯৩০)

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন (১৯৩০): গোলটেবিলের প্রথম অধিবেশনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন অপরাপর রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিলেন। এই সকল নেতার মধ্যে তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকার, মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, ডক্টর আম্বেদকার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে (১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন, (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান, এবং (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখিয়া কতক পরিমাণে দায়িত্বশীল সরকার গঠন—এই তিনটি প্রস্তাবের উপর গোলটেবিলের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর সদস্যগণ মোটামুটিভাবে এই সকল প্রস্তাব মানিয়া লইলেন এবং এ-বিষয়েও তাঁহারা একমত হইলেন যে, ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর এযাবৎ যে অধিকার ও দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সেগুলির সবই ভারতের হস্তে একসঙ্গে ত্যাগ করা উচিত হইবে না। এজন্য কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়ের উপর দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক (Defence and Foreign Relations) পূর্ণমাত্রায় ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু জটিলতা দেখা দিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিলে। জিন্নাহ্ তাঁহার চৌদ্দ দফা দাবিরও উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। এদিকে

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব

পৃথক নির্বাচনের দাবি

আম্বেদকারও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিয়া বসিলেন। যাহা হউক, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান না করায় এই সকল আলোচনার গুরুত্ব তেমন রহিল না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীও এই আশা প্রকাশ করিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের অনুরোধে সাড়া দিয়া গোলটেবিল বৈঠকের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহযোগিতা করিবেন। একপ্রকার বাধ্য হইয়াই সরকার মহাত্মা গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। কারামুক্তির পর গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১) মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহা 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' (Gandhi-Irwin Pact) নামে পরিচিত (১৯৩১)। এই চুক্তির শর্তে সরকার হিংসাত্মক কার্যের অভিযোগে আটক সত্যাগ্রহী ভিন্ন অপর সকলকে মুক্তি দিতে এবং দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতিল করিতে স্বীকৃত হইলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারীদের মধ্যে যাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতেও সরকার রাজী হইলেন। পক্ষান্তরে, গান্ধীজী আইন অমান্য স্থগিত রাখিতে এবং লণ্ডনে গোলটেবিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানে স্বীকৃত হইলেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১)

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১): ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হইলে ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের সরকারের স্থলে এক জাতীয় সরকার গঠিত হইয়াছে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী থাকিলেও রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি সংখ্যাই তাঁহার মন্ত্রিসভায় বেশি ছিল। ভারত-সচিব ছিলেন রক্ষণশীল দলের স্যামুয়েল হোর (Samuel Hoare)। এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী অনতিবিলম্বে এবং পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতীয়দের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রবর্তনের দাবি করিলেন। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের হস্তে কোন বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা—দুই প্রধান বিষয়

মহাত্মা গান্ধীর দাবি

এদিকে মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টানদের একাংশ এবং ইওরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করিলেন। হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিগণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। গান্ধীজী যুক্তি দেখাইলেন যে, ভারতের জন্য সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করা-ই হইল প্রধান কাজ। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইলে বিচারকদের লইয়া

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন দাবি

ট্রাইবুন্যাল গঠন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া এমন জটিলতার সৃষ্টি হইল যে, মহাত্মা গান্ধীর শত চেষ্টায়ও কোন প্রকার সমাধানে উপস্থিত হওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া মহাত্মা গান্ধী শূন্য হস্তে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈঠকের ব্যর্থতা

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন (১৯৩২) : ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনও বসিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ইহাতে যোগ না দিলে একপ্রকার ভাঙ্গাহাটের ন্যায়ই এই অধিবেশন সামান্য কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া অনুষ্ঠিত হইল। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বভাবতই এই অধিবেশনে সম্ভব হইল না।

ভাঙ্গাহাট অধিবেশন

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪) : দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধী হতাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে অনিচ্ছার ফলে এক দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। তদুপরি প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের কালে পুলিশী অত্যাচারের যে তদন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে করিবার কথা ছিল তাহা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সরকার কৃষকদের সহিত কোন প্রকার আলোচনা না করিয়া বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করিলে কংগ্রেসের নির্দেশে তাহারা পুনরায় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এজন্য জওহরলাল নেহরু ও পুরুষোত্তম-দাস টেণ্ডনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'লাল কোর্তা'দের অর্থাৎ খোদা-ই-খিদ্‌মৎগারদের সংগঠন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব এবং অসংখ্য লাল কোর্তাকে জেলে আটক করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বিপ্লবী সন্ত্রাস পুনরায় শুরু হওয়ায় সরকারী দমন নীতি সহ্যের সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সর্বত্র পুলিশী তাণ্ডবে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতে পৌঁছিয়া পরদিনই এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে নূতন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের (১৯৩১-৩৬) নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন এবং এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষে চিঠি, টেলিগ্রামের আদানপ্রদানের পর শেষ পর্যন্ত লর্ড উইলিংডন মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও রাজী হইলেন না। বস্তুত, ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদায় যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তনের কালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় নীতি

এইরূপ পরিস্থিতিতে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে কারারুদ্ধ করিলেন। অপরাপর কংগ্রেসী নেতাদেরও আটক করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত, কংগ্রেস অফিস বন্ধ করিয়া দিয়া কংগ্রেসী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা সরকার শুরু করিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ, মিলিটারির অত্যাচার, অগণিত কংগ্রেস কর্মীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ, লাঠি ও গুলি চালনা, স্ত্রীজাতির সম্মানহরণ, বিস্তীর্ণ এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা ধার্যকরণ প্রভৃতি কার্যের ফলে দেশের সর্বত্র এক সন্ত্রাসের শাসন কায়েম হইল। জেলের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করিতেও সরকার দ্বিধাবোধ করিলেন না। অত্যাচার, নিপীড়ন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ও সরকারী দমন নীতি

ইতিমধ্যে (১৯৩২) প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) প্রবর্তন করিলেন। অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে, নিজ নিজ প্রতিনিধি আইনসভায় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতের জাতীয় ঐক্য বিনাশ করিতে চাহিলেন। হিন্দুদের মধ্যেও যাহাতে বিভেদ সৃষ্টি হয় সেজন্য অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়া ইংরেজগণ তাহাদের কূটবুদ্ধির পরিচয় দিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজকেও বিভক্ত করিতে চলিয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকার ও গান্ধীজীর মধ্যে 'পুনা চুক্তি' (Poona Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অনুযায়ী যতটি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক সদস্যপদ তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইয়া হিন্দুদের পৃথক ভোটের ব্যবস্থা নাকচ করিলেন। বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ সরকার সমগ্র হিন্দুজাতির যৌথ নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে গান্ধীজী হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বন্ধ করিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (১৯৩২)

পুনা চুক্তি

পুনা চুক্তির পরও আইন অমান্য আন্দোলন কিছুকাল চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন শুরু করিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলে ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এই ক্ষোভ দেখাইল না।

সাময়িকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট হইতে তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন। এজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পর পর বহু কংগ্রেসী নেতা ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন চালাইতে চাহিলে সরকার তাহাতে বাধা দান করেন। এজন্য তিনি অনশন শুরু করিলে ক্রমেই তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে। এমতাবস্থায় আগস্ট মাসে (২৩ তারিখ) সরকার তাঁহাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। গান্ধীজী ইহার পর হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিহারে এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হইলে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইলে আইন অমান্য আন্দোলন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন

আন্দোলনের অবসান

তথাপি জওহরলাল নেহরু এবং ভিয়েনায় অবস্থানরত বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আকস্মিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার সত্যাগ্রহীকে বন্দী করা হইয়াছিল। সরকারী অত্যাচার বর্বরতার নীচতম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমহানি, জনতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ, জেলখানার অভ্যন্তরে নির্যাতন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, যাহা কিছু ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতায় প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা সবই করিতে সরকার ত্রুটি করেন নাই। অথচ আকস্মিকভাবে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার ফলে এই বিরাট আত্মত্যাগ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে এই ধারণা সর্বত্র জন্মিল। মহাত্মা গান্ধীর দিক হইতে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার মূলে যুক্তি ছিল সরকারী নির্যাতনের কষ্ট হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করা। লর্ড উইলিংডনের আমলে ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। ইতিপূর্বে কোন আন্দোলনে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর উপর এইরূপ অত্যাচার করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া ভারতবাসীর ঐক্য বিনষ্ট করিতে চলিয়াছিল। এই সবকিছু মিলিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের মানবতাবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়াছিল। সেনাপতির দায়িত্বই হইল পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চাদপসরণ করিয়া নিজ বাহিনীকে রক্ষা করা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের দায়িত্ববোধই তাঁহাকে এই আন্দোলন বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে না। যদিও অনেকে অন্তরের সহিত ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই।

আন্দোলন প্রত্যাহারের যুক্তি

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন : সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল উহা হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন (Government of India Act, 1935)

রচিত হইল। এই আইনের দ্বারা (১) ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি লইয়া একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সরকার নির্বাচিত আইনসভার নিকট কৃতকার্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এই নীতি স্বীকৃত হয়। এই প্রধান দুইটি নীতি ভিন্ন (৩) ভারত-সচিবের পদটি (Secretary of State for India) উঠাইয়া দেওয়া হয়। (৪) দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে কি না সেই প্রশ্নের মীমাংসা দেশীয় রাজ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইনের শর্তাদি

(৫) পররাষ্ট্র-সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনার ভার গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এই সকল কাজের জন্য গভর্ণর-জেনারেল ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৬) গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় এবং গভর্ণরদিগকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আইনসভার মতামত নাকচ করিয়া নিজেদের বিবেচনা অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন এবং সেইরূপ কাজের জন্য তাঁহারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৭) আইনসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর করা হয়।

ভারত আইনের (১৯৩৫) শর্তাদি লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি ভারতীয়দের হস্তে শাসনক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় না দিয়া ভারতকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থাই করিয়াছিল। কেবল স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদের হস্তে রাখা হইয়াছিল।



লর্ড লিনলিথগাও

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আইন পাশ করা হইলেও কংগ্রেসের আপত্তির জন্য উহা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইহাতে গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়দের হস্তে আইনসভা ও মন্ত্রিসভার কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং নাকচ করিবার ক্ষমতা দিয়া গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছিল। অবশেষে তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও (Lord Linlithgow) মন্ত্রিসভা ও আইনসভার দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অংশটি কার্যকরী করিতে স্বীকৃত হইল।

লর্ড লিনলিথগাও-এর প্রতিশ্রুতি

কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন : ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও পদত্যাগ : ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে-সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে কংগ্রেস

তখনকার মোট এগারটি প্রদেশের সাতটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ও এগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। সিন্ধু ও আসামে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হইলেও দল হিসাবে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এই দুই প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে কেবল বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বাংলা ও পাঞ্জাব এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিলে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবে জানাইল। অপরাপর প্রদেশে মুসলিম লীগের সহিত যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবার কোন কারণই ছিল না। মুসলিম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ না করিলে বাংলা ও পাঞ্জাবে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস সাহায্য করিল না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই দুই প্রদেশেও মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিলেন না। তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ শুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি এবং তাঁহার মুসলিম লীগের সদস্যগণ ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

মহম্মদ আলি জিন্নাহের হতাশা : সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি

এদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কার্যদক্ষতায় সর্বত্র কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। সেই সময়ে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি বাম-পন্থী দলের উদ্ভব ঘটিল। সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, গান্ধীজী, রাজাজী, প্যাটেল প্রমুখ দক্ষিণ-পন্থী নেতার মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিরূপে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করিলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইল। তিনি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি বাম-পন্থী দল গঠন করিলেন। ঐ বৎসরই (১৯৩৯) ভারত-সরকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা না করিয়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইতালির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই যুদ্ধে সাহায্য দান করিবার পূর্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের আদর্শ কি এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই যুদ্ধের আদর্শ কি না, সে-বিষয়ে জানিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। লর্ড লিনলিথগাও (১৯৩৬-৪৩) মাত্র এইটুকু আশ্বাস দিলেন যে যুদ্ধ চলা কালে ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হইবে এবং উহার মতামত লইয়া সরকার যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধসংক্রান্ত পরিস্থিতি ও সমস্যার মোকাবিলা করিবেন। ভারতের

সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসী সদস্যদের মতানৈক্য

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত সরকারের যোগদান—কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি কথাও এই ঘোষণায় বলা হইল না। ইহাতে কংগ্রেস অত্যন্ত হতাশ হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এমতাবস্থায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে অত্যন্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তিনি কংগ্রেসের এই পদত্যাগকে এক নিষ্কৃতি দিবস (Day of Deliverance) পালনের মাধ্যমে স্বাগত জানাইলেন এবং সেই সুযোগে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকালে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের কাল্পনিক অভিযোগ করিয়া চলিতেছিলেন। এই ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন উচ্চতম বিচারালয় ফেডারেল কোর্টের (Federal Court) প্রধান বিচারপতি স্যার্ মরিস গয়ারের সভাপতিত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হউক একথা কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব করা হইলে জিন্নাহ্ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। জিন্নাহের কাল্পনিক অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা আবুল কালাম আজাদ এই সকল অভিযোগ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে মুসলমান তথা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অবিচার করা হয় নাই একথাও তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরাপর নেতার সহিত পুরোভাগে থাকিয়া, এবং দেশসেবার ও জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে ব্রিটিশ কারাগারে তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা হইতে ঊর্ধ্বে থাকিয়া, এবং কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহ্‌রু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে সর্বত্র পরাজিত করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহার শর্ত ছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকার অন্তত সাময়িকভাবে একটি জাতীয় (কেন্দ্রীয়) মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগাও জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট একটি ঘোষণায় তিনি একথা জানাইলেন যে, যুদ্ধ অবসানে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা আহূত হইবে। ইহা ভিন্ন, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কার্য-নির্বাহক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং ভারতের সর্বাংশের প্রতিনিধি লইয়া একটি যুদ্ধ-মন্ত্রণা সভা গঠন করিতে রাজী হইলেন। একমাত্র কংগ্রেসের হস্তে তিনি শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না একথাও জানাইলেন। ইহার অন্য অর্থ ছিল এই যে মুসলিম লীগকে তিনি বাদ দিয়া কিছু করিবেন না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই ঘোষণায় অত্যধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি

লর্ড লিনলিথগাও-এর আগস্ট ঘোষণা

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি এই তত্ত্ব মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর নিজস্ব উদ্ভাবন নহে। স্যার্ সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মীরাটে এক বক্তৃতায় সর্বপ্রথম বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কেবল দুইটি পৃথক জাতি-ই নহে- ইহারা পরস্পর সংঘর্ষেও লিপ্ত বটে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ও রাজনীতিক মহম্মদ ইক্‌বাল মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় ক্যাম্‌ব্রিজে পাঠরত চৌধুরী-রহমৎ আলি প্রমুখ (১৯৩৩) পাকিস্তান* রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন, কিন্তু দায়িত্বশীল মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইহা ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা বলিয়া আখ্যাত করেন এবং উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও এই প্রশ্ন উঠিলে ইহাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান দাবি পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন (জানুয়ারি ১, ১৯৪০) যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি। তাহাদের পার্থক্য কেবল ধর্মগত নহে জাতিগতও বটে। এই কারণে তিনি মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র-গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর 'দুই-জাতি মতবাদ' (Two-Nation Theory)

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জিন্নাহ্-এর এই 'দুই-জাতি মতবাদ' সমর্থন করিলেন না। কিন্তু জিন্নাহ্ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহিলেন না। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র এই দাবি তিনি করিতে লাগিলেন। (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান দাবি'র প্রস্তাব গ্রহণ করিল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলিম লীগের সদস্যবর্গ জিন্নাহ্-এর এই ভারতীয় ঐক্য-বিরোধী প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমানদের মতানৈক্যের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আপনা হইতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিকিয়া রহিলেন। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিলেন।)

লীগের লাহোর অধিবেশন— 'পাকিস্তান দাবি' (১৯৪০)

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

* পঞ্জাব, আফগান প্রদেশ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু অঞ্চলগুলির ইংরাজী বানানের প্রথম অক্ষর এবং বালুচিস্তানের ইংরাজী বানানের শেষ তিনটি অক্ষর লইয়া পাকস্তান (PAKSTAN)—পরে হয় পাকিস্তান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
(Impact of the Second World War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানের শর্ত হিসাবে কংগ্রেস অবিলম্বে একটি জাতীয় সরকার (National Government) গঠন এবং ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধানসভা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করিয়াছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের এই সকল শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। এদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ ও তাঁহার মুসলিম লীগ কংগ্রেসের দাবির ব্যাপারে একমত না হওয়ায় গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের সুযোগে মুসলিম লীগ কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। তদুপরি জিন্নাহ্‌ ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণ দুইটি পৃথক জাতি, এই মতবাদ (Two-Nation Theory) চালু করিলে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি আরও শক্তি সঞ্চয় করিল, তাঁহারা আরও আশ্বস্ত হইলেন।

কংগ্রেসের সাহায্যের শর্ত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান

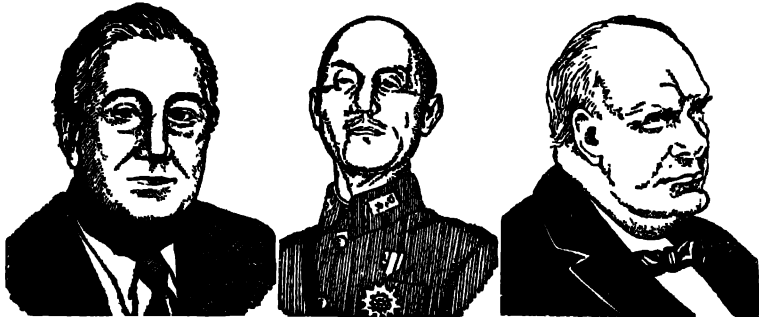
কিন্তু এই স্বস্তির ভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। জাপানের জার্মানি-ইতালির পক্ষে যোগদান আকস্মিকভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির এক ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটাইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়া দ্রুতগতিতে সিঙ্গাপুর ও মালয় দখল করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমার অভ্যন্তরে পৌঁছিলে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল। একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, জাপান ভারতবর্ষও আক্রমণ করিবে। জাপানের যুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পূর্বে (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪১) সরকার জওহরলাল নেহ্‌রু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতা-সহ সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিয়াছিলেন। জাপান যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও ভারতবাসীর নিকট একটি প্রকাশ্য আবেদনে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানাইল যে, একমাত্র স্বাধীন ভারত দেশের প্রতিরক্ষার এবং বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতার একমাত্র শর্ত, একথা কংগ্রেস জানাইল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সহিত আপসের প্রয়োজন বোধ করিলেন।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান : ব্রিটিশ সরকারের মতি পরিবর্তন

ক্রীপস্‌ মিশন বা দৌত্য (Cripps Mission): ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইন্‌স্টন্‌ চার্চিল (Winston Churchill) ঘোষণা করিলেন (১১ই মার্চ, ১৯৪২) যে, ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ সাহায্যের মাধ্যমে জাপানী আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা

উদ্ভাবনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্কে (Sir Stafford Cripps) ভারতবর্ষে প্রেরণ করা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্রীপস্ মিশন প্রেরণের পশ্চাতে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টেরও চাপ ছিল। কিছুকাল পূর্ব হইতেই মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল (Cordell Hull) ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছিলেন।* তদানীন্তন চীনের রাষ্ট্রপ্রধান

ব্রিটিশ সরকারের উপর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চাপ



রুজভেল্ট চিয়াং কাই-শেক্ (জিয়াং জিয়েশি) উইনস্টন্ চার্চিল

জেনারেলেসিমো চিয়াং কাই-শেক্ও (Generalissimo Chiang Kai-shek) [জিয়াং জিয়েশি] ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতি অবিলম্বে পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, মূলত জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য লইয়া স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্কে ভারতে প্রেরণ করা হইল। ক্রীপস্ যে-সকল প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মুখে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিলেন তাহা ছিল এইরূপ:

(১) ভারতে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করা হইবে। অর্থাৎ কানাডা-অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন সেই সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করিত তাহা ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে এবং অবিলম্বে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।



স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্

(২) যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীর নিজ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা গঠন করা হইবে। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে

* Vide: R. C. Majumdar: *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III. pp. 617-18.

নিজ নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে সংবিধানসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হইবে। (৩) সংবিধানসভা কর্তৃক গৃহীত সংবিধান ভারতে কার্যকরী করা হইবে, কিন্তু কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে সেই প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য নিজস্ব সংবিধান গঠন করিতে পারিবে। ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেগুলি মানিয়া চলা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি চুক্তি সংবিধানসভা ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষর করিতে হইবে। (৪) প্রাদেশিক আইনসভার নিম্ন-কক্ষ অর্থাৎ লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলীর (Legislative Assembly) সদস্যগণ সংবিধানসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করিবেন। (৫) সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিবে।

ক্রীপসের প্রস্তাব

স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ একথা স্পষ্টভাবেই জানিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সাফল্য প্রধানত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আলোচনা প্রধানত কংগ্রেসের সহিতই তাঁহাকে করিতে হইল, কারণ কংগ্রেসই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও নেহ্রু কংগ্রেসের পক্ষে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস চাহিয়াছিল অনতিবিলম্বে যে সরকার গঠিত হইবে তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধির উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। ব্রিটিশ সরকার রাজী না হইলে কংগ্রেস ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর প্রস্তাবকে a post-dated cheque on a crashing bank অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ ব্যাঙ্কের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানো যাইবে এরূপ একখানা চেক্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গভর্ণর জেনারেল ও রাজ প্রতিনিধির সর্বাত্মক প্রাধান্য কোন অংশে হ্রাসের চেষ্টা করা হয় নাই। স্বভাবতই কংগ্রেসের নিকট ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণ-যোগ্য হইল না। হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়ও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিলেও, যেহেতু উহাতে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হয় নাই সেই হেতু মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইল।

কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

এদিকে জাপানী সৈন্য ক্রমেই ভারতের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রীপস্ মিশনের বিফলতা, বিদেশী আক্রমণের ভীতি সবকিছু মিলিয়া ভারতের সর্বত্র এক নিরাশার সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেন উভয়ের নিরাপত্তার দিক দিয়া ভারতকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের উচিত এরূপ মন্তব্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াতাহার 'হরিজন' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন (১৯শে এপ্রিল, ১৯৪২)। ক্রীপস্ দৌত্যের বিফলতার পর কংগ্রেসের পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কোনপ্রকার

প্রাধান্য বজায় রাখিয়া শাসনতান্ত্রিক কোন সংস্কার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবার প্রশ্ন আর রহিল না।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন (আগস্ট ১৯৪২) মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ সম্বলিত প্রস্তাব (Quit India) গ্রহণ করিল। যুক্তি হিসাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। আর জাপানের যুদ্ধ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নহে, জাপান ব্রিটিশের শত্রু। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিদ্যমান এজন্যই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যত। ব্রিটেন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে ভারতবাসী জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে (৭ তারিখ) কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল। ৮ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, পরের দিন প্রাতঃকালে কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আদর্শে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র ভারতবাসী নেতৃহীন অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, ডাকঘর, তারের লাইন, থানা প্রভৃতি নাশ করিয়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিল। আন্দোলন শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থা বিনাশ করিয়া সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

'ভারত ছাড়' দাবি

আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২ খ্রীঃ)

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' প্রতিজ্ঞা

বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলা 'ভারত ছাড়' বা আগস্ট আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।* আন্দোলন সেখানে প্রকৃত বিপ্লবের রূপ ধারণ করিয়াছিল। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণদান সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের এক অতি উজ্জ্বল

মেদিনীপুর ও আগস্ট আন্দোলন



মাতঙ্গিনী হাজরা

* স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের বীরেন শাসমল, যাঁহাকে জনসাধারণ "দেশপ্রাণ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল, নাড়াজোল রাজপরিবার প্রভৃতির অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া প্রমুখ কংগ্রেসসেবীর নেতৃত্বে গঠিত "বিদ্যুৎবাহিনী" তমলুক মহকুমায় এক জাতীয় সরকার গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই সরকার বজায় ছিল। ঐ সময়ে সেই অঞ্চলে কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ শাসন বলিয়া কিছু ছিল না। যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) বালিয়া জেলায় আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সাময়িকভাবে সেখানেও স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল। বিহারের ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশেও অনুরূপ স্বাধীন সরকার স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক মাস এই স্বাধীন সরকার বজায় ছিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে মরিয়া হইয়া উঠিলেন। পুলিশের অত্যাচার, সামরিক বাহিনীর গুলি-বর্ষণ, অসংখ্য আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার, স্ত্রীজাতির প্রতি বর্বরতা কোন কিছুই বাদ গেল না। প্রায় দশ হাজার লোক পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। অসংখ্য লোককে বন্দী করা হইয়াছিল।

বালিয়া ও ভাগলপুর

ব্রিটিশ অত্যাচার

নেতৃহীনভাবে স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন কোন কোন অঞ্চলে হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও মৌলানা আজাদ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিলেন, কিন্তু এজন্য কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব ছিল না একথাও স্পষ্টভাবে জানাইলেন। অবশ্য আন্দোলন-কালে নানাপ্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশন শুরু করিলেন। অনশনকালে তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হইলে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির কার্য-নির্বাহক সভার তিনজন সদস্য পদত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে (১৯৪৩) বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার স্বার্থপর নীতি ও অকর্মণ্যতার ফলে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কলিকাতার পথে পথে অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল। ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) মন্বন্তরের পর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ভারতের কোন অংশে ঘটে নাই।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ* সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন একজন নির্ভীক বিপ্লবী।

* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈনিক জেনারেল মোহন সিং জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি' (Indian National Army) নামে এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। অপরদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' (Indian Independence League) নামে অপর একটি বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া ২৬শে আগস্ট (১৯৪৩) তারিখে মোহন সিং ও রাসবিহারী বসুর দুইটি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সংযুক্ত করিয়া উহার নামকরণ করিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং তিনি সেই বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক পদ গ্রহণ করিলেন। (*Soldiers' Contributions to Indian Independence*, Mohan Singh, pp. IX, XIII-XV, 74, 243, 245)

দেশসেবায় দুঃসাহসিকতা, নূতন পন্থা উদ্ভাবন প্রভৃতি গুণের সহিত তাঁহার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতের এক জনপ্রিয় নেতা হিসাবে পরিচিত করিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের পর কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত মতানৈক্য হেতু তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এজন্য কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে আটক করা হয়। কিন্তু জেলে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে পুলিশ পাহারাধীনে রাখা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলি দিয়া সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে দেশ হইতে পলায়ন করেন (১৯৪১)। আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি শেষে জার্মানিতে উপস্থিত হন। সুভাষচন্দ্র হিট্‌লারের ফ্যাসীবাদী নীতির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য হিট্‌লারের সাহায্য গ্রহণেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া একটি স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গঠনে তাঁহার প্রস্তাবে হিট্‌লার সম্মত হন। এইভাবে স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী গঠনের প্রথম পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। তারপর তিনি জাপান এবং জাপান হইতে সিঙ্গাপুরে আসেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রমুখ ভারতীয়দের সাহায্যে এবং প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া তিনি তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ বা স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকারও তিনি স্থাপন করেন। তাঁহার এই সরকার ও সেনাবাহিনী গঠনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে ভাই-ভাইয়ের মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তাঁহাকে সকলে সম্বোধন করিল 'নেতাজী'।

ভারত হইতে পলায়ন


নেতাজী সুভাষচন্দ্র

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র তাঁহার সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ভারতীয় স্ত্রীলোকদের লইয়া 'ঝাঁসীর রাণী বাহিনী' গঠিত হইল। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন হইলেন এই রাণী বাহিনীর নেত্রী। অপরাপর বাহিনীর নাম দেওয়া হইল গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ

ব্রিগেড প্রভৃতি। তারপর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (অক্টোবর ২৩, ১৯৪৩)। নেতাজী সুভাষ ধ্বনি তুলিলেন 'দিল্লী চলো'। এই ধ্বনি সমগ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রতিধ্বনিত হইল। দিল্লী দখল করিয়া ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করাই ছিল এই ধ্বনির মর্মার্থ। তারপর শুরু হইল দিল্লী অভিযান। আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া মণিপুর অঞ্চলের ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল শহর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দখলে চলিয়া গেল। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ইম্ফলে সেইদিন প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে উড্ডীন করা হইল।

'দিল্লী চলো'

ইম্ফল অধিকার

আসামের সীমার মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া নেতাজী কোহিমা শহরটি দখল করিলেন। অন্যদিকে কাছাড় জেলার শিলচরের অনতিদূরে বিষেণপুর নামক স্থানটি আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন পর পর সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি জাপানের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। আমেরিকার প্রবল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে খাদ্যাভাব এবং অপরাপর প্রতিকূল অবস্থা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। জাপানের পরাজয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীকে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরে (২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫) এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হয়। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

কোহিমা ও বিষেণপুর অধিকার

জাপানের পরাজয় আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই সত্য, কিন্তু নেতাজী সুভাষ ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা ভারতবাসী মাতৃভূমির মুক্তির জন্য কি পরিমাণ আত্মত্যাগ, দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত সেই প্রমাণ রাখিয়া গিয়া ভারতের এবং পৃথিবীর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সৈনিকদের স্বাধীন সংগঠনী শক্তি, তাহাদের দেশাত্মবোধ, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকিবার মনোবল এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়নের সংকল্প—এই সকল পরিচয় তাহারা ব্রিটিশ সরকারকে দিয়া গিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশ উদ্ধারের কার্যকলাপের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবৎসর ভারতের নৌ-সেনা বিদ্রোহে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর

নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের গুরুত্ব

করিলেন না। নৌ-সেনাধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল গডফ্রে বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া বেতারবার্তা পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল না। নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে ভারতবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসের সৃষ্টি হইলে বোম্বাইয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল, পুলিশের সহিত খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার বলপূর্বক এই বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চালাইলেন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন।

কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে বিদ্রোহের অবসান

এই বিদ্রোহ হইতে একথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে নৌ-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যের পথে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছিল।

নৌ-বিদ্রোহের গুরুত্ব

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সহিত মীমাংসার চেষ্টা প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরিস্থিতি যখনই খারাপের দিকে গিয়াছে তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সহিত একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। জাপানের আক্রমণে রেঙ্গুনের পতনের অব্যবহিত পরে যেমন ব্রিটিশ সরকার ভারতের নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার পর একটা মীমাংসায় আসিবার উদ্দেশ্যে স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিলে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট পর্যায়ের তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই দৌত্য ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলীর ঘোষণা (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)

এই ঘোষণার পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত একটা আপস-মীমাংসায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ-বিষয়ে ক্রীপস্ দৌত্য ও ওয়াভেল পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

পূর্বেকার চেষ্টার ব্যর্থতা

ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রিমিশন: বলা বাহুল্য, নৌ-বিদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে ভারতের উপর আর ব্রিটিশ প্রভুত্ব টিকাইয়া রাখা যাইবে না একথা ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পশ্চাতে ইহাই ছিল মূল কারণ। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্লীমেন্ট এটলীর ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড প্যাথিক ল্যারেন্স্, স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ও মিঃ আলেক্‌জাণ্ডার—এই তিনজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (২৩ তারিখে) ভারতবর্ষে পাঠানো

ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬ খ্রীঃ)

হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও মুস্লিম লীগের বিরোধিতায় এবারও কোন ঐক্যবন্ধ দাবি ক্যাবিনেট মিশনের নিকট উপস্থাপিত করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, ক্যাবিনেট মিশন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব-ভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হিন্দুপ্রধান অঞ্চল-গুলিকে 'ক' শ্রেণী আর মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান অঞ্চলগুলিকে 'খ' শ্রেণী এবং বাংলাদেশ ও আসাম প্রদেশকে 'গ' শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে। এই তিনটি অঞ্চল নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র স্থির করিবে। তারপর এই তিনটি শাসনতন্ত্রাধীন অঞ্চল এবং যে-সকল দেশীয় রাজ্য যোগদানে ইচ্ছুক সেগুলি হইতে মোট ২৯৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবিধানসভা গঠিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত থাকিবে এবং প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলির উপর অন্যান্য ক্ষমতা অর্পিত হইবে। নূতন সংবিধান গঠনের কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বাবধি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার (an interim National Government) গঠন করা হইবে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব


প্যাথিক ল্যারেন্স্

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া উপায়ান্তরও ছিল না। যাহা হউক, কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু সংবিধানসভায় যোগদান করিতে রাজী হইল। মুস্লিম লীগ উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেও যোগদানে স্বীকৃত হইল। কিন্তু কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। মুস্লিম লীগ একক-ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না তখন সংবিধানসভা যোগদান করিবে না বলিয়া জানাইল। ইহা ভিন্ন, প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করিবে বলিয়া হুমকি দেখাইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হইলে জিন্নাহ্ তাঁহার সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মুস্লিম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে উস্কানি দেওয়া হইতে লাগিল। বাংলাদেশে তখন সুরাবর্দি মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ষ আন্দোলনের (Direct Action) নামে কলিকাতা মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও

কংগ্রেস কর্তৃক আংশিকভাবে গ্রহণ

মুস্লিম লীগ কর্তৃক গৃহীত

মুস্লিম লীগের বিরক্তি—প্রত্যক্ষ আন্দোলনের হুমকি

মুস্লিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলন—কলিকাতায় হত্যাকাণ্ড

গুণ্ডাবাজি চলিল। প্রথমে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ চলিল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণ হইতে হিন্দুগণ নিজেদের আত্মরক্ষার ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিল। কারণ, সুরাবর্দি সরকার তখন গুণ্ডাদলের পরোক্ষ সমর্থকে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে হতাহত হইল। কলিকাতা মহানগরীর পথে বহু মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রাদেশিক ব্রিটিশ গভর্ণর এবং ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির অকর্মণ্যতা ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিল। যাহা হউক, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান এইখানেই ঘটিল না। নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে নির্দোষ হিন্দু নরনারীর উপর মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের অমানুষিক বর্বরতা চলিল। ইহার প্রতিক্রিয়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা দিল। সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।



জওহরলাল নেহরু

ইতিমধ্যে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিয়াছিলেন। জিন্নাহ্ ও মুস্লিম লীগ ইহাতে যোগদান করে নাই। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭) শেষ পর্যন্ত মুস্লিম লীগকে যোগদানে রাজী করাইলেন। অল্পকালের মধ্যেই মুস্লিম লীগের যে-সকল সদস্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ও লর্ড ওয়াভেল একপক্ষে চলিয়া গেলেন। ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ প্রতি পদেই প্রতিহত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এট্‌লী ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের হস্তে ভারত-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবেন। দায়িত্ব-বোধসম্পন্ন নেতৃবর্গ বলিতে প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃবর্গকেই যে বুঝানো হইয়াছিল সে-বিষয়ে মুস্লিম লীগের কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মুস্লিম লীগ হতাশা-জনিত ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইল। প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিবার ঘোষণা



ক্লীমেন্ট এট্‌লী

পাঞ্জাবে মুস্লিম লীগের শিখ ও হিন্দু হত্যা

বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দাবি

অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া হিন্দু এবং শিখগণ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল।

অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই সরকারের মুসলিম লীগ সদস্যদের প্রতি লর্ড ওয়াভেল পক্ষপাতিত্ব শুরু করিলে কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ফলে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠানো হইল। ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইল।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ঐ মাসেই ঘোষণা (Mountbatten Plan) করিলেন যে, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল হিসাবে বিভক্ত করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণ করিয়া সেগুলি কোন্ রাষ্ট্রে থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। মুসলমানগণ পাকিস্তান গঠন করিতে চাহিলে


লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিবেন একথাও বলা হইল। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলার গণভোট গৃহীত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্তির সপক্ষে ভোট দিল। আর তদানীন্তন আসাম মন্ত্রিসভা উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন না করার ফলে শ্রীহট্টে গণভোট গ্রহণের কালে বহুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও হিন্দুকে মুসলিম লীগের সমর্থক গুণ্ডাদল ভোটদানে বাধা দিল। ফলে করিমগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ বাদে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' পাশ করিয়া ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন করিল।*

'ভারতের স্বাধীনতা আইন'

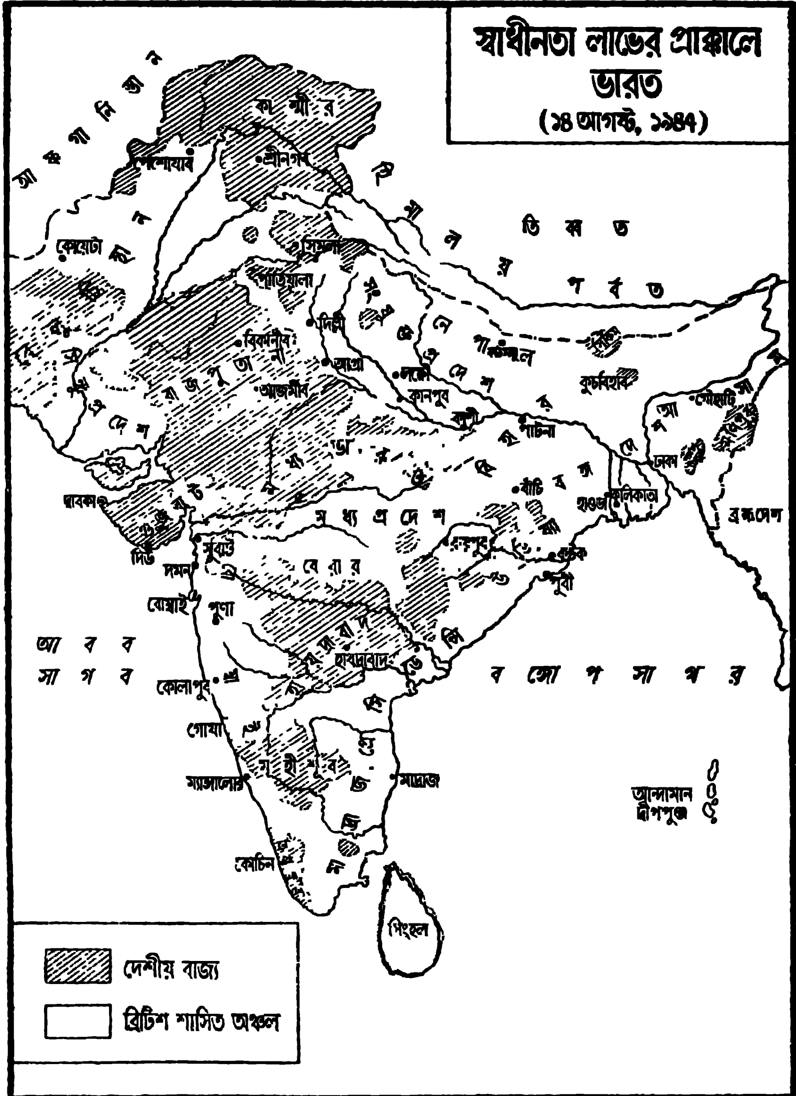
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের উদ্ভব

---

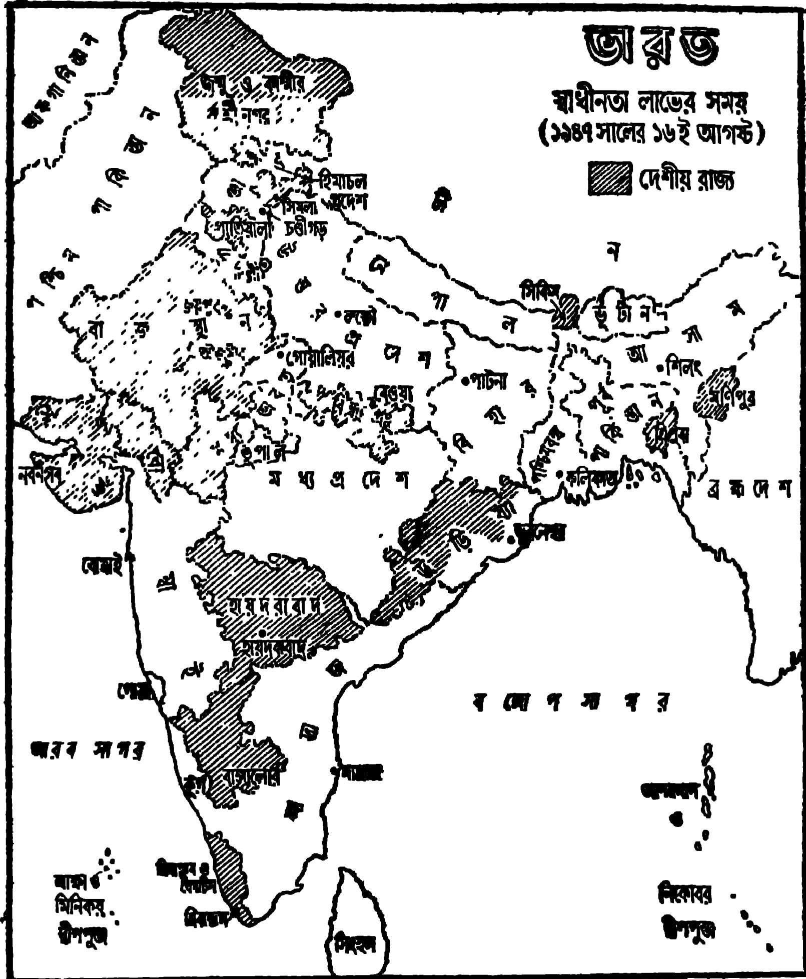
* ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (The Indian Independence Act, 1947) অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আইনের চক্ষে এই স্বাধীনতা আইন ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান-সভা (Constitutional Assemblies) সার্বভৌম (Sovereign) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। অতএব, ভারতকে প্রজাতন্ত্র (Republic) হিসাবে আখ্যাসিত করিতে সংবিধান-সভার কোন অসুবিধা ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশের পর হইতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালু ছিল। ইহা ব্যতীত, নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গণ-পরিষদ বা সংবিধান-সভা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

এইভাবে দীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের পর ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিল, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট করিয়া ভারত ও পাকিস্তান—এই দুইটি স্বাধীন দেশের উৎপত্তি হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অপকীর্তি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য উপেক্ষা করিয়া দুইটি পৃথক দেশে ভাগ করা হইল। সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ ব্রিটিশ শাসকবর্গ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষ

ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ



ব্যবচ্ছেদে ফলপ্রদান করিল। ভারতবর্ষ ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের দুই খণ্ড—ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিল।



স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী আরও দুই বৎসরের অধিককাল চেষ্টার পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধানসভা এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান পাশ করিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হইতে ভারতের নূতন সংবিধান চালু হইয়াছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (Sovereign Democratic Republic)* পরিণত হইল। পূর্বে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারি

স্বাধীনতা দিবস হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হইত এবং ঐ দিন মহাত্মা গান্ধী-রচিত এক শপথবাক্য যাঁহারা অনুষ্ঠান পালন করিতেন তাঁহারা পাঠ করিতেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা জাগাইয়া তোলা। স্বাধীনতা লাভের পর আর তাহার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারির ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের নূতন সংবিধান ২৬শে জানুয়ারি তারিখে কার্যকরী করা হয়। ২৬শে জানুয়ারি প্রতি বৎসর প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৫০ ৫২ [অস্থায়ী], ১৯৫২-৫৭, ১৯৫৭-৬০), আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ হইয়াছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর রাধাকৃষ্ণাণ রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ১৯৬০-১৯৬৭ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কার্যকাল শেষে এবং ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্তর্বর্তী কালে চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী ভারতের গভর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপন (২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০)



ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল। সেইজন্য ভারত এখনও কমনওয়েলথের সদস্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারত ইংলণ্ডের রাণী বা রাজার আনুগত্যাধীন নহে। স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলথের সভ্য হিসাবে রাখিবার জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে এখন 'কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্' (Commonwealth of Nations) নামকরণ করা হইয়াছে। কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যমূলক। স্বাধীন ভারতের আদর্শ হইল আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলা।

স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য